প্রথম মুদ্রণ :
২১শে ভাদ্র, ১৩৬৩

প্রকাশক :
পরিমল চন্দ্র
গাঙ্গেয় প্রকাশনী
১৬, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : গোপালচন্দ্র পাল
গাঙ্গেয় প্রেস

প্রচ্ছদশিল্পী :
মণীন্দ্র মিত্র

প্রচ্ছদ-মুদ্রক :
রিপ্রোডাক্শান সিণ্ডিকেট
৭/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

পরিবেশক :
সত্যব্রত লাইব্রেরী
১৯৭, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

বাংলা দেশের সকল শ্রেণীর নির্যাতিত ও শোষিত মানুষের হাতে এ বই তুলে দেওয়া হল

নিবেদন

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি "আত্মদর্শন" ও "আমরা কোন্ পথে" শিরোনামে যথাক্রমে 'সত্যযুগ সাময়িকী' ও 'কলিকাতা' সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। "আত্মদর্শন" লিখিত হয়েছিল 'জড়ভরত' এই ছদ্মনামের আবরণে, আর শেষোক্ত রচনাগুচ্ছ স্বনামে। এই দুই ধারাবাহিক পর্যায়ের রচনা ছাড়াও দুই-চারিটি বিচ্ছিন্ন নিবন্ধ ভাবগত ঐক্যের সূত্রে গ্রন্থটিতে সন্নিবেশ করা হল। এই প্রধান দুই পর্যায়ের রচনার পার্থক্য বোঝাবার জন্য রচনাগুলিকে দুইটি পর্বে ভাগ করে দেখানো হল।

সব কটি রচনাই আজ থেকে আট ন বছর আগেকার লেখা। সংকলিত নিবন্ধসমূহের রচনাকাল নির্দেশের বিশেষ অর্থ আছে। এ হচ্ছে সেই সময় যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা, বঙ্গবিভাগ ইত্যাদি নানা বিপর্যয়কারী ঘটনা মিলে সমগ্র বাঙালী জাতির অস্তিত্বকে তছনছ করে দেবার উপক্রম করেছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার জের তখনও মেটে নি—এখনই কি মিটেছে? সাম্প্রদায়িক হানাহানির রুধিরপঙ্ক থেকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের যে বিষবাষ্প উদ্গীরিত হয়েছিল, তার জ্বালাময় সংস্পর্শে বাঙালীর শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়েছিল। বঙ্গবিভাগ তদানীন্তন আর একটি প্রচণ্ড দুর্দৈব, যা স্বাধীনতার আনন্দকে বিস্বাদ করে দিয়ে বাঙালী জাতিকে চিরকালের জন্য পঙ্গু করে রেখে গেছে।

এমনই এক প্রবল বিমর্ষতার পশ্চাদ্পটে নিবন্ধগুলি লেখা, স্বতঃই সেই কারণে রচনাগুলির ভিতর একটা ভাবগত tension-এর সৃষ্টি হয়েছে, যে থমথমে ভাব ইচ্ছা করলেই লেখক অবদমিত করতে পারতেন না। লেখাগুলির মধ্যে যে জ্বালা ও দাহের পরিচয় রয়েছে আজকের মানদণ্ডে তা হয় ত কিঞ্চিৎ আতিশয্যমণ্ডিত মনে হতে পারে, কিন্তু তখনকার অশান্ত আবহাওয়া বিচার করলে বোধ হয় এই চিত্তক্লেশকে আর তেমন প্রয়োজনাতিরিক্ত উগ্রতাযুক্ত বলে মনে হবে না। সত্য বলতে কি, নানাবিধ

বিপত্তির ফলে সে সময় বাঙালীর মনোজীবনের ভিত্তিভূমি গুঁড়িয়ে যাবার দাখিল হয়েছিল; আঁকড়ে ধরবার মত পায়ের তলায় কোনরূপ বিশ্বাসের মাটীই বোধ হয় আর ছিল না। সেই সময়ের পটভূমিতে বসে মূলতঃ সামাজিক অসঙ্গতি, গ্লানি ও বিকারের চিত্র আঁকতে গিয়ে (যা এই গ্রন্থের লক্ষ্য) রচনার ভিতর শান্ত রসের জোগান দিলে তদানীন্তন কালকে বিদ্রূপ করা হত। আজ অপেক্ষাকৃত অচঞ্চল পরিমণ্ডলে বাস করে পশ্চাদ্‌চিন্তার সূত্রে বিগত কালের ভয়াবহতা ততটা তীব্রভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, কিন্তু তখনকার কালের মনকে বিচার করতে হলে তখনকার মানদণ্ড প্রযুক্ত হওয়াই বোধ করি বাঞ্ছনীয়। লেখক স্থৈর্য আর প্রশান্তিকেই সবচেয়ে বরণীয় আদর্শ মনে করেন, তবু যে এই গ্রন্থে সেই আদর্শের আংশিক ব্যত্যয় ঘটিয়ে ভিন্নতর আদর্শের পোষকতা করেছেন সে শুধু সাময়িক সমস্যাসমূহের গুরুত্ব ও তীব্রতাকে প্রকট করে তোলবার জন্যেই। এই রচনাগুলি পড়ে লেখককে যতটা তিক্তভাবান্বিত বলে মনে হতে পারে লেখক বোধ হয় স্বভাবতঃ ততটা তিক্ততাগ্রস্ত নন, এইটুকুই শুধু আত্মপক্ষসমর্থনে বলবার।

এই গ্রন্থ প্রকাশে আমার বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের সহকর্মী ও বন্ধুরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে গাঙ্গেয় প্রকাশনীর শ্রীপরিমল চন্দ্র, 'গাঙ্গেয়' সম্পাদক শ্রীমদন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীহীরেন বসুর সহযোগিতা খুবই মূল্যবান। তাঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক প্রীতি জানাই।

'আত্মদর্শন' পাঠে বাঙালী জাতির আত্মচেতনা কথঞ্চিৎ পরিমাণেও যদি প্রবুদ্ধ হয় তা হলেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

কলিকাতা
১৮ই ভাদ্র, ১৩৬৩

গ্রন্থকার

লেখকের অন্যান্য বই

সঙ্গীত ও সমাজ

সঙ্গীত-পরিক্রমা

অম্ল-মধুর

অথ বর্ণপরিচয় কথা

বাংলার সাহিত্য

বাংলার সংস্কৃতি

প্রথম পর্ব

॥ ১ ॥

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের নির্দেশ 'আত্মানং বিদ্ধি'। সক্রেটিশ বলেছেন 'নো দাইসেল্‌ফ্'। নিজেকে জান। কেন? যেহেতু নিজেকে-না-জানা থেকেই মানুষের সমস্ত দুঃখের উৎপত্তি। অজ্ঞানতাই যত অনর্থের মূল।

কিন্তু কাজটি বড় কঠিন। মানুষ আর সব করতে পারে, কিন্তু নিজের মনের মুখোমুখি হয়ে নিজেকে যাচাই করা—উঁহু, সেটি তার দ্বারা হবার নয়। আমরা সঙ্গ ভালবাসি; বন্ধু ও আত্মীয়দের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলে আর কিছু চাই না। কিন্তু একা থাকতে আমাদের বড় ভয়। একাকিত্বের আবহাওয়া আমাদের পক্ষে শ্বাসরোধকারী আর কোন কারণে নয়, শুধু এই কারণে যে, সে সময় নিজের মন ছাড়া আর কাউকে, আর কিছুকে সঙ্গে পাওয়া যায় না। সেটা বেশীর ভাগ মানুষের পক্ষে আদৌ প্রীতিকর অবস্থা নয়।

নিজের মনের মুখোমুখি হওয়াটা একটা ব্যায়ামের তুল্য। (ব্যারামও বলতে পারেন।) মানুষ দুই কারণে এ ব্যায়াম পছন্দ করে না। প্রথমতঃ এতে কিঞ্চিৎ পরিশ্রমের দরকার হয়—চিন্তার পরিশ্রম—যা অনেকেই করতে নারাজ। চিন্তার ব্যায়াম দ্বারা স্নায়ুর পীড়া ঘটিয়ে আয়ু ক্ষয় করতে যাবে এমন মূঢ় কে আছে? দ্বিতীয়তঃ—এবং এইটেই হল আসল কারণ—, আত্মবিশ্লেষণের ফলে নিজের সম্বন্ধে ধারণা আমূল বদলে যাবার আশঙ্কা থাকে। এমন সব তথ্য উদঘাটিত হতে থাকে যার আলোকে নিজের চেহারা দেখে চমকে যেতে হয়। সত্যি আমি এত খারাপ? আমার মনের মধ্যে এত সব পাপ লুকানো ছিল—কই, কখনও তো জানতে পারি নি! আমার ভালমানুসিটা তা হলে আগাগোড়াই ফাঁকী, লোক-দেখানো!—রাষ্ট্রে ও সমাজে মুখোস পরে বেড়ানোই আমার কাজ? কই, একটি দিনের জন্যও তো মনে হয় নি কথাটা?—আত্মদর্শনই এইরূপ চিন্তার জনক।

আত্মদর্শন দু রকমের হতে পারে। ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত। ব্যক্তিগত আত্মদর্শন করতে ভালবাসেন দার্শনিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি, প্রেমিক ও পাগল। প্রেম মানুষকে একা থাকবার প্রেরণা দেয়, স্বীয় মনকে খুঁটিয়ে বিচার করতে উৎসাহী করে তোলে। সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হল পাগল, কেন না

তাঁর দর্শন একেবারে খাঁটি, খাদবিরহিত। নিজের এবং জগতের সঠিক চেহারাটা ধরতে পেরেছে বলেই সে পাগল। নইলে সাধারণ সুখদুঃখের অনুভূতি নিয়ে দশজনের ভিড়ের মধ্যেই সে মিশে থাকত। আর গোষ্ঠীগত আত্মদর্শন। সেটা সমাজতাত্ত্বিকের এলাকার বিষয়। সমাজ বা সম্প্রদায়ের তত্ত্ব যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা অজ্ঞাতসারে এই জাতীয় আত্মদর্শনই করে থাকেন।

যেমন ধরুন আমরা বাঙালী—একটা অখণ্ড জাতি বা সম্প্রদায়। আমাদের মধ্যে সমাজতত্ত্ব নৃতত্ত্ব ইতিহাস নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তাঁদের বাদ দিলে আর কেউ আমরা নিজেদের মুখোমুখি হয়েছি কখনো?—আমার তো মনে হয় না।

বাঙালী এক অদ্ভুত জাত। আপনার সম্বন্ধে তার অহঙ্কারের শেষ নেই। এক কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ববোধের শূন্যমার্গে সে অহরহ বিচরণ করে। তার ধারণা, তার মত বুদ্ধিমান, সূক্ষ্ম রুচি ও শিল্পানুভূতিযুক্ত লোক ভূ-ভারতে আর কেউ নেই। অন্য প্রদেশবাসীর প্রতি তার সীমাহীন অবজ্ঞা। অন্যান্য প্রদেশবাসী সম্পর্কে 'মেড়ো', 'খোট্টা', 'উড়ে' এগুলি হল তার দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা। বলতে একটুও মুখে বাধে না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা যে বাঙালীকে পছন্দ করে না তার কারণ তাদের অসূয়া বা বিদ্বেষবুদ্ধি নয়, বাঙালীর কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ববোধ এবং আত্যন্তিক আত্মাভিমানই তার আসল কারণ। পরকে ছোট ভাবব, অনাত্মীয় জ্ঞান করব অথচ পরের কাছ থেকে ষোল-আনা সুবিধা আদায় করে নিতে চাইব—এ কখনও হয় না। দিল্লী আগ্রা লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ প্রভৃতি শহরের প্রবাসী বাঙালীর যে সমস্যা সেইটে প্রধানতঃ এই বিসদৃশ ব্যবধানেরই সমস্যা—আত্মাভিমান বনাম আত্মাভিমানের ঠোকাঠুকির সমস্যা। প্রবাসী বাঙালীর সমস্যাকে এই দিক থেকে চিন্তা করার মত মানসিক উদারতা কয়জন বাঙালীর আছে?

বলবেন আত্মদর্শনের অছিলায় আমি স্বজাতির নিন্দা করছি; নিজের জাত-ভাইদের গালাগাল দিচ্ছি। হয়ত কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু একটু আত্ম কটূক্তি করা খারাপই বা কী এমন? চারিদিকে যখন আত্মপ্রশংসার মুখরতায় কান পাতা দায়, তখন না হয় সমতা বিধানের জন্যে একটু আত্ম-সমালোচনা করলুমই বা। এই আত্মসমালোচনার ফলে যদি অহেতুক আত্মসম্ভ্রমচেতনা কিঞ্চিৎ নষ্ট হয় তো হোক। চোরাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত

আত্মাভিমান নিয়ে আমরা কী করব? হীনম্মন্যতা—নিজেকে ছোট ভাবার অভ্যাস—অনেক দোষের আকর মানি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার না করে পারা যায় না যে, সত্যিকার জ্ঞানোদয়ের একটি অপরিহার্য প্রাথমিক সোপান হল বিনয় ও নম্রতা। যে ব্যক্তি আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা স্বীয় দোষ-ত্রুটি কখনও উদ্‌ঘাটন করে নি, এজন্যে দুঃখ পায় নি, জ্ঞানরাজ্য হতে সে বহুদূরে আছে। ভূয়োদর্শনের অন্যতম প্রধান দর্শন আত্মদর্শন। সুতরাং বাঙালীর পক্ষে কিঞ্চিৎ আত্মদর্শন এবং কিঞ্চিৎ আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে বৈকি!

বাঙালী চরিত্র এক অদ্ভুত সংমিশ্রণের ফল। তার মধ্যে বিভিন্ন বৃত্তি ও প্রবণতা একাধারে বিধৃত হয়ে আছে। তার শিরায় দ্রাবিড় রক্তের প্রবাহ তাকে বুদ্ধিমান ও কুশলী করেছে, মোঙ্গোল রক্ত দিয়েছে তাকে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও একরোখামি, আর তার আলস্য ও কল্পনাপ্রিয়তার জন্যে দায়ী তার প্রোটো-অষ্ট্রেলয়েড জন্মসূত্র। বাঙালীর মধ্যে যে আত্যন্তিক অহঙ্কারের চেতনা আমরা দেখতে পাই এবং যার কথা একটুমাত্র আগে বলেছি, সেইটে তার সহজাতও বটে আবার অর্জিত সংস্কারও বটে। অর্জিত সংস্কারটা এসেছে আর্য সংস্পর্শ থেকে—আর্যদের চরিত্রে অহঙ্কার অতি প্রবল রিপু। আর বাঙালী একাই সব দিক দিয়ে স্বকীয় বিশিষ্টতায় মণ্ডিত স্বতন্ত্র জাতি—এই সহজাত স্বাতন্ত্র্যবোধও তার আত্মাভিমানকে পুষ্ট করেছে। এই আত্মাভিমানই হয়েছে বাঙালীর সব চাইতে বড় অনর্থের কারণ। মরে গেলেও সে তার এই আত্মাভিমান ঝেড়ে ফেলতে নারাজ, আর অন্য প্রদেশবাসীরা তা পুরাপুরি মেনে নিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং ঠোকাঠুকি রোধ করে কার সাধ্য। 'আজ যা বাঙালী চিন্তা করে, কাল তা অবশিষ্ট ভারত চিন্তা করে—মহামান্য গোখেল বলে গিয়েছিলেন। কী কুক্ষণেই বলেছিলেন। তারপর আর কথাটা আমাদের মুখ থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও আলগা হল না। আত্মতৃপ্তির জাবর কেটে আমরা উক্তিটির পুনরাবৃত্তি করে চলেছি তো চলেইছি। আজ রাজনীতিক্ষেত্রে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শাসন-দক্ষতায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাঙালী কেবলই হটে যাচ্ছে, তবু তার অহঙ্কার গেল না। সেই যে মহামতি গোখেল আমাদের ভালে একবার শ্রেষ্ঠত্বের তিলক পরিয়ে দিয়েছেন তার ছাপ আর মুছল না। সর্বরিক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিষ্ফল দর্প আর অসার কৌলীন্যের নিদর্শন পৈতেগাছটার মত আমরা গোখেলপ্রদত্ত

সার্টিফিকেটটিকে হাতের মুঠোয় ধরেই আছি: বেশী তেরি-মেড়ি করো তো দেব একটা মোক্ষম শাপ ঝেড়ে। হ্যাঁ বাবা যাকে বলে ব্রহ্মতেজ! কিন্তু ব্রহ্মতেজ আপাতত ঢোঁড়া সাপের বিষে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং কারুরই ভয় পাবার কোন কারণ নেই।

যে সব কারণে আজকে বাঙালীর এই হীন দশা সমুপস্থিত তার ইতিবৃত্ত সকলেই জানেন। এখানে তার আর পুনরুল্লেখ করতে চাই না। তবে একটা কথা বলা প্রয়োজন, বাঙালীকে যদি তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে হয়, ভারত-সভায় আবার শ্রেষ্ঠ আসন নিতে হয়, তবে সর্বাগ্রে তার চরিত্রের অসঙ্গতিগুলি দূর করবার জন্যে সাধ্যমত প্রয়াস করতে হবে। অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যে আমাদের চরিত্র ভরা। যে বাঙালী বিদেশ থেকে তিন-তিনটে পাশ দিয়ে এসেছেন, মুখে বিলিতি বুক্‌নি লেগেই আছে, তিনিই আবার মনে মনে কন্যার গৌরীদান সমর্থন করেন, পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধকৃত্যে গুনে গুনে ব্রাহ্মণ ভোজন করান, হাতে তাবিজ-কবচ পরেন—এ শুধু বাঙালী চরিত্রেই সম্ভব। একই সঙ্গে কূট বৈষয়িকতা ও গীতায় ব্রহ্মবাদ, আর্টের তত্ত্ব অনুশীলন ও মক্কেলের টাকা ফাঁকী দিয়ে মেরে দেওয়া, একসঙ্গে দুসের রসগোল্লা খাওয়াকে ঔদরিকতা আখ্যা না দিয়ে শক্তিমানের লক্ষণ বলে বাহ্বাস্ফোট করা, ক্যাপিটালিস্টের অর্থে সোস্যালিস্ট কাগজ বার করা, প্রচুর বিদ্যার সঙ্গে প্রভূত পরিমাণ শয়তানি প্রত্যক্ষ করেও আতকে না ওঠা, অর্থ অসার জেনেও অর্থবানের পায়ে গড়াগড়ি দেওয়া, প্রচুর বিত্তসম্পত্তি ভোগবিলাসের আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও বৈরাগ্যসাধনার ভেক ধরা এবং পরিণামে রাজর্ষি কি এই জাতীয় কোন আখ্যা লাভ করা, মুখে সাম্য ও সমাজবাদের তত্ত্ব আওড়ে মেয়ের বিয়ে দেবার বেলায় রাজোচিত লক্ষণযুক্ত নিকষ-কুলীন পাত্র খোঁজা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের বাণী উদগীরণ করে একই কালে নীচের কোঠার মানুষের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার—বলতে গেলে এসব বাঙালীর অর্থাৎ আমাদেরই একচেটিয়া বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য জাতের মধ্যে এসব অসঙ্গতি নেই তা বলছি নে, কিন্তু আমাদের মধ্যে যত প্রকট এমন বোধ হয় আর কোথাও নয়। অসঙ্গতির বহরটা একবার চিন্তা করুন। একদিকে ছাপমারা কমিউনিস্ট, আরেকদিকে পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ চাঁচাছোলা কথায় ঘটি-বাঙাল বিরোধের নীতিতে বিশ্বাসী এবং মনে মনে মুসলমাননিধনকামী—এমন অদ্ভুত সমন্বয় আপনি আর জগতের কোন্ দেশের

মানুষের মধ্যে দেখতে পাবেন? কিন্তু একটু আত্ম-অবধান করুন, নিজেদের দিকে ফিরে তাকান, এরূপ ঢের দৃষ্টান্ত আপনার চক্ষুগোচর হবে। "রঙ্গভরা বঙ্গদেশ"—সত্যি বটে। বঙ্গভঙ্গ হয়েছে, কিন্তু তার রঙ্গ একটুও কমে নি। ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসের স্তবকের মত বাঙালীর এই রঙ্গ একটু একটু করে উন্মোচনের বাসনা রাখি।

॥ ২ ॥

কথায় বলে "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্"। কিন্তু আমার কথা (আমি বৃদ্ধ নই) শোনবার মত যদি কারও ধৈর্য থাকে, তা হলে তাঁকে আমি বলব, দয়া করে ও কাজটি করবেন না। বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করতে গেছেন কি জীবনে পদে পদে বিব্রত হতে হবে। বয়োবৃদ্ধ বলুন জ্ঞানবৃদ্ধ বলুন, বৃদ্ধদের পরস্পরের ভিতর মত ও পথের এতই বিরোধ যে, আপনি যদি সশ্রদ্ধ অন্তরে একজন বৃদ্ধের উপদেশ মত নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে চান, তা হলে বাকী অন্ততঃ পঞ্চাশজন বৃদ্ধকে আপনার চটাতে হবে। একজনকে খুশী করতে গিয়ে বাকী পঞ্চাশজনকে চিরজীবনের মত শত্রু করবেন।

বৃদ্ধের বচন ও ছাপার হরফ—এ দুটি বস্তুকে কোনদিন বিশ্বাস করতে নেই। বিশ্বাস করেছেন কি ঠকেছেন। ছাপার হরফে এত পরস্পরবিরোধী কথা এত উচ্চনাদে ঘন ঘন ঘোষণা করা হয় যে, ঐ মুদ্রিত অক্ষরের জটিল জাল ভেদ করে সত্যপথের সন্ধান পাওয়া বড় কঠিন। প্রতিটি ছাপার অক্ষরকেই যদি পোপের বিধানের মত 'অভ্রান্ত' বলে মানতে হয়, পৃথিবীতে পথ আপনি কোনদিন খুঁজে পাবেন না; কেবলই অন্ধকারে হাতড়ে বেড়িয়ে স্বীয় শক্তি ও আয়ু ক্ষয় করবেন।

অথচ এ ভুল আমরা প্রায়শ করি। প্রতিটি মুদ্রিত অক্ষর ও প্রত্যেক বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করতে গিয়ে আমরা স্বীয় জীবনকে অত্যন্ত জটিল করে তুলেছি। আমরা কেবলই পথ থেকে পথান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর মতামতের জট পাকাচ্ছি। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন মনীষীর পরস্পরবিরোধী মতের গুঁতোয় আমরা কাহিল; সাহসে ভর করে কোন একটা বিশেষ আদর্শকে অবলম্বন করব, তার উপায় নেই। সেই পথ মহাপুরুষেরা এবং তাঁদের দালাল লেখকেরা নিজের হাতেই বন্ধ করে গেছেন। আমরা মতামতের গোলকধাঁধায় শুধু প্রবেশ করতেই পারি, তার থেকে বেরিয়ে আসার কৌশল জানি না।

বলা বাহুল্য, আমাদের দোষ এতে অল্প। ন্যায়শাস্ত্রের যাঁরা রচয়িতা তাঁদেরকেই এজন্যে দায়ী করতে হয়। কেন বলি। ন্যায়শাস্ত্রে চারটি সূত্র থেকে জ্ঞান আহরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের একটি সূত্র হল 'Authority'। অর্থাৎ প্রামাণ্য-সূত্রে যা কিছু জানবে শুনবে পড়বে, তাকে বিনাপ্রতিবাদে মেনে নেবে। পরম্পরাগত ঐতিহ্য, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান (এবং বৃদ্ধের বচন)—এগুলির প্রতি কস্মিনকালে সন্দেহ পোষণ করবে না, করলে অথরিটিকে অবমাননা করা হবে। আমরা মুখে আধুনিকতার যতই বড়াই করি না কেন, এই অথরিটি-প্রীতি আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল। ছোটবেলা থেকে পাখীপড়ার মত করে কেবলই আমাদের শেখানো হয়েছে যে, বৃদ্ধের বচন অমান্য করলে দোষ; সেই বাল্যের সংস্কার আমাদের নূতন পথে চলতে নিয়ত বাধা দেয়। ছাপার হরফের প্রতি আমাদের অতিরিক্ত শ্রদ্ধাভক্তির কারণও তাই।

সুতরাং নূতন পথে যদি আমাদের অভিযান করতে হয় তা হলে এই বালকোচিত মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ, অথরিটির মোহ বিসর্জন দিতে হবে। কিন্তু বলা যত সহজ, করা তত সহজ নয়। পরম্পরাক্রমে বাহিত স্তূপীকৃত জ্ঞানের সংস্কার আমাদের বোধ ও বুদ্ধিকে এমনি আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে তার শিকল কেটে বেরিয়ে আসতে চাইলেই বেরিয়ে আসা যায় না। বিভিন্ন মহাপুরুষের বাণী, বিভিন্ন বৃদ্ধের বচন, মুদ্রিত অক্ষরের অন্তর্গত বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী ভাব আমাদের মস্তিষ্কের আধারে কেবলই ঠোকাঠুকি করে মরছে। তার অক্টোপাস পেষণ থেকে অব্যাহতি পাওয়া বড় শক্ত। মত ও মতান্তরের গহন অরণ্যে আমরা অসহায় সব পথভোলা পথিক; বিভ্রান্ত, বিমূঢ়। কে আমাদের পথের দিশা দেখাবে? সেই পথ কি সত্যি আছে, না, এই পরম্পরাবাহিত জ্ঞানের চর্বিত চর্বণের যুগে তেমন লোক কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে?

ঠাট্টা নয়, সত্যি আমরা পথ খুঁজে পাচ্ছি নে। স্বীয় বিচারবোধ দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে কোন একটা বিশেষ পথকে যে আঁকড়ে ধরব তেমন মনোবল আমাদের অনেকেরই নেই। থাকবার কথাও নয়, কেন না আমাদের বিচারবোধ জিনিসটা অথরিটির অনাবশ্যক হস্তক্ষেপে গোড়া থেকেই 'কণ্ডিশনড্'— বিকৃত। তাই ঘড়ির দোলকের মত মত থেকে মতান্তরে আমরা কেবল দোল খেতেই পারি, নিজের চিন্তা ও চেষ্টাকে একটি মাত্র লক্ষ্যের দিকে উদ্যত

করে রাখতে পারি না। এ দোষ আমাদের নয়; আমাদের যাঁরা শিখিয়েছেন পড়িয়েছেন তাঁদের দোষ, শিক্ষাপ্রণালীর দোষ, সমাজব্যবস্থার দোষ। শত সমস্যা ও প্রশ্নকণ্টকিত বিশ শতকের পঞ্চম দশকে আমাদের মনের গতি এই পথে ছাড়া অন্য পথে মোড় নিতে পারে না। অনৈশ্চিত্যের দোলায় সতত দোদুল্যমান হওয়া আমাদের বিধিলিপি।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই। ছোটবেলায় পড়েছি—সরল, অনাড়ম্বর জীবন-যাপনই আদর্শ পথ। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ভারতীয় মহাপুরুষের বাণী, বুনো রামনাথের দৃষ্টান্ত, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী, রবীন্দ্রনাথের 'বিলাসের ফাঁস', স্মাইল্‌স্-এর নীতিকথা, রাস্কিনের সারল্যবাদ, টলষ্টয়ের শেষ জীবনের দৃষ্টান্ত ও রচনা, গান্ধীজীর সারল্যের দৃষ্টান্ত প্রভৃতির দ্বারা যখন নিজেকে সেইভাবে গড়ে তুলতে যাচ্ছি, অমনি নতুন যুগের বাণী শোনা গেল—আড়ম্বরহীনতা রিক্ততার লক্ষণ, সারল্য দারিদ্র্যের রকমফের মাত্র। পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতায় বর্ধিত ভোগসুখপরায়ণ মানুষের কাছে সারল্যের বিশেষ কোন দাম নেই; ওদেশের অর্থনীতিবিদদের চোখেও ও বস্তুটির মূল্য খুব বেশী নয়। এ যুগের পাশ্চাত্য সভ্যতার গোটা কাঠামোটাই আড়ম্বর ও সমারোহের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এর জন্যে ইউরোপের লোকেরা যে কিছু সঙ্কুচিত বা লজ্জিত তার কোন প্রমাণ নেই; আমেরিকার লোকেরা তো তাদের চটকদার সভ্যতার জন্যে রীতিমত গর্বই বোধ করে থাকে। আর সত্যি বলতে, যতই কেন না বুনো রামনাথের তিন্তিড়ি পত্রের ঝোল খাওয়ার প্রশংসা করি, আড়ম্বর ও জাঁকজমক সম্পর্কে আমাদের মনেও মোহ কিছু কম লুকিয়ে নেই। কারও সঙ্গে নূতন আলাপ পরিচয়ের সময় আমরা প্রথমেই তার বেশভূষা ও সজ্জাভঙ্গিমা লক্ষ্য করি, আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে মনে মনে পরিমাপ করতে চেষ্টা করি লোকটি দরিদ্র কিংবা ধনী; দরিদ্র হলে কত দরিদ্র, ধনী হলে কত ধনী। আমাদের অনুমান প্রায়শ ভুল হয় না। কারণ এ সমাজে ধনী তার সঙ্গতি অনুযায়ী অঙ্গসজ্জা করে, গরীব তার সামান্য আয়ের মধ্যে বেশভূষার খরচ সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করে। এইটেই নিয়ম। কোটিপতি হয়েও যিনি পায়ে তালতলার চটি আর গায়ে ফতুয়া চড়িয়ে লোকসমাজে বহির্গত হন, হয় তিনি কপট বিনয়ীর চূড়ামণি, নয়তো আচার্যদেবের শোধনাতীত কোন শিষ্য।

আরেকটি দৃষ্টান্ত। এক শ্রেণীর জ্ঞানীরা বলেন, জীবন সম্বন্ধে সমগ্র

দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করাটাই হচ্ছে আদত; এঁরা জীবনের প্রতিটি বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে কিছু না কিছু জ্ঞানার্জন করার কথা বলেন। জীবন সম্বন্ধে একটা অখণ্ড বোধ, একটা comprehensive outlook আয়ত্ত হলে এঁরা মনে করেন জীবনের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করা হল। নজীর হিসাবে এঁরা ফরাসী সংস্কৃতির উল্লেখ করেন। ফরাসী সংস্কৃতির রসে যিনি পুষ্ট, তিনি কোন একটি বিশেষ বিষয়ে হয়ত বিশেষজ্ঞোচিত জ্ঞান অর্জন করেন না, কিন্তু সব বিষয় সম্পর্কেই তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত পরিষ্কার একটি ধারণা থাকে। আপনি হয়ত এই মতের উপর আপনার সমগ্র বিশ্বাসের নির্ভর স্থাপন করে জীবনের প্রতিটি বিভাগের জ্ঞান আহরণের জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলেন, কাছেই কোথাও কোন 'স্পেশ্যালিস্ট' ওৎ পেতে বসে আছেন, তিনি আপনাকে তাঁর বিশেস বিভাগের বিদ্যার চমক লাগিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবেন। স্পেশ্যালিস্ট আজকাল পথে ঘাটে ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে; কুড়িয়ে নিলেই হল। বেশী দূর যেতে হবে না, এই কলকাতা শহরেই এমন সব অধ্যাপক আছেন যাঁরা নিজ নিজ বিভাগে বিদ্যের জাহাজ, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে একেবারে গবেট। এঁদের একটু আঁচড়ালেই বুঝতে পারবেন, এঁদের সাধারণ জ্ঞানের দৌড় কতদূর।

তৃতীয় উদাহরণ। অনেক ভারতীয় মনীষীই দারিদ্র্যের মহিমা কীর্তন করে গেছেন। মহাত্মা গান্ধী স্বেচ্ছা-দারিদ্র্যের পক্ষপাতী ছিলেন; জনৈক কবি লিখেছেন, "হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান, তুমি মোরে দানিয়াছ খৃষ্টের সম্মান।" আবার আজকে পাশ্চাত্যের অনেক বিখ্যাত লেখকই বলছেন, দারিদ্র্য জীবনের সব চাইতে বড় অভিশাপ। আমাদের চাণক্য পণ্ডিতেরও এই মত ছিল। বার্ণার্ড শ'র কথা হল: "The evil to be attacked is not sin, suffering, greed, priestcraft, kingcraft, demagogy, ignorance, drink, war, pestilence, nor any other of the scapegoats which reformers sacrifice but simply poverty". কিঞ্চিদধিক একশো বছর আগে মার্ক্স 'Communist Manifesto'-তে লিখলেন, শ্রেণী-সংগ্রামই হচ্ছে ইতিহাসের ভিত্তি; এ যুগে গান্ধীজী এসে সেই মত পাল্টে দিয়ে বললেন যে, না, শ্রেণী সমন্বয়ই হল আসল কথা; চাই change of heart, হৃদয়ের পরিবর্তন, শ্রমিক-মালিকের সংঘর্ষ নয়। অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কেউ কুটিরশিল্পের পক্ষপাতী, কারও বড় বহরের যন্ত্রশিল্প পছন্দ। কেউ চাচ্ছেন

শিল্পের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধিকার; কেউ 'ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী। গান্ধীজী বলছেন, বিকেন্দ্রীকৃত, স্বয়ং-নির্ভর ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম-পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থাই ভারতের মুক্তির পথ; প্রতিবাদীরা বলছেন, ওটা মধ্যযুগে ফিরে যাওয়ার রাস্তা—ঘড়ির বিপরীতমুখী গতি। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর"; নূতনপন্থীরা বললেন, "অরণ্যকে নগর করাই হচ্ছে এ যুগের সাধনা; চাই 'urbanisation' নগরায়িতকরণ।" কেউ বলছেন, ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস উপস্থিত; কারও বিশ্বাস, ধনতন্ত্রের প্রগতিশীল ভূমিকা এখনও নিঃশেষিত হয় নি। একদল চাচ্ছে রাষ্ট্রের খণ্ডিতকরণ; আরেক দল অখণ্ডতা। কেউ স্বাতন্ত্র্য; কেউ কেন্দ্রের অপ্রতিহত ক্ষমতা। কেউ জাতীয়তা, কেউ আন্তর্জাতিকতা।

সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনেও দেখি, ঐ একই ধরনের ঠোকাঠুকি চলছে। আমাদের প্রাচীন ঋষিদের আদর্শে আমরা ব্রহ্মচর্যের উপর অতিরিক্ত জোর দিচ্ছি; বার্টরাণ্ড রাসেল, এলিস প্রমুখ বিদেশী মনীষীরা বলছেন, ব্রহ্মচর্য প্রায় ক্ষেত্রেই অবদমনের নামান্তর। সুনীতিবাদের ধ্বজাধারীরা ল্যাঙট-কৌপীন স্তূপীকৃত করে তুলছে; যাদের ওসব বালাই নেই তারা আবার উল্টো পথে যৌন-মুক্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। যোগীরা বলছেন, চিত্তবৃত্তিনিরোধের একমাত্র উপায় যোগ-সাধনা; বিরুদ্ধবাদীরা বলছেন, কর্মে লিপ্ত হয়ে থাকাই চাঞ্চল্য দমনের প্রশস্ত উপায়। কারও কাছে পূজা-মণ্ডপে বসে ঈশ্বর আরাধনাই ধর্মোপলব্ধির পথ; কেউ বলছেন, সমাজসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; সাম্যবাদীদের চোখে আবার রাষ্ট্রই হচ্ছে সব চাইতে বড় 'চার্চ'। গান্ধীজীর বিচারে অহিংসা সর্বধর্মের সার; সাম্যবাদীরা স্বকার্যসাধনে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করেন না। গান্ধীবাদীর চোখে উদ্দেশ্যের ন্যায় উপায়টাও মহৎ; সাম্যবাদীরা বলছেন, উদ্দেশ্যই আসল, উদ্দেশ্যসিদ্ধি করতে গিয়ে কী উপায় প্রযুক্ত হল সেটা ধর্তব্য নয়।

ব্যক্তিগত জীবনে যে লোক স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রতি কর্তব্যপালন করে, তাকে আমরা দায়িত্ববোধসম্পন্ন বলে প্রশংসা করি; আবার যে ব্যক্তি পরিবারের বন্ধন কাটিয়ে বৃহত্তর কার্যে আত্মনিয়োগ করে, তার দায়িত্বহীনতাটুকু আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। তখন আমরা তাকে বীর বলে অভিনন্দন জানাতে ছুটে যাই। যে লোক কাজে ফাঁকী দেয় না তারও প্রশংসা করি;

আবার যে কাজে ফাঁকী দিয়েও চাকুরী বজায় রাখে তারও প্রশংসা করি। যে সহজ ভাষায় সাহিত্য রচনা করে তার লেখার প্রশংসা করে বলি, 'কী সহজ সুন্দর ষ্টাইল'! আবার যে লেখক চটকদার ভাষা ব্যবহার করে তাকেও প্রশংসা করে বলি, 'দেখেছো, ভাষার কী চমক'! যে ব্যক্তি ধীরস্থিরভাবে কথা বলে তার শান্ত সৌম্য ভাবকে প্রশংসা করি; আবার একই নিঃশ্বাসে বাকপটু ব্যক্তির ক্ষিপ্রতা ও চটপটে ভাবকেও প্রশংসা করি। যে বিনয়ী নম্র অমায়িক, তাকে লক্ষ্য করে বলি, লোকটা কী চমৎকার! আবার যে স্পষ্টবক্তা রূঢ়ভাষী পরের অবাধ্য, তাকেও প্রশংসা করে বলি, 'দেখেছো, লোকটা কত স্বাধীনচেতা, কী ব্যক্তিত্বের জোর!'

আর কত দৃষ্টান্ত দেব! পুথি বাড়িয়ে লাভ দেখি না। এই-যে 'এটাও ভাল ওটাও ভাল' মনোভাব, ছোটবেলা থেকে আমাদের পরস্পর-বিরোধী মতামত গেলানোর ফলেই এইরূপ হয়েছে। রামও ভাল, রহিমও ভাল। আমাদের ব্যবহারের এই অসঙ্গতির জন্যে দায়ী পরস্পরবিরোধী ঐতিহ্যের সংস্কার, ছাপার হরফ এবং —বৃদ্ধের বচন।

॥ ৩ ॥

বাঙালী সাহিত্যপ্রিয় জাতি এইরকম একটা কথা শুনে আসছি। শুধু তাই নয়, আত্মতুষ্টির বশে কেউ কেউ এমন পর্যন্ত বলেন যে, বাঙালীমাত্রেই এক এক জন খুদে কবি।

কথাটি কি সত্য? গড়পরতা বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পদ্ধতি অথবা আচরণ কোনটাই এই ধারণার অনুকূলে প্রতীতি জন্মায় না। সাহিত্যসৃষ্টি কিংবা সাহিত্যোপভোগ এ দুয়ের কোনটাই হেলাফেলার বস্তু নয়। সাহিত্য-সৃষ্টির কাজে যেমন চাই সৃজননৈপুণ্য, কল্পনাশক্তি, বিদ্যা ও বুদ্ধি, তেমনি সাহিত্য রসোপভোগের বেলায় চাই পূর্ব-প্রস্তুতি, শিক্ষার্জিত সংস্কার এবং মানসিক সক্রিয়তা। সাহিত্য ভালবাসব বললেই সাহিত্য ভালবাসা যায় না, তার জন্যে আগে থেকে নিজেকে তৈরী করতে হয়। সাহিত্য অবকাশরঞ্জনী বটে, তবে অবকাশেরও একটা ইতিহাস আছে। ইতিহাসটুকু তৎপরতা দিয়ে ভরা।

সাহিত্যোপভোগের পক্ষে অপরিহার্য এই পূর্ব-প্রস্তুতি কয়জন বাঙালীর মধ্যে দেখা যায়? অক্ষরজ্ঞান অথবা উচ্চপক্ষে স্কুল কলেজের শিক্ষা—

এইটেই তো সাহিত্যরসানুভূতির পক্ষে যথেষ্ট নয়। উকিলের মুহুরী কিংবা মোকদ্দমার 'টাউট' হতেও শিক্ষা লাগে, আবার মুদি-দোকানের খাতা লেখার কাজেও শিক্ষা চাই। কিন্তু এই শিক্ষা সাহিত্যোপভোগের বেলায় কতটুকু কাজে লাগে? বেশীর ভাগ মানুষই তো দেখি দিবা রাত্র রোজগারের ধাঁধাঁয় ঘুরছে। এবং যে সময়টা রোজগারের ধাঁধাঁয় ঘুরছে না সে সময়টা রকে বসে আড্ডা দিয়ে কাটাচ্ছে, নয়তো রেষ্টুরান্টে বসে রাজা-উজীর মারছে, নয়তো সিনেমায় ভিড় জমাচ্ছে, নয়তো খেলার মাঠে গলা ফাটাচ্ছে। যাঁদের অর্থভাবনা নেই তাঁদের একাংশ সামাজিক প্রতিষ্ঠার আলেয়ার পিছনে চরকীবাজীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে; একাংশ নানা রকম ফূর্তি নিয়ে ব্যস্ত; একাংশের নেশা জুয়া খেলা, একাংশের রেস। আবার এক শ্রেণীর বড়লোক আছেন—যাঁরা সমাজে 'অভিজাত' এই গালভরা নামে পরিচিত—তাঁরা ধনের বোঝা বয়ে বেড়িয়ে ক্লান্ত। স্তূপীকৃত ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করতে করতে তাদের নাকি ঐশ্বর্যে বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। সাহিত্য অনায়াসেই এঁদের ক্লান্তি অপনোদনের একটা উপায় হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের ধার দিয়েও এঁরা ঘেঁসেন না। সাহিত্য অব্যাপারীর অনধিগম্য—তাকে আয়ত্ত করতে হলে কিছু পরিমাণে সাধনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু অত ঝামেলা পোয়াবার মত সময় এই সব ঐশ্বর্যের চূড়ার উপর আসীন তথাকথিত অভিজাতদের নেই। তাঁরা সাহিত্য ভালবাসেন না, তাঁরা ভালবাসেন 'কালচার', একেবারে জার্মান 'কুলটুর'-এর ভারতীয় সংস্করণ। সাহিত্যের চাইতে সেটা অনেক বড় জিনিস। যথা, নিউ এম্পায়ারে নাচের শো'র তদারিক করা, দল বেঁধে আর্ট-একজিবিশন দেখতে যাওয়া এবং যে ছবি সব চাইতে নিকৃষ্ট তাকে সব চাইতে বেশী দাম দিয়ে কেনা, গবর্ণমেন্ট হাউসে স্বদেশী গভর্ণরের নেতৃত্বে বৃক্ষরোপণ কিংবা সূত্রযজ্ঞ স্থানীয় উৎসবে যোগ দেওয়া, ইত্যাদি ও প্রভৃতি। এবং এ সবের সুযোগে—এইটেই হল মোক্ষম কালচার—পরের ঝিয়ারির সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করা, কিংবা ক্ষেত্রান্তরে—মাপ করবেন—পরপুরুষের কাছে ঝুলে বেড়ানো। ঐশ্বর্যের ক্লান্তি অপনোদনের এর চাইতে ভাল ওষুধ আর কী হতে পারে?

লোকে বলে দারিদ্র্য একটা অভিশাপ। অভিশাপ না হাতী! তারা তো আর জানে না বড়লোক হওয়ার কত জ্বালা! তারা শুধু ধনীর

বিলাসভোগের সমারোহটাই দেখে, দেশের কালচার রক্ষার কত বড় গুরু দায়িত্ব ধনীনন্দনদের স্কন্ধে অর্পিত সেটা তারা এক মুহূর্তের জন্যেও ভেবে দেখে না। খেতে না পেয়ে ঠাণ্ডা মেরে যাওয়াটাই তো একমাত্র কষ্ট নয়, কিংবা কতটুকু কষ্ট! তার চাইতেও অনেক বড় কষ্ট আছে। যাকে বলে 'মহৎ দুঃখ', এই যেমন ঐশ্বর্যের বদহজম হওয়া, 'দৃষ্টিপাত'-এর চারুদত্ত আধারকরের মত প্রেমে ব্যর্থ হয়ে 'বেউলা' বাজানো, অপরিমিত মদ খাওয়া এবং কিছুই না করা, সংসারের প্রতি আপাত-বৈরাগ্যবশতঃ সিল্কের গেরুয়ায় মণ্ডিত হয়ে কোন ইনটেলেকচুয়াল সন্ন্যাসীর শরণ লওয়া, ঘরে বউ থাকতেও পরের বউয়ের জন্যে হা-হুতাশ করা কিংবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করার ক্লেশ স্বীকার করা ইত্যাদি। দারিদ্র্য-দুঃখ এর কাছে কোথায় লাগে?

ঠাট্টা নয়। সত্যিই কি সাহিত্য আমরা ভালবাসি? সাহিত্য কি আমাদের জীবনে বেঁচে আছে? ভাব দেখে তো মনে হয় না। শতকরা নিরানব্বইটি বাঙালী জৈবজগতের সাধারণ সাধনার ঊর্ধ্বে আজও উঠতে পারে নি, এ কথা বললে আশা করি সত্যের অপলাপ করা হবে না। আহার নিদ্রা মৈথুনাসক্তি ছাড়া আর কোন আসক্তি তাদের আছে এমন অপবাদ তাদের শত্রুতেও দেবে না। বাইরের জগতে যেটুকু কর্মতৎপরতা তাদের মধ্যে দেখা যায় সেটি এই ত্রিবিধ জৈব-আসক্তির কোন না কোন একটির অংশ ও অধীন। রোজগারের ধাঁধাঁয় ঘোরাটা আহারের চেষ্টায়, পরিশ্রমটা চোখে নিদ্রা আনবার জন্যে, আর আহার ও নিদ্রা হল শেষোক্ত প্রক্রিয়ার আবশ্যিক প্রস্তুতি-পর্ব। সুতরাং বাঙালী সাহিত্য ভালবাসে বললেই সে কথা আমরা শুনব কেন?

বরং সাহিত্য ভালবাসে না এইটেই তো অহরহ চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি। যে সমাজে ভদ্র ও সজ্জন মানুষের চাইতে চোরাকারবারীর কদর বেশী, বামাবিলাসী নির্লজ্জ পলিটিশিয়ান যে সমাজের মাথা, ধনের কৌলীন্য যেখানে সামাজিক স্বীকৃতির একমাত্র ছাড়পত্র, সে সমাজের মানুষের সাহিত্যপ্রীতি বস্তুটি কী পরিমাণ আন্তরিক তা আর বলে বোঝাবার দরকার করে না। সাহিত্য যদি সত্যই আমাদের গর্বের বিষয় হত তা হলে আমাদের হাতে সাহিত্যকর্মী তার প্রাপ্য মর্যাদা পেত— তাকে অনাদরে অবহেলায় অনটনে তিলে তিলে দগ্ধে মারতুম না।

শিল্পী কবি সাহিত্যিক শ্রেণীর মানুষদের আমাদের বড় অবিশ্বাস। তাঁদের আমরা ভাবি হয় অ্যাবনর্মাল নয় সাব-নর্মাল। তাঁদের সাধারণ সুখদুঃখময় সামাজিক মানুষের মর্যাদা দিতে আমরা নারাজ; তাই সামাজিক সুবিধাগুলি তাঁদের ধরে দিতে আমাদের এত কার্পণ্য। শিল্পী-সাহিত্যিকেরা অবশ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশী নন, সামাজিক সুখ-সুবিধার প্রতি দৃকপাত মাত্র না করে আত্ম-আরোপিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালন করে যাওয়াই হল তাঁদের ধর্ম এবং সেই ধর্মপালনে তাঁরা বদ্ধপরিকর। কবি রিলকের মত তাঁরা বিশ্বাস করেন এই কথা যে, দারিদ্র্য মানুষকে মহৎ সৌভাগ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। কিন্তু বেঁচে থাকার ন্যূনতম দাবী বলে একটা কথা আছে; সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে হলে সর্বনিম্ন কতকগুলি প্রয়োজন পূরণ হওয়া দরকার। সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বাঙালী সমাজ এই ন্যূনতম দায়িত্ব পালন করছে কি? সাহিত্যিককে 'সৃষ্টিছাড়া' 'অপদার্থ' বল ক্ষতি নেই, কিন্তু সাহিত্যকর্মের বিনিময়ে তাঁর যে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার আছে সেই আবশ্যিক শ্রমমূল্য কেন তাঁকে দেবে না? সকল শ্রেণীর মানুষেরই পরিশ্রমের একটা মজুরী আছে এবং সে মজুরী আদায়ের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ আয়োজনও আছে। কিন্তু সাহিত্যকর্মের কোন মজুরী নেই, মজুরী চাইলেও সেটা না-মঞ্জুর হওয়া নিয়ম। কিংবা যে মজুরী ধরে দেওয়া হয় তাতে দিন-মজুরের পক্ষেও লাল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। ক্রোধে নয়, লজ্জায়।

বলা হবে রবীন্দ্রনাথ এ সমাজেরই একজন ছিলেন—তাঁকে তো তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে আমরা ভুলি নি? হয়ত ভুলি নি, কিন্তু তার কারণ পুরাপুরি বোধ করি সাহিত্য নয়। অন্যতম কারণ তাঁর চেহারা। ধন-কৌলীন্যে আর চেহারা-কৌলীন্যে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী সমাজের কাছে 'লেজেণ্ড' হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বাঙালীর বীরপূজার তৃষ্ণা বহুলাংশে চরিতার্থ হয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, তার বেশী কিছু নয়। সাধারণ বাঙালীর কল্পনা ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে সাহিত্যিক-রবীন্দ্রনাথ অবধি পৌঁছতে পারে নি—কল্পনা তার আগেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য বাঙালী সমাজ থোড়াই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য উপভোগ করতে হলে যে পরিমাণ শিক্ষা ও রুচি দরকার,

সাম্প্রতিক বাঙালী সমাজে সে শিক্ষা ও রুচি কোথায়? স্থূল রসের পূজারীর মধ্যে উচ্চরসের গ্রহিষ্ণুতা কেমন করে থাকবে? বলেছি তো, আধুনিক বাঙালী বিদ্যাবিমুখ, ঐহিক ভোগতৃষ্ণাপরায়ণ, সাংসারিক প্রতিষ্ঠার কাঙাল, ধনলোভী, আড্ডাবাজ আর আমুদে। বাতিক আর শখ তার অজস্র, কিন্তু কোনটাই আত্মোন্নতির সহায়ক নয়। পরচর্চায় ওস্তাদ, কিন্তু আত্মচর্চায় মন নেই। নিজের শ্রী বাড়াবার চেষ্টা নেই, পরের শ্রী দেখে জলুনিপুড়ুনি আছে। বিদ্বানকে পাত দেয় না, ধনীর দুয়ারে রবাহুতভাবে পাত পেতে বসে খাওয়ার হ্যাংলামি আছে। তালিকাটিকে আরও অনেক টেনে বাড়াতে পারতুম। কিন্তু শত হলেও জাতভাই তো বটে। স্বমুখে আত্মনিন্দা আর কত করব?

সাহিত্যিকদের দুরবস্থার কথা বলছিলাম—সে কথাই বলি। সেই যে কোন্ এক ধনী একবার ট্রেনে রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'লেখেন তো বুঝলাম, কিন্তু মশায়ের কী করা হয়?'—সেইটেই হচ্ছে সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে সমগ্র বাঙালী জাতির একমাত্র প্রাণের কথা। এ সমাজে লেখা দিয়ে লেখকের পরিচয় নয়; লেখকের আরও একটি উদ্বৃত্ত পরিচয় থাকা দরকার। অর্থাৎ সাহিত্যিক হিসাবে সাহিত্যিকের মর্যাদা এখানে স্বীকৃত নয়। সামাজিক স্বীকৃতি পেতে হলে সাহিত্যিককে আরও কয়েকটি অতিরিক্ত তল্পী ঘাড়ে বয়ে বেড়াতে হবে। সাহিত্যিকের মর্যাদা যেখানে এই, সেখানে খোদ্ সাহিত্যের মর্যাদাই বা কতটুকু আশা করা যায়? মনে রাখতে হবে এ সমাজ সেই সমাজ, যেখানে পড়বার বই চাইলে হাতের মধ্যে পাঁজি গুঁজে দেওয়া হয়; বাড়িতে অনেক বই থাকলে পুরনো বইয়ের কারবার আছে কি না শুধোয়; অনেক রাত জেগে বই পড়লে সন্দেহ করে লুকিয়ে জাল নোট তৈরী করছে কি না এবং মৌলিক কিছু লিখবার চেষ্টামাত্রে সংশয়াপন্ন হয়ে ওঠে লেখাটা টুকলি নয় তো? সেই সমাজ, যার 'কালচার' হল মাতৃভাষা উপেক্ষা করে কৃত্রিম বিলিতি কায়দায় শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিলিতি বুকনি কপচানো, আর 'সংস্কৃতি' হল রকে বসে ডালমুট চিবোনো আর হাফ-চায়ের সঙ্গে 'দৈনিক বসুমতী' পাঠ। অর্থাৎ একই পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা ও রসদৈন্যের এপিঠ আর ওপিঠ।

মাতৃভাষার অনাদরের প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ে গেল। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের জনৈকা মহিলা একবার শরৎচন্দ্রের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এই অনুরোধ নিয়ে যে, তিনি (শরৎচন্দ্র) যদি তাঁর ছেলেকে বাংলা ভাষাটা একটু

দেখিয়ে শুনিয়ে দেন তা হলে তাঁর ছেলে বাংলায় দুটো চারটে বই লেখার চেষ্টা করতে পারে শরৎচন্দ্রের মত। শরৎচন্দ্র সবিনয়ে ছেলের বাংলা জ্ঞানের দৌড় জানতে চাইলে পুত্রগর্বে গরবিনী মাতা দীপ্তমুখে জানালেন, তাঁর পুত্র 'বোধোদয়' ছাড়িয়ে 'দ্বিতীয় পাঠ' ধরেছে; এখন তিনি একটু লেখার কায়দাটা ধরিয়ে দিলেই বাস, আর দেখতে হয় না, 'শ্রীকান্ত' 'চরিত্রহীনের' মত বই কোন্ না তাঁর ছেলেও লিখতে পারবে!

অর্থাৎ 'বোধোদয়' থেকে এক লাফেই দিগ্বিজয়ী সাহিত্যিক! ভদ্রা-মহিলার দৃষ্টিভঙ্গী শুধু তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীই নয়, এর মধ্যে সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে সমগ্র বাঙালী সমাজের মানসিকতার একটা প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। সাহিত্যসাধনাকে বড় বেশী অনায়াসসাধ্য ব্যাপার মনে করা হয় এ সমাজে। যেন কলম ধরলেই লিখিয়ে হওয়া যায়। সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে হেলাফেলার মনোভাবের যে এইটেও একটা কারণ নয় তা কে বলবে?

॥ ৪ ॥

বাংলা দেশের উচ্চ মহলে কিছুদিন ধরে একটি নতুন উৎপাত সুরু হয়েছে—পরের লেখা নিজের বলে চালিয়ে দেবার হিড়িক। কারও লেখা নিজের নামে বেরুল কি অন্য কারও নামে বেরুল এতে অবশ্য জন-সাধারণের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না—মামলাটা নিছকই দুইজন ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যাঁর লেখা মেরে দেওয়া হয় এবং যে লেখা মেরে দেয় এ দু'জন ছাড়া আর কারও পক্ষে বিষয়টির হদিস পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু নীতির দিক থেকে ব্যাপারটা অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি না সন্দেহ। আজ জীবনের সর্বস্তরে সর্বশ্রেণীর মানুষের ভিতর যে নীতির ব্যভিচার চলছে তা মাত্র কয়টি গতানুগতিক ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; নীতিহীনতা আজ বহুমুখী, সহস্র দিকে তার অভিযান। সেই বহুমুখী নীতিহীনতারই একটি বিষাক্ত সূচীমুখ হল উপরি-উক্ত উৎপাত। উৎপাতটির উৎখাত হওয়া দরকার তাতে আর সন্দেহ কোথায়?

লক্ষ্য করে থাকবেন নিশ্চয়, কোন কোন লোক হঠাৎ প্রকাণ্ড লেখক বা গ্রন্থকার হয়ে যায়। হু হু করে তাঁর নামে নিত্য নতুন বই বেরোতে

গ্রীক নাটকে নেমেসিস্—কোন বিষয়ই তাঁর লেখনীতে অপাংক্তেয় নয়। সকল বিষয়ই তিনি সমান স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে আলোচনা করছেন, প্রতিটি কথা বিশেষজ্ঞোচিত মুন্সিয়ানা নিয়ে বলছেন—এ কি একটা কম কথা হল? লোকে অবাক হয়ে যায়, ভাবে, লোকটা কত বড় বিদ্যের জাহাজ—কত বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য। সেই অভ্রংলেহী পাণ্ডিত্যের চূড়ার তলায় দাঁড়িয়ে বাস্তবিক নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ও ছোট মনে হয়। বহুমুখী পাণ্ডিত্যের থাবড়া খেয়ে কেউ কেউ একেবারে চুপসে এতটুকু হয়ে যায়।

কিন্তু এই সব সাধারণ লোক একটু খোঁজ নিলে দেখতে পেত, বহুমুখী পাণ্ডিত্যের রহস্য কোনখানটায়। দেখতে পেত যাঁকে তারা পণ্ডিত বলে ধরে নিয়েছে তিনি আসলে একটি গবেট মূর্খ কিংবা বড়জোর তাদের দশজনেরই একজন। শুধু অর্থকৌলীন্যের জোরে ভুঁইফোঁড় পণ্ডিত বা গ্রন্থকাররূপে হঠাৎ ফেঁপে উঠেছে। সংসারে টাকায় কী না হয়। টাকায় বিশ্বজন মূর্খের পায়ে প্রণাম নিবেদন করে; রূপসী নারী কুৎসিৎকে হৃদয় সঁপে দেয়; ভাঁড়ের বাড়া সম্মান যার প্রাপ্য নয়, গবর্ণমেন্ট তাকে খেতাব দিয়ে সম্মান জানায় আর, আর— অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হতে অনুরোধ করে; ক্লাশ সেভেনের বিদ্যে যার নেই বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডি-লিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে, ততোধিক নিজেরা সম্মানিত হয়, বাপ ছেলের কথায় উঠ্‌বোস করে; উত্তম অধমের কাছে কেঁচো হয়ে থাকে এবং আরও কত কী! এই যেখানে অবস্থা, সেখানে রাতারাতি পাণ্ডিত্য-খ্যাতি অর্জন এমন কী কঠিন বস্তু! হাতের কাছে দুঃস্থ সাহিত্যিক ও পণ্ডিতের দল তো রয়েইছে। তাঁদের ক্ষুধিত মুখের সামনে দুচারটে ভাঙা রুটির টুকরো ছড়িয়ে দিলেই যখন তাঁদের দিয়ে যা-কিছু লিখিয়ে নেওয়া যায়, তখন আয়াস স্বীকার করে খেটেখুটে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে যায় কোন্ মূঢ়? রাতারাতি কথাসাহিত্যিক হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করতে চাও? ভাবনা কি!—অমুক কথাসাহিত্যিক অভাবের দায়ে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হয়ে আছেন। তাঁর চমৎকৃত চক্ষুর সামনে কয়েকটি গোলাকার রজতখণ্ড নাচাও; দেখতে দেখতে তাঁর সব চাইতে ভাল উপন্যাসখানা তোমার হাতে চলে আসবে এবং সেখানা তোমার নিজের নামে ছাপতে আর কোন আপত্তি থাকবে না। এভাবে একখানা দুখানা তিনখানা বই যদি নিজের বলে চালাতে পারো তা হলে তোমার গ্রন্থকার নাম আর কে কেড়ে নিতে আসে?

যে প্রক্রিয়াটি উপরে বর্ণনা করা হল সেটি এ দেশে হামেসাই অনুসৃত হচ্ছে। রবির আলো ধার করে যেমন চন্দ্র প্রভাময় তেমনি অন্যের মস্তিষ্ক ধার করে এ দেশে অনেকে জ্যোতিষ্মান। আর হবেই বা না কেন? বাংলার ধনীকুলের সৌভাগ্যবশতঃ দুঃস্থ উপায়বঞ্চিত নিরীহ শিল্পী-সাহিত্যিক বাংলা দেশে অগুনতি। এঁদের মস্তিষ্ক ও প্রতিভা ক্রয় করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। অভাবের মুহূর্তে কিছু টাকা ফেলে দিলেই হল। অর্থাৎ ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হয়। যে ব্যক্তির সংসারে নিত্য অনটন, কিংবা এক থোকে কিছু টাকা পেলে যে ব্যক্তির ছেলের চিকিৎসে হয় কি মেয়ের বিয়ের একটা হিল্লে হয়, তাঁর কাছে টাকাটাই সব চাইতে বড়, কেন না টাকাটাই তাঁর আশু দরকার। জনসাধারণ্যে গ্রন্থকাররূপে পরিচিত হবার আধ্যাত্মিক সুখ নিয়ে তিনি কী করবেন? সে সুখ যদি কোন সাহিত্যবুদ্ধিহীন অথচ সাহিত্যযশোপ্রার্থী ধনীনন্দন আত্মগত করতে চায় তবে তাকে তা ছেড়ে দিতে এমন কী বাধা?

বাধা কিছুই নেই যেহেতু সব বাধারই মহৌষধ হল অর্থ। টাকার টানাটানিতে বিবেকের কানাকানি বেশীক্ষণ টিকতে পারে না। এইভাবে কত গ্রন্থ যে মলাটের উপর নকল গ্রন্থকারের নামচিহ্ন ধারণ করে বাজারে আত্মপ্রকাশ করে তার ইয়ত্তা নেই। জনৈক রাজাবাহাদুরকে জানি, তিনি জীবনে এক আঁচড়ও মৌলিক কিছু লেখেন নি, লিখতে তিনি জানেন এমন অপবাদ তাঁর অতি বড় শত্রুতেও দেবে না। অথচ বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সাহিত্যক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকরূপে তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা। তাঁর দুটো-একটা বই সিনেমাতেও গৃহীত হয়েছে। আরেক মহাজনকে জানি, যাঁর গ্রন্থকার স্বাক্ষরে এতাবৎ খান ত্রিশেক ভল্যুম সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু কুলোকে বলে, কোনটাই তাঁর নিজের লেখা নয়—হয় সেক্রেটারীরা লিখে দিয়েছেন, নয়তো ভাড়া-করা পণ্ডিতকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। নিজের ঘিলুহীন মাথায় অপরের মস্তিষ্ক বসিয়ে ভদ্রলোক সমাজে একজন বিশেষ মস্তিষ্কবান ব্যক্তিরূপে পরিচিত।

যেমন গ্রন্থের বেলায় তেমনি খুচরো লেখাতেও সেই একই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ। মিনিষ্টার-পলিটিশিয়ান, ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিস্ট, বিস্‌নেস ম্যাগনেট প্রভৃতি হোমরা-চোমরা লোকেরা সংবাদপত্রের স্তম্ভে অথবা রেডিওর অদৃশ্য বাণী মারফৎ জনসাধারণের মাথা তাক করে যে সকল বিবৃতির থান ইঁট ছুঁড়ে মারেন

সেগুলি প্রায়শ ভাড়া-করা মস্তিষ্কের পরিশ্রমজাত ফল। ভাড়া-করা মস্তিষ্ককে ভাঁড়িয়েই তাদের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু এ সংবাদ আমরা কয়জনা রাখি? রাখবার প্রয়োজনও বোধ করি না, যেহেতু বড়লোকের শ্রীমুখে অমৃতকথা শুনতেই আমরা ভালবাসি; সেই অমৃতের যোগান কে দেয় সে খোঁজে আমাদের দরকার নেই।

একটা অজুহাত এই যে, জন-জীবনের রথীমহারথীরা বড়-বড় কাজে এমন ব্যস্ত যে তাঁদের নিজেদের বিবৃতি বা বক্তৃতা রচনার সময় হয় না, তাই পরের উপর তাঁদের নির্ভর করতে হয়। কথাটা আংশিক সত্য। কিন্তু যে অংশটা সত্য নয় তাকে সযত্নে ঢেকে রাখা হয়। বিবৃতি রচনার মুরোদই নেই এনাদের অনেকের। একটি সুবিন্যস্ত, যুক্তির শৃঙ্খলার দ্বারা নিয়ামিত তথ্যভারসমৃদ্ধ বক্তৃতা রচনা করতে যে-পরিমাণ বুদ্ধি বিবেচনা জ্ঞান দরকার তা মস্তিষ্কের কোটরে সঞ্জীবিত থাকলে এনারা বিদ্যাকেই পেশা করতেন, পলিটিক্‌স পেশা করতেন না। যাঁর বুদ্ধি যত বেশী স্থূল, পলিটিক্‌স-এ তাঁর তত বেশী সাফল্যের সম্ভাবনা।

এই-যে পরের মস্তিষ্ক নিজের বলে চালাবার রেওয়াজ, এর মধ্যে পুঁজিবাদী শোষণের রূপ যত প্রকট এমন বোধ করি আর কিছুতে নয়। বুদ্ধিজীবী মাত্রকেই কিছু-না-কিছু পরিমাণে মস্তিষ্ক বিক্রি করে খেতে হয়। তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই। অধ্যাপনা থেকে আরম্ভ করে সংবাদপত্র সেবা, পণ্যদ্রব্যের প্রচার-তদারকি করা, কেরানীগিরি—সবই অল্পাধিক মস্তিষ্ক বিক্রয়ের পেশা। কিন্তু সে জিনিস আর এ জিনিস এক নয়। এ শুধু টাকার জোরে মস্তিষ্কক্রয় নয়; এ হচ্ছে প্রবঞ্চনা শাঠ্য পরপীড়ন—মানুষের দুর্বলতার সুযোগে বলদর্পীর স্পর্ধিত অহঙ্কার। টাকার অঙ্কে মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির পরিমাপ হয় না। পেটের দায়ে একটা উপন্যাস (গ্রন্থকারের নাম সহ) দুশো টাকায় বিক্রি করে দিলেই তার দাম দুশো টাকা নয়। কে বলতে পারে এই বইই একদিন কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লক্ষ টাকায় বিকোবে না? সব বইই উৎরোয় এমন বলি না, কিন্তু কোন কোনটির মধ্যে অমরত্বের সম্ভাবনা লুক্কায়িত থাকে। সত্যকার মৌলিক রসসৃষ্টির ক্ষমতাযুক্ত মস্তিষ্ক সমাজে আখ্‌চার মেলে না। ক্বচিৎ কখনও তা দৃষ্ট হয়। এই মস্তিষ্ক সমগ্র সমাজের সম্পদ, ব্যক্তি-বিশেষের মাত্র নয়। টাকার জোরে যে লোক তাকে আত্মগত করতে চায়

সে শুধু ব্যক্তিবিশেষকেই প্রবঞ্চিত করে না, সমাজকেও প্রবঞ্চিত করে। চোরাকারবারীর সঙ্গে এ লোককেও রাস্তার প্রথম ল্যাম্প-পোষ্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া উচিত। কিন্তু ফাঁসি দেয় কে? যাদের গলায় ফাঁস পরাবার কথা, টাকার ফাঁস পরিয়ে তারা আগে থেকেই সমাজ-দেহটাকে বেকায়দা করে রেখেছে। ফাঁসির দড়ি তাদেরই হাতে, জনসাধারণের হাতে নয়।

সাহিত্যানুশীলন ও পাণ্ডিত্যচর্চার ক্ষেত্রে জাল-জুয়াচুরির দৃষ্টান্ত অনেক আছে। ভাবের ঘরে চুরি থেকে আরম্ভ করে পরের রচনা স্বীকৃতিবিহীন ভাবে আত্মসাৎ—এ সমস্তই জুয়াচুরির কোঠায় পড়ে। এর চাইতেও মারাত্মক জুয়াচুরির দৃষ্টান্ত আছে। পরের লেখা নিজের নামে চালাবার প্রয়াসের মধ্যে শুধু প্রতারণা ও চৌর্যবৃত্তিই প্রশ্রয় পায় না, এতে সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিকুশল ব্যক্তিত্বকে চূড়ান্ত অপমান করা হয়। সৃজনশীল প্রতিভার দানকে টাকা দিয়ে মাপতে যাওয়া শুধু তার পক্ষেই সম্ভব যে প্রতিভার মর্ম বোঝে না, টাকা প্রতিভার চাইতে বড় এই যার বিশ্বাস। পরিতাপের বিষয়, এ সমাজে তেমন মানুষের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। ধনকৌলীন্যের দ্বারা এরা সব কিছুর উপরেই খবরদারী করতে চায়—মায় শিল্প-সাহিত্য। শিল্পীর আর্থিক অসহায়তার সুযোগে শিল্প তো বটেই শিল্পীকে পর্যন্ত আত্মগত করা—শিল্পীর পক্ষে এর চাইতে চরম লাঞ্ছনা কল্পনা করা যায় না।

॥ ৫ ॥

বড় ঘরের বনেদী চাল কথাটা প্রায়ই শুনতে পাই। চেহারায় কথাবার্তায় আচরণে একটু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেই লোকে বলে, হবে না কেন, কত বড় বনেদী ঘরের ছেলে।

এ জাতীয় কথায় এক এক সময় হাসি আসে, এক এক সময় গায়ে জ্বালা ধরে। বনেদী চাল না হাঁতি! সাদা কথায় বনেদী চাল মানে তো পরকে ছোট নজরে দেখা, সকলের থেকে গা বাঁচিয়ে চলা, কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য-বোধ হতে আহারে বিহারে বেশে ভূষায় কথাবার্তায় একটা কৃত্রিম বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা। সত্যকার মানুষের চোখে এই বৈশিষ্ট্য অসার, সুতরাং অবজ্ঞেয়। নিরবচ্ছিন্ন শোষণের ভিত্তিতে এই তথাকথিত বনিয়াদী চালের বনিয়াদ উত্তুঙ্গ

হয়ে উঠেছে। কিন্তু লজ্জা ও দুঃখ এই যে, যাদের শোষণ ও পেষণ করে বনেদীরা বনেদী আখ্যা পায় তারাই বনেদী চালের প্রশংসায় সব চাইতে পঞ্চমুখ। 'অমুক বাবুর নাতি ছেলে নয় তো যেন কার্তিক। যেমন রূপ তেমনি গুণ। কত বড় বংশের ছেলে, সেটা দেখতে হবে তো!'

আবার একই বংশের ছেলে যখন বেলেল্লাপনা করে নর্দমায় গড়াগড়ি যায় তখন তারাই আবার বলে, 'আহা যেতে দাও। বড় ঘরের ছেলের অমন এক-আধটু এদিক-সেদিক হয়েই থাকে। এ বাবা তালের-রস-গাঁজানো দিশী সরাব নয়, খাঁটি স্কচ্-হুইস্কি। কে নেশা করেছে দেখতে হবে তো।'

প্রথম ক্ষেত্রে বনেদিয়ানার পরিচয় চেহারায়, শেষোক্ত ক্ষেত্রে পানীয়ের তারতম্যে। যখন যেটা সুবিধা বলে দিলেই হল। যে কোন উপায়ে বনেদিয়ানার মহিমা রক্ষা করা চাই। ঝাড়ু মারি এই বনেদিয়ানার কপালে।

আসলে, বনেদিয়ানার ইতিহাসটা কী? আজ যে পরিবার বনেদী পরিবার নামে খ্যাত তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে হয়তো কেউ সৌভাগ্যবশতঃ প্রচুর বিত্ত সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন। সাধু পরিশ্রম দ্বারা হোক আর অসাধু উপায়েই হোক (অসাধু উপায়েই বেশী), করেছিলেন। উপার্জনের প্রক্রিয়াটা সাধু ছিল কি অসাধু ছিল সে প্রশ্ন আজ অবান্তর; কেন না কালের ব্যবধানে লোকে ঐশ্বর্যের সমারোহটাই শুধু দেখে, কেমন করে একদা সেই ঐশ্বর্য সংগৃহীত হয়েছিল সে প্রশ্ন কেউ তোলে না। মানুষের স্মৃতির এই ক্ষীণজীবিতাই হচ্ছে সকল প্রকার দুষ্কৃতকারীর একমাত্র নির্ভর; নইলে দুষ্কৃতকারীরা সমাজে টিকে থাকতে পারত কিনা সন্দেহ।

সে কথা যাক। পূর্বপুরুষের অর্জিত সম্পত্তির জোরে দেখতে দেখতে একটা পরিবার দাঁড়িয়ে গেল—বনেদী পরিবার। পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দু হাতে উড়িয়ে ছড়িয়েও যা টাকা রেখে গিয়েছিলেন, 'শেষের কবিতা'র ভাষার একটু অদল-বদল করে বলতে গেলে বলতে হয়, তা অধস্তন চৌদ্দপুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং পরবর্তীদের আর কারও কষ্ট করে অর্থ রোজগারের ঝামেলা পোয়াতে হল না। সুবিস্তৃত অবকাশ তাঁদের কাঁধের উপর ভারী হয়ে চেপে বসল; সুতরাং কী আর করেন, দয়া করে সকলে বনেদিয়ানার অনুশীলনে মন দিলেন। তাঁদের আচরণে ক্রমশ খানদানী চাল দানা বেঁধে উঠতে লাগল। বনেদী ঘরের ছেলের বনেদী ঘরে ছাড়া বিয়ে হতে পারে না।

কাজেই এখান ওখান থেকে খুঁজে-পেতে কুলীন বংশের সুলক্ষণা রূপবতী মেয়েকে বধূ করে ঘরে আনা হল। পরিবারে সৌন্দর্যের বান ডাকল। অর্থ-কৌলীন্যে আর চেহারা-কৌলীন্যে পরিবারের খানদানী মর্যাদার ভিত্তিগাত্র সুদৃঢ়ভাবে গাঁথা হল।

ভিত্তিগাত্রের উপর আস্তে আস্তে ইমারত উঠতে লাগল। বনেদী পরিবারের বনেদী ছেলের দল অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে কেউ শিল্পচর্চায় মন দিল, কেউ পরচর্চায়, কেউ পরকীয়া চর্চায়। কিন্তু সবগুলি প্রক্রিয়াই বনেদিয়ানার তবক দিয়ে মোড়ানো। পর চর্চাই হোক আর পরকীয় চর্চাই হোক, এমন কথা কারও বলার যো নেই যে জিনিসটি 'প্লেবিয়ান'। কাজেই জনসাধারণের চমৎকৃত চক্ষুর উপর বনেদিয়ানার চোখ-ধাঁধানো প্রাকার দিন থেকে দিনে উত্তুঙ্গ হয়ে উঠতে লাগল। বনেদী পরিবারের সুখ্যাতিতে কান পাতা দায় হল।

কলকাতা শহরের উত্তরাঞ্চলের তথাকথিত বনেদী পরিবারগুলির কথাই বিবেচনা করুন। কয়েকটি ডাক-সাইটে পরিবার, যাঁদের তথাকথিত খানদানী ঐতিহ্য প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হতে চলেছে। আজ অবশ্য পুরাতন সমারোহের কিছু অবশিষ্ট নেই। তবু ঐশ্বর্যের উচ্ছিষ্ট নিয়েই গর্ব কত। এই সব পরিবারের ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে। কোম্পানীর কর্তাদের নানা ভাবে মন জুগিয়ে, তোয়াজ করে, তাদের হৃদয়-হীন শাসন ও শোষণের প্রক্রিয়ায় অযাচিতভাবে সাহায্য করে এই সব পরিবারের প্রতিষ্ঠাতারা প্রচুর ধন-সম্পদ হস্তগত করেছিলেন। প্রকাশ্যতঃ এঁদের কেউ বেনিয়ান কেউ মুৎসুদ্দি কেউ আর-কিছু ছিলেন। অপ্রকাশ্যে কী ছিলেন তার সঠিক ইতিহাস কেউ জানে না। হয়তো সে আমলের খাতাপত্রে তার কিছু কিছু নজীর মিলতে পারে—অবশ্য যোগেশ বাগল মশায় ও অনুরূপ পুরা-সন্ধানীরা যদি এই দিকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি দেন। কোম্পানীর আমলে সংঘটিত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার সাকুল্য অধিবাসীসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মারা যায়। ওই সর্বনাশা ব্যাপক স্বজাতিনিধন অনুষ্ঠানে উক্ত সদাশয় মহাশয়েরা কোম্পানীর কর্তাদের কী পরিমাণ ও কতদূর সহায়তা করেছিলেন সে ইতিবৃত্ত গবেষণার দ্বারা নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। তবে টুকিটাকি যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তার থেকে এ কথা একপ্রকার জোর করে বলা চলে যে এঁদের অধিকাংশেরই রেকর্ড নিষ্কলুষ ছিল না।

কোম্পানীর আমলের সেই সব মহিমময়ী কীর্তির স্মৃতি লোকে ভুলে গেছে, কিন্তু ওই কীর্তির আশ্রয়ে রচিত তথাকথিত বনেদিয়ানার ঐতিহ্যটা জনসাধারণের চোখ ধাঁধাঁবার জন্যে রয়ে গেছে। অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোক বনেদিয়ানার পায়ে গড় করতে পারলে আর-কিছু চায় না। তাদের অবজ্ঞেয় দাস্য মনোভাব অজ্ঞতাপ্রসূত, সুতরাং ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু শিক্ষিত এবং শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরাও যখন বনেদী চালের তথাকথিত মহত্ব শতমুখে ব্যাখ্যান করতে লেগে যান তখন তাকে আপনি কী বলবেন? বংশকৌলীন্য ও পরিবারকৌলীন্যের মোহ আজও মানুষের মন থেকে গেল না। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাঁদের বাহ্যত: অতি উচ্চশিক্ষিত ও প্রগতিশীল বলে মনে হবে। কিন্তু একটু আঁচড়ে দেখুন, দেখবেন বংশগর্বে একেবারে টইটুম্বুর। স্বয়ং বনেদী ঘরের সন্তান হলে তো কথাই নেই, ক্ষীণতম সূত্রেও যদি বনেদী পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে তাকে একটা মহামূল্য তথ্য হিসাবে চারদিকে ছড়িয়ে বেড়াবেনই। এটিকে স্বভাবদুর্বলতা বলে উড়িয়ে দেবার যো নেই, প্রগতিশীল ধ্যানধারণার মানদণ্ডে এটি নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় মনোভাব।

আভিজাত্যের যে সমস্ত লক্ষণ নিয়ে সাধারণ মানুষ আপনাদের মধ্যে আলোচনা করে তাদের একটি হল আত্মসম্মান। 'দেখেছেন কী রকম দৃপ্ত চলার ভঙ্গি! কী রকম বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়! হবে না কেন, কত বড় ঘরের ছেলে!' কিন্তু আসলে এই আত্মসম্মান বস্তুটি কী! অহঙ্কারেরই একটি পরিবর্তিত রূপ নয় কি? সাধারণের বেলায় যেটা অহঙ্কারের সামিল, তাকেই বড়মানুষের বেলায় আত্মসম্মানবোধ বলে ধরে নেওয়া হয়। তুমি যদি দৃপ্ত ভঙ্গিতে কথা বল, লোকে তোমাকে বলবে উদ্ধত; কিন্তু যাই কোন তথাকথিত অভিজাত ঘরের ছেলে সদৃশ আচরণ করল, সেইটেকে অক্লেশে দৃপ্ত আত্মমর্যাদা-বোধের নিদর্শন বলে মেনে নেওয়া হবে। তুমি যদি নরম হয়ে কথা বল, লোকে তোমাকে বলবে মিন্‌মিনে; আর ঐ একই ভঙ্গিতে যদি কোন অভিজাত ঘরের ছেলে কথা বলে তো তাকে বনেদী অমায়িকতা বলে ধরে নেওয়া হবে। আত্মসম্মান বস্তুটি বনেদী ঘরের মানুষদের জন্যে তোলা—সেটি তাদেরই একচেটিয়া সম্পদ। কিতাবী বুলির খপ্পরে পড়ে তুমি, সাধারণ দশজনার একজন, আত্মসম্মান দেখাতে গেছ কি নাকালের একশেষ হবে। এ সমাজে আত্ম-মর্যাদার গৌরব শুধু সেই করতে পারে যার সামাজিক মর্যাদা আগে থেকেই

নির্দিষ্ট ও নিরূপিত হয়ে গেছে। তোমার আত্মসম্মান আছে বলে তুমি সম্মাননীয় নও; তুমি ধনকৌলীন্যের দ্বারা সম্মানের ছাড়পত্র সমাজের কাছ থেকে আগেই আদায় করে নিয়েছ, তাই তোমার আত্মসম্মানের দম্ভ। যত রকম অসার ও ছেঁদো কথা জ্ঞানীদের ষড়যন্ত্রে কিভাবে স্থান পেয়েছে এবং অনবধানতাবশতঃ লোকের মুখে মুখে চালু হয়েছে 'আত্মসম্মান' কথাটি তাদের অন্যতম।

কিছুকাল আগে সংবাদপত্রে এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বিভাগের সাব-ইনস্পেক্টর পদসমূহের জন্য দরখাস্ত আহবান করা হয়েছিল। দরখাস্ত-কারীদের যে সমস্ত যোগ্যতার মাপকাঠি উত্তীর্ণ হতে হবে তাদের একটি হল—'সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা থাকা চাই।' কিন্তু কেন? যোগ্যতার ফিরিস্তির মধ্যে এই বিশেষ চাহিদাটিকে যোগ করে দেবার অর্থ কী? কারও সামাজিক এবং বংশমর্যাদা থাকলে সেটাকে আর-একটা অতিরিক্ত গুণপনা বলে ধরে নিতে হবে এরূপ কিম্ভূত ধারণা পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের পুলিশ বিভাগের মাথায় কে ঢোকালো? তথাকথিত সামাজিক ও বংশ-মর্যাদা-যুক্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য যার হয় নি সে কি শুধু ঐ কারণেই বিড়ম্বিত হয়ে থাকবে? বংশমর্যাদার মধ্যে পুলিশের কর্তারা এমন কী বিশেষ গুণ আবিষ্কার করেছেন যার জন্যে তাকে যোগ্যতার লিষ্টির মধ্যে প্রথমেই জুড়ে দিয়েছেন? এই কি স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের সাম্যনীতির ও সমদর্শিতার নমুনা?

আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় যে বংশমর্যাদা ও সামাজিক কৌলীন্যের মধ্যে এমন বিশেষ গুণপনা কিছু আছে যা অকুলীনদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না (যদিও বৈজ্ঞানিক বিচারে এটা প্রমাণসহ নয়), তা হলেই কি উপরের ব্যবস্থাকে সমর্থন করা চলে? যে ব্যক্তি সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত তিনি এম্নিতেই সুবিধাভোগী। অন্যান্যদের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে ডিঙিয়ে তাঁর সেই সুবিধাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার এই অশোভন ব্যগ্রতা কেন? পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিপত্তি অর্জনের ইতিহাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলঙ্কিত। যারা বড় হয়, সাধারণতঃ পরকে ঠকিয়েই বড় হয়। শোষণ ও প্রবঞ্চনার প্রক্রিয়াটা কোথাও স্থূল কোথাও সূক্ষ্ম। বংশমর্যাদা বস্তুটিও অল্পবিস্তর একই প্রক্রিয়ার দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকে। সামাজিক ও বংশমর্যাদার তিলক যাদের কপালে চড়ানো আছে, বুঝতে হবে সকলের ঘাড়ের উপর

দিয়ে অন্যায় রকমের একটা সুবিধা তারা আগে থেকেই করায়ত্ত করে রেখেছে। বংশমর্যাদার সার্টিফিকেট ছাড়া কাউকে চাকুরিতে নেওয়া হবে না বললে এইটেই কি বোঝায় না যে শ্রেণীবিশেষের অন্যায়ভাবে-লব্ধ প্রাথমিক সুবিধাটাকে কর্তারা চিরস্থায়ী করবার বাসনা পোষণ করেন বলেই ঐ ভাবে বিজ্ঞপ্তির ভাষা রচনা করেছেন? এটা রীতিমত অসঙ্গত, অশোভন। আমাদের সরকারী কর্তাদের বনেদিয়ানার মোহ আজও ঘোচে নি বলেই শ্রেণীবিশেষের প্রতি এই বিসদৃশ পক্ষপাত।

॥ ৬ ॥

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই—"

'মানবের মাঝে' বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা শুধু সেই কবির পক্ষেই ব্যক্ত করা সম্ভব, যিনি শালপিয়ালের ছায়ায় বসে কাব্য রচনা করেছেন, ভিড়ের মানুষের সংস্পর্শে কখনও যাঁকে আসতে হয় নি। কলকাতার রাস্তায় ভিড় ঠেলে, ট্রামে-বাসে গুঁতোগুঁতি করে যদি তাঁকে পথ চলতে হত, অন্নদ্রব্য সংগ্রহ করতে হত আর দশজন সাধারণ মানুষের মত র‍্যাশনের 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে, বাস করতে হত ঘিঞ্জি বস্তিতে বদ্ধ ধোঁয়াটে আবহাওয়ায় এক ঘরে এক গাদা লোকের মধ্যে, তা হলে এমন কিম্ভূত অভিপ্রায় বুঝি তিনি প্রকাশ করতেন না। আমাদের মত গড়পড়তা সাধারণ মানুষের মুস্কিল হয়েছে এই যে, 'বন্ধনের' মধ্যে আমরা শুধু বন্ধনই দেখি, 'মুক্তি' দেখি না। 'মুক্তির' স্বাদ পেতে হলে যে তুরীয় অনুভূতি দরকার আমাদের জীবনে তদুপযোগী পরিবেশ আমরা পাই না।

আর পাবই বা কী করে? আমাদের তো নিজের হাতে করে-কর্মে খেতে হয়, র‍্যাশন আনতে হয়, বাজার করতে হয়, সংসারের আরও দশটা ঝামেলা সহ্য করতে হয়, তুরীয়লোকে বিরাজ করবার মত মানসিক প্রশান্তির অবকাশ আমাদের জীবনে কোথায়? বরং এই ভেবে প্রায়ই আক্ষেপ জাগে, ভগবান কেন মানুষ জন্ম দিয়ে এই 'কুৎসিত' ভুবনে আমাদের পাঠিয়েছিলেন, আর পাঠিয়েছিলেন তো এত দেশ থাকতে এই

পোড়া দেশে কেন জন্ম হয়েছিল, আর জন্মেছিলামই যদি, তবে এই কলকাতায় কেন মরতে এসেছিলাম? "আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।" ভগবান যখন চক্রান্ত করে এই দেশেতেই ঠেলে পাঠিয়েছেন এই দেশেতেই মরতে হবে বৈকি! মরব গিয়ে কি হনলুলুয়?

বাস্তবিক, কলকাতায় থাকবার কী যে মজা তা আমরা প্রতিনিয়ত মর্মে মর্মে অনুভব করছি। দুদিন এই শহরে এসে থাকুন, কলকাতার ঠাসাসাসি গাদাগাদি হাঁকাহাঁকি আর চিল্লাচিল্লি তুরীয় অনুভূতি এক তুড়িতে উড়িয়ে দেবে। তবু লোকে এখান থাকে। কী সুখে যে থাকে, মা গঙ্গাই জানেন।

পরশ্রমপুষ্ট সামাজিক প্যারাসাইটদের কথা অবশ্য আলাদা। যাঁদের গায়ে-গতরে খেটে খেতে হয় না, রাজকীয় আরামে রাজপ্রাসাদে বহালতবিয়তে বাস করেন, মোটর ছাড়া দুপা চলেন না, দুপা চলতে ক্লান্ত হয়ে হোটেল কিংবা রেস্তোরাঁর শরণ নেন, তাঁরা কলকাতায়ই থাকুন আর যেখানেই থাকুন, তাঁদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমরা দশজন সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ কলকাতাকে আঁকড়ে আছি কোন্ ত্রিতাপ জ্বালা জুড়োবার আশায়? আমাদের নিমতলার ঘাটেই যে মরতে হবে এমন মাথার দিব্য কে দিয়েছে?

ভাবছেন ঠাট্টা করছি। ঠাট্টাই বটে। মরণ-বাচনের সমস্যা নিয়ে ঠাট্টা করব না তো কী নিয়ে করব! ঠাট্টার কথা এটা নয়, নিতান্ত কাঠখোট্টা কথা। আমার এক এক সময় এই ভেবে আশ্চর্য লাগে, স্নায়ুর উপর প্রতিনিয়ত যে অত্যাচার এখানে চলছে তা সহ্য করে মানুষ এখানে টিকে থাকে কেমন করে। প্রাণশক্তির কী সেই রহস্য যার বলে মানুস এততেও হাসতে পারে? এততেও জীবনের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতির সঞ্চয় পুরাপুরি ক্ষয় হয় না?

ভেজাল তেল, কাঁকরমিশ্রিত চাল, ভূসিমিশ্রিত আটা, দুগ্ধমিশ্রিত জল এবং অচল টাকা চালাবার চেষ্টা থেকে ওজনের কারচুপি পর্যন্ত সর্বপ্রকার ব্যবসায়িক অসাধুতা ও অসভ্যতা—এদের কথা আমি ধরছি না। এসব আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। বেঁচে থাকতে হলে অবশ্যই তার মাশুল দিতে হবে। এগুলি হল সেই মাশুল। বেঁচে থাকার মাশুল, তবে ফল ধ্রুব মরণ। এ নিয়ে অভিযোগ জানাবার দিন পেরিয়ে গেছে। এখানে আমি সে সমস্ত স্থূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি না। আমার মর্মদাহের কারণ আরও সূক্ষ্ম। সে কথাই আজ বলব।

পৃথিবীতে যত রকমের সমস্যা আছে তার মধ্যে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক নিরূপণের সমস্যাটাই সব চাইতে কঠিন। মানুষ পরস্পরের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবে, কী কথা বলবে, কী কথা বলবে না, কথা যেটা বলবে কেমন ভাবে বলবে, অপরকে মনঃপীড়া না দিতে হলে কী করা উচিত—এগুলির ঠিক ঠিক হদিস যদি সে পেত, তা হলে পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগ অশান্তি আপসে দূর হয়ে যেত। পৃথিবীর অধিকাংশ অশান্তি অশিক্ষা ও অজ্ঞতাপ্রসূত। মানবিক আচরণের ক্ষেত্রে এই অজ্ঞতা সব চাইতে বেশী প্রকট। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত এই সমস্যার আজ পর্যন্ত কিনারা হয় নি। জ্ঞানীরা কত কত বিষয়ে মোক্ষম সব উপদেশ বিতরণ করে গেছেন, কিন্তু এই একটি প্রশ্নে তাঁরা বিশেষ কোন সুবিধা করতে পারেন নি। অন্ততঃ এ বিষয়ে যেসব নির্দেশ তাঁরা রেখে গেছেন তাদের সব কয়টি অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে, ভাসা-ভাসা। এই সব নির্দেশ মেনে চলতে গেলে পদে পদে বিড়ম্বনা ভোগের সম্ভাবনা।

ট্রামে-বাসে চলুন, দেখবেন সকলেরই মেজাজ কোন-না-কোন চিন্তা-ভাবনায় তেতে আছে। পান থেকে চুণ খসেছে কি অমনি একটা গণ্ডগোল পেকে ওঠবার যোগাড়। আপনার মুখ সঙ্গে সঙ্গে চুণ। ট্রামে-বাসে যে বচসা ও বিবাদ লেগে থাকে তার একটা প্রধান কারণ এই যে, একেবারে উপরতলার মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া কলকাতায় কোন লোক সোয়াস্তিতে নেই। সকলেরই স্নায়ু ধনুকের ছিলার মত টান করে বাঁধা ; একটুতেই তাতে টঙ্কার জেগে ওঠে। আর একটুতেই তা ছিঁড়ে যায়। সম্মুখবর্তীকে আপনি হয়তো নিতান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন 'দয়া করে একটু এগিয়ে যান' ; কিন্তু যাঁকে উদ্দেশ করে বলা, দয়া না করে তিনি আপনার দিকে এমন কটমট করে তাকাবেন যে আপনার আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে ভরসা হবে না, আপনি এক-পায়ে দাঁড়িয়ে থাকাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করবেন।

হুজুনার জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসতে গিয়েও একই বিপত্তি। ভুঁড়িওয়ালা দশাসই চেহারার যে বাবুটি পূর্বাহ্ণেই আসনটি দখল করে আছেন তিনি আপনার প্রতি এমন দৃষ্টিতে তাকাবেন যেন আপনি তাঁর খাস তালুকের চৌহদ্দীতে 'ট্রেসপাস' করতে যাচ্ছেন। তিনি ভ্রূক্ষেপও করবেন না ;

আপনার উপস্থিতিটা যে নিতান্ত তুচ্ছ এক ব্যাপার এইরূপ একটা ভাব দেখিয়ে সমগ্র আসনটার উপর একাধিপত্য বিস্তার করে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে থাকবেন। নিতান্ত যদি দয়াপরবশ হন তো আসনের একটি কোণ আপনাকে ঔদার্যপ্রভাবাৎ ছেড়েও দিতে পারেন। কিন্তু তাতেই কি সমস্যা মিটে? শরীরের অর্ধাংশ শূন্যে বিলম্বিত রেখে বসবার কায়দা যাঁর রপ্ত হয় নি তাঁর বেলায় এ ঔদার্য নেহাৎ মাঠে মারা যাবার সম্ভাবনা। এ অনভ্যস্ত কসরতের চাইতে দাঁড়িয়ে যাওয়া ঢের ভাল।

ট্রামে-বাসে এই ধরনের ব্যাপারে আপনার পক্ষে দুটি জিনিস করা সম্ভব। —হয় ঝগড়া করা, নয় বিনা প্রতিবাদে শান্তশিষ্টের মত অনাচারগুলি মেনে নেওয়া। যাঁর পক্ষে এ দুটির কোনটাই করা সম্ভব নয়—একটিতে ভদ্রতার বাধা, অপরটিতে ন্যায়বোধের বাধা—, তাঁর পক্ষে মনে মনে ক্লিষ্ট ও পীড়িত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্নায়ুর উপর যত রকমের পীড়ন আছে ভদ্রতার পীড়ন তার মধ্যে সব চাইতে মর্মঘাতী। এই অবস্থায় অন্যায় সওয়াও যায় না, আবার তার বিরুদ্ধে কিছু কওয়াও যায় না। সৌজন্য ও ভদ্রতার ন্যায়সঙ্গত পরিণতি—'সীন ক্রিয়েট' করার ভয়ে বাইরে বাধ্যতামূলক নিষ্ক্রিয়তা, ভিতরে নিরুপায় জ্বলুনি-পুড়ুনি।

বিলিতি কোম্পানীর ট্রাম আর অবাঙালীর 'বাস'—দুইয়ের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে আপনি হয়তো বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় 'স্টেটবাস'-এ চাপতে গেলেন। সেখানে আরেক ধরনের উৎপাত। কোলাহল আর গণ্ডগোলের একশেষ। হয় কণ্ডাক্টর যাত্রীদের—অর্থাৎ যাত্রীদের মধ্যে যারা অকারণ গল্পপ্রিয় তাদের—সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে, নয়তো ড্রাইভার সামান্য কারণে কণ্ডাক্টরের সঙ্গে বচসা করছে। আপনি যে দুদণ্ড নিজের মনের সঙ্গে গুলতানি করতে করতে সোয়াস্তিতে যাবেন তার উপায় নেই। অথচ প্রতিকার দুর্ঘট। কেন না এটা হল একেবারে নিকষ স্বরাজ্যের এলাকা। এখানে নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি নিষ্ঠা আশা করাই অন্যায়। অপরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করে যত্রতত্র যদি চেঁচাতেই না পারলুম তবে আর আমরা স্বাধীন হয়েছি কতটুকু! শিখ-বাসে কণ্ডাক্টরের তারস্বর 'শিয়ালদহ-শ্যামবাজার' ঘোষণা আছে, আছে অতিরিক্ত যাত্রী তোলার লোভে হাঁকডাকের আতিশয্য, আছে রাস্তার কোন গোবেচারা রিক্সাওয়ালা কি ঠেলাওয়ালাকে লক্ষ্য করে ষ্টীয়ারিং-হুইলে উপবিষ্ট সর্দারজীর আকস্মিক

রূঢ়কণ্ঠ হুমকি। কিন্তু এ জিনিসটি নেই। বাঙালীর সব খানেই আড্ডা দেওয়া বাতিক। এমন কি স্থানটি যদি যাত্রীবাহী স্টেটবাসও হয়, তা হলেও রক্ষা নেই। গালগল্পের আবহাওয়া সেখানেও বিরাজমান।

রাস্তায় পায়ে হেঁটে চলুন। কী নিদারুণ স্নায়ুপীড়াদায়ক শ্রম। জনতার গুঁতোগুঁতি, জটলা-হল্লা, রাস্তার মধ্যখানে আবর্জনার জঞ্জাল, ফুটপাথের পেভ্‌মেন্ট-এ শোভমান আপাত-নিরীহ কলার খোসা—এগুলি ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে যা সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষের রুচিবোধকে পীড়িত না করে পারে না। দেখবেন যে-কোন লোক যে-কোন জায়গায় একটি বিশেষ নৈসর্গিক কর্ম করতে বসে গেছে। কিংবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই। রাস্তা দিয়ে মেয়েরা চলেছেন ভ্রূক্ষেপও নেই। বলা হবে, যা স্বাভাবিক নৈসর্গিক একটি প্রক্রিয়া মাত্র সে সম্বন্ধে এত চাপাচাপি ঢাকাঢাকি করতে বলার মানে কী। না, মানে নেই, তবে কিনা শালীনতা বলে একটা কথা আছে, সৌন্দর্যবোধ বলে একটা কথা আছে। মার্জিতরুচি ভদ্রমানুষ মাত্রই প্রত্যাশা করে যে চক্ষুপীড়াদায়ক নৈসর্গিক প্রক্রিয়াগুলি চক্ষুর অন্তরালেই নিষ্পন্ন হবে, আর বর্বরতার যুগ ফিরিয়ে আনাই যদি সকলের লক্ষ্য হয়ে থাকে তবে অবশ্য আলাদা কথা।

এ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ থাক। এ অংশটিকে আপনারা কুরুচির আতিশয্যে ক্ষিপ্ত একটি লোকের প্রক্ষিপ্ত আলোচনা বলে ধরে নেবেন। বাড়ি এলেন, কিন্তু সেখানেও আপনার জন্যে আরেক ধরনের উৎপাত অপেক্ষা করে আছে। পাশের বাড়ির সঙ্গীতযশোপ্রার্থিনী কন্যার হারমোনিয়ম-সহযোগে সানু-নাসিক সা রে গা মা চীৎকার আর তীব্র-নিখাদে-চড়ানো পাঁচ-পাঁচটা রেডিওর অশ্রাব্য গান—এই দুইয়ে মিলে আপনার কর্ণকুহরে যে মধুর সঙ্গীতরস ঢালতে থাকবে তাতে আপনার হাত পা গুটিয়ে চুপ মেরে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিছু বলতে যাবেন তার যো নেই, কেন না তা হলেই একটা বিলক্ষণ কাণ্ড বেধে ওঠবার উপক্রম।

নিজের বাড়িতেও নিজের বলতে আলাদা কোন ঘর নেই, বিশ্রামের কোন মুহূর্ত নেই। এই নিদারুণ গৃহসঙ্কট, সেলামি আর অবিশ্বাস্য রকমের মুদ্রালোলুপতার যুগে প্রত্যেক গৃহেই সব সময় দুই-এক জন (ক্ষেত্র বিশেষে তার বেশী) অতিরিক্ত 'মেম্বর' আশ্রয়ার্থী হিসাবে রয়েছে। অবশ্য এখানে আমি মধ্য ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের কথাই বিশেষ করে বলছি। যাঁদের অঢেল

পয়সা অঢেল জায়গা অঢেল আকাশ, তাঁরা আমার এ আলোচনার আওতার মধ্যে পড়েন না।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর শৈশবরচিত প্রথম কবিতায় লিখেছিলেন, "রেতে মশা দিনে মাছি এই নিয়ে কলকাতায় আছি।" এই অবস্থার অদ্যাপি পরিবর্তন ঘটে নি। তবে নূতন উপসর্গ হিসাবে আরেকটি বস্তুর যোগ হয়েছে—মানুষের কিলিবিলি।

॥ ৭ ॥

অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন, আমাদের দেশে সমাজে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত প্রতিপত্তিবান সঙ্গতিপন্ন ও সুখী, তাঁদের একটা মোটা অংশই 'ধর্ম'ভাবাপন্ন ও আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। এঁদের কেউ রামকৃষ্ণ মঠের সহিত সংশ্লিষ্ট, কেউ ভোলানন্দ গিরির চ্যালা, কেউ স্বামী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পন্থাশ্রয়ী, কেউ শ্রীঅরবিন্দ বলতে অজ্ঞান, কেউ আর-কিছু।

আধ্যাত্মিকতা বস্তুটি অশ্রদ্ধেয় তা বলছি নে, কিংবা উপরে যে মহাজনদের নাম করলাম তাঁরা আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র নন একথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আধ্যাত্মিকতা অথবা অধ্যাত্ম-সাধকদের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার নেই। আপাততঃ আমাদের লক্ষ্য ভিন্ন। কথা হচ্ছে, কেন এমন হয় যে শুধুমাত্র ধনী ও প্রতিপত্তিবান ব্যক্তিরাই এ জাতীয় সাধুসন্তদের চরণাশ্রয় লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন? কই, সাধারণ মানুষের মধ্যে তো এ আগ্রহের বিশেষ প্রকাশ দেখি না? যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করে এবং সে টাকায় সংসার কী করে চলবে সেই চিন্তায় যাদের মাথা আরও বেশী ঘামে—যেমন নিম্ন মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, দিন-মজুর—তাঁরা তো কই আধ্যাত্মিকতা-প্রীতির ধার দিয়েও যায় না? সাধারণের মধ্যে অবশ্য ফকীর-দরবেশ, আউল-বাউল প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষের প্রতিপত্তি প্রবল। শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদী ফুলের মহিমা তারা বোঝে না, তবে 'বাবার' থানের একটি বেলপাতা কি পীরের দরগার একটুখানি সিন্নি পেলে তারা বর্তে যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাসের

অভিব্যক্তির মধ্যে কুসংস্কার ও ভক্তির ভাবটাই বলবৎ। তার সঙ্গে মহান আধ্যাত্মিকতার কোন সম্পর্ক নেই।

তা হলে কি বুঝতে হবে, আধ্যাত্মিকতা বস্তুটি শুধু ধনী ও সঙ্গতিবানদেরই একচেটিয়া বিষয়? সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর উপরে না ওঠা পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতার নাগাল পাবার কোন উপায় নেই? স্বল্পবিত্তরা স্বল্পবিত্ত বলেই কি আধ্যাত্মিকতার অধিকার-সুখ থেকে বঞ্চিত?

আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত তাজ্জব লাগে। এ কেমন কথা যে ধনমহিমা অর্জন করতে না পারলে আধ্যাত্মিকতার মহিমা উপলব্ধি করা যাবে না? তোমার অনেক আছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেয়েও তোমার ফুরোয় না, সেই সুবাদে তুমি অনায়াসে আধ্যাত্মিকতার পাসপোর্ট পেয়ে যেতে পারো। আর যে লোক দুবেলা দুটো অন্ন জোটাবার ধান্ধায় কাহিল, অভাবে যে ম্রিয়মাণ, অনাহারে যে শীর্ণ, আধ্যাত্মিকতার সুখস্বর্গ (কিংবা স্বর্গসুখ) থেকে চিরস্খলিত অধমের জীবন যাপন করাই কি তার একমাত্র বিধিলিপি?

অথচ কার্যতঃ দেখছি এইটেই ঘটছে। সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের মই বেয়ে যে যত বেশী উপরের কোঠায় উঠতে পারবে তার ধর্মভাব প্রবল হবার সম্ভাবনা তত বেশী। জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হাকিম ব্যারিষ্টার কিংবা সরকারী দপ্তর ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বড় বড় আমলাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা-প্রীতি যত প্রকট এমন আর কারও মধ্যে নয়। এনাদের সাহেবী ধড়াচূড়োটা বাইরের একটা খোলস মাত্র; ভিতরটা ধর্মভাবে একেবারে টইটুম্বুর। প্রায় প্রত্যেকেই কোন-না-কোন একজন ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল সাধুর চরণাশ্রয় লাভ করে ধন্য। সাহেবী হোটেলের ডিনার-টেবিলে বসে ফাউল-রোষ্ট ডেভিল খেতে আপত্তি কিংবা অরুচি নেই, তবে বাড়িতে এসে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পরিশোধিত হবার দিকেও সমান ঝোঁক। কেউ কেউ বিজাতীয় ধড়াচূড়োর অন্তরালে 'বাবার' আশীর্বাদপূত তাবিচ-কবচও পরে থাকেন। ঠাকুরের আশীর্বাদী ফুল মাথায় ঠেকিয়ে কিংবা 'মাতাজীর' চরণামৃত পান করে আপিসের কাজে বেরোবার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সব চাইতে পরিলক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, এঁদের আধ্যাত্মিকতা-প্রীতি শুধু নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র পরিবারকে 'দীক্ষিত' না করা পর্যন্ত এঁদের স্বস্তি নেই। আধ্যাত্মিক সাধনার বেলতলায় স্ত্রীপুত্রকন্যার মাথা তো মুড়োনই,

অন্যান্য পোষ্যদেরও মাথা মুড়োন। কারও বিদ্রোহ করবার উপায় নেই; কেন না যার জোরে সকলের উপর 'তম্বি' করা যায় সেই জোর অর্থাৎ টাকার জোর স্বয়ং পরিবারপতির করধৃত। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এই ভাবে পরিবারের সকলের বশ্যতা কর্তাগিরির পিস্তল দেখিয়ে আদায় করে পরিবারপতি সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সকলকে নিয়ে মোটরে করে সাধুবাবার আশ্রম-পরিদর্শনে যান কি এই জাতীয় আর-কিছু করেন। গোটা সপ্তাহ ধরে নানা লোকের ও কাজের ভিড়ে মনের মধ্যে যে ময়লা জমে, সাধুবাবার পবিত্র সঙ্গলাভে অচিরেই মন থেকে তা অপসৃত হয়ে যায়। ছুটির দিনে প্রসন্ন অপরাহ্নের পড়ন্ত আলোর নীচে বাবার চরণে শরণ নিয়ে একটা গোটা পরিবার কৃতকৃতার্থ হয়।

আধ্যাত্মিকতার মহিমা অপার। সপ্তাহ ভরে যা-ই কর আর তা-ই কর, ঘুষই খাও আর আত্মীয়ানুগ্রহই কর, অন্যায় সাজাই দাও আর মিথ্যা মামলার দায়ে আসামী ধরে চালানই দাও, একবার শনিবারের ছুটির বিকেলে সাধুবাবার কি মাতাজীর চরণাশ্রয় লাভ করতে পারলে, ব্যস, সব ল্যাঠা চুকে গেল। মনের সব ময়লা-গ্লানি এক নিমেষেই পরিষ্কার। টাকা তো হাতের ময়লা। আরে ছোঃ, টাকা আবার কে ছোঁয়! সাধুসঙ্গের সঙ্গে নাকি টাকার তুলনা! সাধুবাবা যদি দয়া করে মুখ ফুটে কথাটি বলেন তা হলে টাকাপয়সা বিষয়-আশয় সব কিছু সাধুবাবার সেবায় সমর্পণ করা এমন কি কঠিন! শুধু মাতাজীর বলবার ওয়াদা, নইলে চাকরি-বিষয় ছেড়ে মাতাজীর চরণে কবেই স্থায়িভাবে আশ্রয় নেবার বাসনা। এ ছাড় পোড়া ভাগ্যে কি সেই মনস্কামনা কখনও পূর্ণ হবে?

ঠাট্টা নয়, আধ্যাত্মিকতাবিলাসী ধনীদের মনোভাব বিশ্লেষণ করলে কতকটা এইরকমই দাঁড়ায়। আধ্যাত্মিক সুখেও ডগমগ হওয়া চাই, আবার যেন-তেন-প্রকারেণ অর্থবিত্তও হস্তগত করা চাই। সাধুর সঙ্গসুখের প্রতিও ঝোঁক, আবার বিষয়সম্পত্তি বাড়াবার দিকেও ঝোঁক। ঘুষ নিতে কি দলিল জাল করতে কি পরকে ঠকিয়ে বড় হতে আপত্তি নেই, এদিকে আধ্যাত্মিক সুখের সুড়সুড়ির প্রতি লোভ প্রচণ্ড। স্বীয় চরিত্রের উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য নেই, অথচ সাধুসঙ্গ করার শখ প্রচুর। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে অধ্যাত্ম-সাধনা যে একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পার সামিল তা কি বিশদ ভাবে বোঝাবার প্রয়োজন আছে?

সংসারীর পক্ষে গৃহীর পক্ষে সাধুসঙ্গলাভের চেষ্টা তবে কি অনাচরণীয় অপরাধ? মোটেই তা নয়। চেষ্টাটা দোষের নয়, তবে তার ভিতরের উদ্দেশ্যটা কী সেইটে দেখা দরকার। আত্মশুদ্ধির তৃষ্ণাই সকল প্রকার ধর্মাচরণের মূল কথা। আত্মশুদ্ধির প্রেরণায় কেউ যদি সাধুসঙ্গলাভের প্রয়াস করেন, গৃহীই হোন আর অগৃহীই হোন তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলার থাকে না। কিন্তু এ তো তা নয়। এ হচ্ছে আত্মসুখান্বেষণেরই একটা রকমফের। ধনীর আধ্যাত্মিকতাপ্রীতির ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, আমার অনেক আছে অনেক পেয়েছি, হে ঠাকুর, সেগুলি যেন আমার অক্ষুণ্ণ থাকে। কিছুই যেন আমার বরবাদ না হয়। তোমার কোপে যেন সুবিধাভোগী শ্রেণীর খাতা থেকে আমার নাম খারিজ হয়ে না যায়। অনেক পেয়েছি তবে আরও চাই। পিপাসা যে কিছুতেই মেটে না ঠাকুর। হে ঠাকুর, তোমার অপরিসীম কৃপায় আমার সুখসৌভাগ্য উত্তরোত্তর যেন বৃদ্ধি পায়। একখানা মোটর করেছি, তিনখানা মোটর কেন আমার হয় না? টালায় বাড়ি করেছি, বালিগঞ্জের দিকে কেন আর একখানা বাড়ি করতে পারি না? ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স জমিয়েছি লাখ খানেক, তাকে দশ লাখে কেন পরিণত করতে পারি না? ব্লাড-প্রেসারে ভুগছি অনেক দিন, যে কোন মুহূর্তে সন্ন্যাস রোগে অক্কা পেতে পারি, হে ঠাকুর, অন্ততঃ পক্ষে এক শত বৎসরের পরমায়ু কেন পাই না?

এই গেল প্রার্থনার একদিক। আরও একটি দিক আছে এবং সেইটেই মোক্ষম দিক। ঠাকুর তুমি অন্তর্যামী, তোমার কাছে দোষ লুকিয়ে লাভ নেই। সংসারে সমাজে মানুষের মত মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে আচরণের একটু এদিক-সেদিক হয়েই থাকে। তুমি যেন তার জন্যে আমার প্রতি বিরূপ হয়ো না। আপিসে ঘুষখোর অফিসার হিসাবে আমার কিঞ্চিৎ দুর্নাম আছে স্বীকার করি, কিন্তু সে যে সাধুবাবার পায়ে আরও বেশী পরিমাণ ডালি দেবার রসদ যোগাবার জন্যই করি তা কি ঠাকুর তুমি বুঝতে পার না? ভাইকে ফাঁকী দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছি। কিন্তু তাতে কী? তা না করলে সপরিবারে মোটর-বিহারে মাতাজীর চরণে এসে প্রণাম নিবেদনের সৌভাগ্য অর্জন করতাম কী করে? পরকে দাবিয়ে পরের ঘাড়ে পা রেখে সামাজিক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছি? ঠাকুর, শেষ পর্যন্ত তুমিও ন্যাকা সাজলে? বড় হওয়ার এইটেই তো মহাজনপ্রদর্শিত

সর্বসম্মত পথ বলে জানি! তবে আমার বেলায় খুঁত ধরতে যাচ্ছ কোন্ যুক্তিতে? আর বড়ই যদি না হলাম, তবে আধ্যাত্মিকতার কাতুকুতু দিয়ে মনে সৌম্য প্রশান্তি ও প্রসন্ন আনন্দের সুড়সুড়ি অনুভব করব কোন্ উপায়ে? সুতরাং হে ঠাকুর, দোষ নিও না, আমাকে আমার কাজ বিনা বাধায় করতে দাও, তা হলে তোমাকেও আমি পয়মন্ত করে রাখব, তোমার বিগ্রহের আসন সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দেব।

অর্থাৎ প্রার্থনার এক অংশে সুখসমৃদ্ধির জন্য কাতরতা, অন্য অংশে পাপ স্খালনের জন্য অনুনয়-বিনয়। এর মধ্যে আত্মশুদ্ধি বা ব্যক্তিসত্তার উন্নয়নের কোন কথা নেই। প্রার্থনামন্ত্রের সবটাই নীরন্ধ্র স্বার্থপরতা দিয়ে ঠাসা। স্বার্থই এই অধ্যাত্ম-সাধনার প্রথম ও শেষ কথা। তার মানে আগাগোড়াই সাধনাটা মেকি।

গোড়ায় যে কয়জন মহাজনের নাম করেছি, তাঁদের একজনার কথায় আসি। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, ব্যক্তি-চরিত্রের উন্নয়নই হচ্ছে সব চাইতে বড় সাধনা। মানুষের চরিত্রের মৌলিক রূপান্তর না হওয়া পর্যন্ত তার কাছ থেকে বিশেষ কিছু আশা করা যায় না। গান্ধীজীও ভিন্ন প্রসঙ্গে মোটামুটি এই কথাই বলতেন। সর্বাগ্রে চাই নৈতিক চিত্তশুদ্ধি। স্বার্থবুদ্ধি-পরিহার নৈতিক চিত্তশুদ্ধির প্রথম সোপান। সমাজসেবাই বল আর স্বদেশ-সেবাই বল, ধর্মসাধনাই বল আর আধ্যাত্মিক অনুশীলনই বল, কমিউনি-জমই বল আর সোস্যালিজমই বল, যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যক্তি-চরিত্রের উন্নয়ন হচ্ছে ততক্ষণ কিছুই কিছু নয়; সব ফক্কিকার। আসল কথা, মানুষকে ব্যক্তিগত জীবনে খাঁটি হতে হবে, সত্যনিষ্ঠ হতে হবে, সৎ হতে হবে—তবেই এসবের একটা অর্থ হয়। পরের ভাল করতে যাব অথচ নিজের টাকা গুছোবার দিকেও ষোল-আনা চোখ রাখব—এ হয় না। আধ্যাত্মিক স্পৃহার লাগামে লম্বা দেব, আবার বিষয়ভোগের তৃষ্ণাও পুরোপুরি চরিতার্থ করতে চাইব—এও অসম্ভব। কেন না একটা স্পৃহা আর-একটা স্পৃহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। অভিজাত ও ধনী-শ্রেণীর ধর্মচর্চা প্রচণ্ড একটা ধাপ্পা বিশেষ। ধর্মচর্চার নামে এ হচ্ছে এক ধরনের স্বার্থসন্ধান। এই ধর্ম-চর্চার আয়োজনের মধ্যে আর কী উপাদান আছে জানি না, তবে ধর্মবোধ বস্তুটির যে একান্ত অভাব সে কথা নিশ্চিত। প্রকৃত ধর্মবোধ কোন-রকম অন্যায় সহ্য করে না, অথচ সব চাইতে বড় অন্যায় ধনীর নিজ জীবনেই

নিহিত। ধনীর ধনী হওয়া রূপ ঘটনার মধ্যে অন্যায়ের চরম রূপ প্রকট, কারণ বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় পরকে না ঠকিয়ে কেউ ধনী হতে পেরেছে এমন অসম্ভব তথ্য কেউ কখনও শোনে নি। কাজেই ধনীর মধ্যে ধর্ম-বোধের স্ফুরণ হয়েছে, অধ্যাত্ম-প্রীতি জাগ্রত হয়েছে, এ কথা যদি আমাকে বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে প্রথমেই আমি জানতে চাইব অসম ধনবণ্টন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছেন কিনা। তা যতক্ষণ পর্যন্ত না করলেন, আমি কেমন করে মানব যে তাঁর মধ্যে প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে? সাধুসঙ্গ করতে চাওয়াটাই তো সব নয়, কেন সাধুসঙ্গ করতে চাচ্ছি সেইটে হচ্ছে আসল কথা। আর যদি বলা হয় যে, একার চেষ্টায় সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্ভব নয়, সেই ক্ষেত্রে আমি অন্যান্য বিষয়ে চরিত্রশুদ্ধির, চারিত্রের কার্যকরী প্রমাণ দাবী করব। একটি প্রমাণ, স্বার্থবুদ্ধির অবলোপ। প্রকৃত ধর্মবুদ্ধিযুক্ত মানুষ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয় না—পরার্থপরতাই তার ধর্মবুদ্ধির নিশানা। পরার্থপরতা ধর্মবোধের অঙ্গ, সুতরাং আধ্যাত্মিকতারও বটে। আধ্যাত্মিকতা তখনই শুধু সার্থক যখন এ কথা নিঃসংশয়িতরূপে বুঝতে পারব যিনি আধ্যাত্মিকতার শরণ নিতে চাচ্ছেন তিনি স্বার্থবুদ্ধির ঊর্ধ্বে উঠতেপেরেছেন। তা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ আধ্যাত্মিকতা একটা অসার বিলাস রূপেই গণ্য হওয়া উচিত। লেখকের চোখে এ জাতীয় আধ্যাত্মিকতার মূল্য কাণাকড়িও নয়। ঘাগী দেহোপজীবিনীর তীর্থ-প্রবণতার মতই তা সমান অশ্রদ্ধেয়।

॥ ৮ ॥

আমার রূঢ়ভাষী বলে কিছু বদনাম হয়েছে। আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, সে বদনামটি আমি চেখে চেখে ভোগ করছি। বন্ধুরা বলেন, আমি নাকি লোকটা বেজায় নিরীহ, সাত চড়েও আমার মুখে রা নেই। বোধ করি কথাটা সত্য। আর সত্য বলেই নিজের উপর আমার এক এক সময় ভারী রাগ হয়। সবাই কেমন কড়া কথা কঠিন সুরে বলে, আমি পারি নে। অক্ষমতার গ্লানি মেনে নিতে সঙ্কোচ, আবার তাকে ঝেড়ে ফেলতেও স্বভাবের বাধা—এই লজ্জা ঢেকে রাখবার স্থান নেই।

আমাকে যখন কেউ শান্তশিষ্ট বলে প্রশংসা করে, আমি তাতে মনে মনে ক্ষুব্ধ হই। ওটাকে আমি সাধারণতঃ নিন্দা হিসাবেই গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু এবার বুঝি আমার ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে। লোকের কাছ থেকে আমি রূঢ়ভাষী আখ্যা পেয়েছি। একটা যুদ্ধজয়ের গৌরব ভিতর থেকে মনটাকে দোলা দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। পাঠকসাধারণের দেওয়া এই আখ্যা আমি শিরোধার্য করে নিলুম।

লেখক মাত্রেরই ব্যক্তিত্ব দুটি ভাগে বিভক্ত। এক তাঁর সামাজিক ব্যক্তিত্ব, অপর লেখক-ব্যক্তিত্ব। লেখক-ব্যক্তিত্বই লেখকের আসল পরিচয়, তাঁর সামাজিক ব্যক্তিত্ব গৌণ। যে ব্যক্তি সমাজ-জীবনে নিতান্তই গোবেচারা বলে পরিচিত, হয়তো দেখা যায়, তাঁর লেখাতেই সব চাইতে বেশী আগুন ঝরে। সমাজ-জীবনে মূক হয়ে থাকতে বাধ্য হওয়ার গ্লানি লেখকেরা সাধারণতঃ কলমের মুখরতার দ্বারাই অপনোদন করে থাকেন। তাঁদের ঝালটা লেখনীমুখে প্রকাশিত, রসনামুখে নয়। আর খতিয়ে দেখলে, লেখকের লেখনীটাই হচ্ছে তাঁর সত্যকারের রসনা—তা থেকে প্রয়োজনভেদে রস ও রোষ দুই-ই সমপরিমাণে নিষ্কাশিত করা যায়। লেখক কখন কোন্‌টা করবেন সেটা তাঁর সাময়িক 'মুডের' উপর নির্ভর করে। আপাততঃ আমি রোসের পথটাই বেছে নিয়েছি।

যাক, আর মুখবন্ধ করব না, এবারে মুখ খুলব। দেখুন, 'রূঢ়ভাষী' অভিধা যখন একবার পেয়েই গেছি, তাকে মিইয়ে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। এই সুনামটাকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাই। শুধু বাঁচিয়ে রাখা নয়, তাকে সম্পূর্ণ করতে চাই। 'আত্মদর্শনের' মাধ্যমেই এই কাজটি নিষ্পন্ন হোক।

এবারে যে কথা বলব তা রীতিমত 'ব্ল্যাস্‌ফিমাস'। পাঠকরা আমাকে মার্জনা করবেন কিনা জানি না, পাঠিকারা মার্জনা করতে পারবেন না, সে কথা নিশ্চিত। সুতরাং আগেভাগেই তাঁদের কাছে আমি ত্রুটি স্বীকার করে রাখছি।

আমাদের সমাজে নারী দেবীরূপে পূজিতা। মাতৃত্বের মহিমা কীর্তনে আমরা পঞ্চমুখ। পঞ্চমুখ কিন্তু একচক্ষু। মহিমার অন্তরালবর্তী কালিমাটা আমাদের চোখে পড়ে না। মায়ের জাত হলে আর কথা নেই, তাঁদের শত দোষ মাপ। কিন্তু মায়ের জাত বলেই কি তাঁরা মানবিক বিচারের রায়

এড়িয়ে যেতে পারেন? মাতৃত্ব কি সব রকম অকৃতিত্বেরই প্রতিষেধক?

আমি চোরাবাজারী ব্যবসায়ী, ঘুষখোর অফিসার ও শোষণকারী ধনীর বনিতাদের কথা বলছি। এঁরা কি ভুলেও কখনো স্বামীর দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন? আমার তো মনে হয় না। তা যদি করতেন, তাহলে একজন দুষ্কৃতকারীকেও অন্ততঃ আমরা অসৎ পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত দেখতে পেতুম। কিন্তু দেখি না। একবার দুষ্কৃতির পথে যে পা বাড়ায় সে শনৈঃ শনৈঃ সে পথে এগিয়ে চলে। পিছন থেকে এমন কোন বাধা সে পায় না যা তার রাশ টেনে ধরতে পারে।

এর থেকে এই সিদ্ধান্তই কি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে না যে, এই সব ধনী-গৃহিণীদের বিবেক স্বামীর দুষ্কৃতিতে আদৌ পীড়িত হয় না? হয় তাঁরা স্বামীর অপরাধ দেখেও দেখেন না; নয়তো স্বামীকে অসদুপায়ে অর্থোপার্জনের পথে প্রকারান্তরে আরও উৎসাহিত করেন। এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার পক্ষে হাজির করা শক্ত হবে কিন্তু একটা পরোক্ষ প্রমাণ এই যে, স্বামীর অর্থের দ্বারা ক্রীত শাড়ী গয়না পরতে এঁদের বাধে না। বাড়ী-গাড়ী তো দু'হাতেই লুফে নেন। এঁদের মনোভাব অনেকটা রত্নাকর দস্যুর পত্নীর মনোভাবের ন্যায়।—স্বামী অর্থলাভ নরহত্যা করে করেছে কি আর কোন উপায়ে করেছে সেটা স্ত্রীর দেখবার দায় নয়। স্বামী তাঁর অগ্নি-সাক্ষী-করা বিবাহিতা পত্নীকে ভরণপোষণ করতে ধর্মতঃ বাধ্য, তা তিনি সে কাজ যেভাবেই করুন।

এই মনোভাব আজকের যুগে অচল। অন্যায়কারীর ন্যায় অন্যায়-সহনকারীও আধুনিক সমাজের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। বিশেষতঃ অন্যায়সহনকারী যদি অন্যায়কারীর স্ত্রী হন তবে তো তিনি কোনক্রমেই দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। আমাদের সমাজে স্ত্রীর অপর নাম সহধর্মিণী। শাস্ত্রে স্বামীর সহিত স্ত্রীরও সহধর্মাচরণের বিধান আছে। স্বামীর পুণ্য স্ত্রীতে অর্শায়; স্ত্রীর পুণ্য স্বামীতে। তা-ই যদি হয়, তাহলে স্বামীর পাপও কেন স্ত্রীতে অর্শাবে না? স্ত্রী স্বামীর পাপের দায়িত্ব এড়িয়ে থাকবেন কোন্ যুক্তিতে? অর্ধাঙ্গিনী পুণ্যের অর্ধভাগ নেবেন পাপের অর্ধভাগ নেবেন না এ কেমন কথা?

শাস্ত্রবচন থাক্। কারণ ও জিনিসটাতে আমি নিজেই খুব একটা আস্থা পোষণ করি না। মাঝে মাঝে মামুলি কায়দায় দুই একটা যুক্তি দেওয়া

প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাই দিলুম। বৈজ্ঞানিক যুক্তি মানুষ সহজে বিশ্বাস করতে চায় না, তাই উক্তির আশ্রয় নিতে হয়। পশ্চাতে শাস্ত্র-বচনের ঠেকো না থাকলে সহজ মানবতার দাবীও সময় সময় অগ্রাহ্য হবার আশঙ্কা থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের অনুকূলে আর বহুবিবাহ প্রথার প্রতিকূলে শাস্ত্রবচন উদ্ধার করেছিলেন, যদিও তিনি মনে মনে জানতেন তার কোন প্রয়োজন নেই। সেই রীতির অনুসরণেই এখানে শাস্ত্রোক্ত 'সহধর্মিণী' 'অর্ধাঙ্গিনী' প্রভৃতি কথার অবতারণা।

চোরাকারবারীর কথাই ধরুন। অসহায় জনসাধারণের ট্যাঁক ফোঁপরা করে দিয়ে এই-যে দলে দলে চোরাকারবারী স্ফীত হতে স্ফীতকায় হচ্ছে সেই স্ফীতি কি তাদের স্ত্রীদেরও স্পর্শ করে না? করে বই কি, নইলে তাঁরা এত মেদবহুলা হবেন কেন? পথ চলতে তাঁদের শাড়ী-গয়নার ঝলমলানি জনসাধারণের চোখই শুধু ধাঁধায় না, মনেও এই ধাঁধার সৃষ্টি করে, এত ঐশ্বর্য তাঁদের স্বামীরা তাঁদের যোগায় কী করে? শাড়ী-গয়নার আসল রহস্যটা কোথায়? ঐ দেখুন, কথাটা খানিকটা পরশ্রীকাতরতার মত শোনাচ্ছে। কিন্তু হলফ করে বলতে পারি ধনীর বিরূপ সমালোচনা মাত্রই পরশ্রীকাতরতা নয়। বাচালতা মার্জনা করবেন, পরস্ত্রী সম্বন্ধে আলোচনা মাত্রই যেমন পরস্ত্রীকাতরতা নয়, তেমনি পরশ্রী সম্পর্কে আলোচনা করলেই তা পরশ্রীকাতরতা হয় না।

পথ-চলার কথাটা অবশ্য ভুল বললুম। চোরাকারবারীর স্ত্রী রাস্তায় পায়ে হেঁটে চলেন না, গাড়ীতে ভর করে চলেন। বাড়ীতে-গাড়ীতে তাঁরা জমজমাট। স্বামীর গরবে তাঁরা গরবিনী। তাই ভুলেও তাঁদের মনে এই প্রশ্ন জাগে না, স্বামী দেবতারা তাঁদের আদর-সোহাগ করে যে উপহার ধরে দেন তা সদুপায়ে অর্জিত অর্থের দান, না, আর কিছু। সম্ভবতঃ অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে তাঁরা বেমালুম এ জাতীয় প্রশ্ন চেপে যান। কিংবা আদৌ তাঁদের মনে অস্বস্তি জাগে না। এ বিষয়ে তাঁদের বিবেক নিরঙ্কুশ হওয়াই সম্ভব। নতুবা, যে কথা আগে বলেছি, একজন দুষ্কৃতকারীও অন্ততঃ স্ত্রীর প্রভাবে অসৎ পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হত। স্বামীর দুষ্কৃতির জন্য স্ত্রীর মনে গ্লানিবোধ জাগে না বলেই স্বামী অসদাচরণে আরও বেশী উৎসাহ পায়।

যদি বলেন স্বামী যে অপরাধ করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রী তা জানতে পান না সুতরাং স্ত্রীর দায়িত্ব এখানে প্রায়-অনুপস্থিত, সে কথা আমি মানতে রাজী নই। দু-চার ক্ষেত্রে হয়তো স্ত্রীর উদাসীন চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু পুকুর চুরির ব্যাপারগুলি বোঝেন না এত হাঁদা আমাদের দেশের মেয়েরা নন। মানুষের মন সবতাতে সন্দেহ করতে অভ্যস্ত আর এখানেই শুধু সন্দেহের উদয় হয় না এ কথা অবিশ্বাস্য।

এ সমাজের গড়ন হচ্ছে পরিবারকেন্দ্রিক। আবার পরিবারের গড়ন গৃহিণীকেন্দ্রিক। বিশেষ করে ধনীগৃহে গৃহিণীর বিনিঃশেষ আধিপত্য। আঁচলে তিনি যে মোটা চাবির গোছা ঝুলিয়ে চলেন. সেটা পরিবারের সমস্ত সুখদুঃখের চাবিকাঠি বিশেষ। স্বামী-পুত্র-কন্যার সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে গৃহিণীর ব্যস্ততার অবধি নেই। খোকার একটু সর্দি মত হয়েছে, ডাকো ডাক্তার; মিনির গানের জন্য মাস্টার ('মাস্টার মশাই' নয়, 'মাস্টার') আছে, নাচের জন্যও একজন মাস্টারকে খবর দেওয়া দরকার; ওরে মণ্টু, তোকে এত পই পই করে বলি ওসব ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে মিশিসনে, তবু বারণ শুনবিনে, এই ছেলেগুলির দৌরাত্ম্যে আমার হাড়-মাস কালি হবার যোগাড়—পুত্র-কন্যার সুখ-স্বাস্থ্য-শিক্ষার তত্ত্বাবধানে ধনী গৃহিণী অনবরত চরকীবাজীর মত পাক খাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরই প্রতিবেশী ঘরের ছেলে-মেয়ে হয়তো চিকিৎসার অভাবে মরণাপন্ন, শিক্ষার অভাবে মনের দিক থেকে চিরতরে বিশীর্ণ, সঙ্গীর অভাবে নিরানন্দ—সে কথাটা তাঁর মনে একবারও উঁকি দেয় না। স্বার্থপর পরিবারকেন্দ্রিক সমাজের স্বার্থপর অভ্যাস। এই অশ্রদ্ধেয় অভ্যাস থেকে দেবীরূপে পূজিতা গৃহিণীরাও মুক্ত নন। তাঁরা নাকি মায়ের জাত, তাই তাঁদের স্বার্থপরতাটা আরও বেশী চোখে লাগে। এমন কি এক এক সময় তা অমার্জনীয় মনে হয়। সমাজে বহুর লাঞ্ছনার জন্যে যে মুষ্টিমেয়ের দুষ্কৃতি দায়ী, সেই মুষ্টিমেয়েরা তো এঁদেরই স্বামী কিংবা পুত্র কিংবা ভ্রাতা? কিন্তু ভুলেও কি তাঁরা সে কথা স্মরণ করেন?

॥ ৯ ॥

বছর ষোল-সতের আগে 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় (অধুনালুপ্ত) "তুই, তুমি ও আপনি" প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছিল। সম্বোধন বাক্য

'তুই' 'তুমি' ও 'আপনি' এর যে-কোন একটিতে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত অথবা পাত্র ও উপলক্ষ্য ভেদে তিনটিই ব্যবহৃত হওয়া উচিত এই নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মতদ্বৈধের সীমা-পরিসীমা ছিল না। যেমন অন্যান্য বিতর্কের বেলায়, তেমনি এই বিতর্কের বেলায়ও কোন মীমাংসা সম্ভব হয় নি। 'বিচিত্রার' পাতায় বাক্যের ঝড়, তর্কের ধূলি উৎক্ষিপ্ত হওয়াটাই সার হয়েছিল।

আজকের আলোচনায় আমি 'তুই-তুমি-আপনি' বিতর্কটির পুনরবতারণা করতে চাই। তবে একটু ভিন্ন অভিপ্রায়ে। 'আত্মদর্শন' এই অবধি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, নেহাৎ তাত্ত্বিক আলোচনার প্রতি আমার ঝোঁক কম। আলোচনার মাধ্যমে সমাজচেতনাকে সচকিত করবার উদ্দেশ্যেই আমি মুখ্যতঃ লেখনী ধারণ করেছি। এই আলোচনার ক্ষেত্রেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে না, বলাই বাহুল্য। 'বিচিত্রা'য় যাঁরা 'তুই' 'তুমি' 'আপনি'র যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বহুলাংশে ছিল রোমান্টিক। আমি রোমান্সের ধার ধারি না। আমার অন্যতম চিন্তাগুরু বার্ণার্ড শ'র ন্যায় এই মতে আমি সুদৃঢ় বিশ্বাসী যে, রোমান্স হচ্ছে তরল মস্তিষ্কের বিলাস। একমাত্র নির্বোধেরই সেটা উপজীব্য। ভদ্রলোকের ধাতে সইবার মত জিনিস রোমান্স নয়। আমি এখানে বিষয়টিকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবার চেষ্টা করব। চেষ্টাটা আমার, ফলাফল নির্ণয়ের ভার পাঠকের উপর।

'তুই তুমি আপনি'—এই-যে সম্বোধনের প্রকারভেদ, একে রোমান্টিকতার আবরণ দিয়ে যতই গোপন করবার চেষ্টা হোক, এ কথা জোর গলায় বলা দরকার যে, মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৃত্রিম সামাজিক বৈষম্যের ভাব ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই এই সম্বোধনগুলির সৃষ্টি। ভারতীয় সমাজ, বিশেষ করে হিন্দু সমাজের সর্বস্তরে বৈষম্য যত প্রবল এমন আর কোথাও নয়। জাতিভেদ যে সমাজের ভিত্তি, সে সমাজের মানুষ যতই আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে চেষ্টা করুন না কেন, তাঁর দৃষ্টিতে উচ্চ-নীচের ব্যবধান-বোধ প্রকট না হয়ে পারে না। আধুনিক ধারার জীবনযাত্রা-পদ্ধতির চাপে আমরা জাতিভেদের খোলসটাকে মাত্র দূর করতে পেরেছি, কিন্তু জাতিভেদবুদ্ধি আমাদের মনের গভীরে আজও তার শিকড় বিস্তার করে আছে। একটু অসতর্ক হলেই সেটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

শিক্ষিত বলুন অশিক্ষিত বলুন, কুলীন বলুন অকুলীন বলুন, সকলের মধ্যেই এই বৈষম্যবোধ অতি প্রবল। অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণ ও নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি আমাদের অবজ্ঞা বদ্ধমূল। শিক্ষাভিমানীরা হয়তো মুখে এ কথা স্বীকার করতে চাইবেন না, কিন্তু অসাবধান মুহূর্তে তাঁদের চামড়া একটু আঁচড়ালেই গোপাল ভাঁড়ের গল্পের 'সড়া অন্ধা'র মত তাঁদের মুখ দিয়ে তাচ্ছিল্যের বুলি বেরিয়ে আসবে। এটা কল্পনা-কথা নয়, প্রত্যেকেই তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথার সাক্ষ্য দিতে পারবেন, আশা করি।

'তুই' 'তুমি' ও 'আপনি' এই বৈষম্যেরই একটি বহিরভিব্যক্তি। নিতান্ত পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুচক্রের মানুষ ছাড়া আমরা সাধারণতঃ 'তুই' 'তুমি' সম্বোধন ব্যবহার করি না। মাননীয়দের এবং অপরিচিত অর্ধ-অপরিচিত ভদ্রলোকদের বেলায় এবং কর্মজীবনে পরস্পরের মধ্যে সাধারণ সম্বোধনের প্রণালী হিসাবে আমরা প্রধানতঃ 'আপনি' ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণীয় বা নিম্ন জীবিকায় রত ব্যক্তিদের বেলায় এই রীতি রক্ষা করি না। সেখানে 'তুই' অথবা 'তুমি'র নির্বিচার প্রয়োগের দৃষ্টান্তটাই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আমরা সাম্যবাদ ও সমানাধিকারের কথা বলি, মুখে প্রগতির মহিমা ঘোষণা করে অনেক গাল-ভরা বুলি কপচাই, কিন্তু আমাদের গোড়াতেই গলদ। সম্বোধনটা হচ্ছে পরিচয়ের প্রথম সোপান। সেখান থেকেই আমাদের বৈষম্যবোধের শুরু হয়। শুরু থেকেই আমরা মানুষের গায়ে বৈষম্যের চিহ্ন এঁকে দিই, তার মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত করি। শুরু থেকেই আমরা একের শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা অপকৃষ্টত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই। কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্পিত হীনম্মন্যতায় মিলে পারস্পরিক পরিচিতির পালা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একেবারে গোড়াতেই বিষিয়ে যায়।

কিন্তু কেন এমন হবে? কেন আমরা সম্বোধনের প্রণালীকে বৈষম্যের কলঙ্ক মুক্ত করতে পারব না? কনিষ্ঠকে 'তুমি' সম্বোধনে আপত্তি দেখি না, বরং সেইটেই বিধেয়, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ পরিচিত বন্ধু বা স্নেহভাজনদের বেলায় তুই-তুকারিও না হয় গ্রাহ্য, কিন্তু বহির্জগতে 'আপনি-তুমির' এই কৃত্রিম পার্থক্য কেন? লৌকিক সংস্কার বাদ দিলে এমন কোন মানদণ্ড কি আবিষ্কৃত হয়েছে যার সাহায্যে বলা যেতে পারে অমুক যথার্থ মাননীয় একজন ব্যক্তি, অমুক ব্যক্তি অশ্রদ্ধেয়? মানদণ্ডের মধ্যে

তো একমাত্র পোষাক। যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্নে পোষাক দিয়েই আমরা সাধারণতঃ মানুষের মূল্য বিচার করে থাকি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা এইটেও জানি যে, পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়ে সব সময় মানুষের মূল্য-বিচার হয় না। অন্ততঃ এ-সমাজে তো নয়ই। আর এ কথা জানি বলেই মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'আপনি' বলব কি 'তুমি' বলব এই নিয়ে গোলে পড়তে হয়। আর সেই সঙ্কট এড়াবার জন্যে আমরা প্রায়ই আপনি-তুমির ধাঁধা এড়িয়ে গিয়ে ননকমিট্যাল ভাববাচ্যের আশ্রয় নিয়ে থাকি। আপনি-তুমি সম্পর্কে এই-যে ইতিকর্তব্যবিমূঢ়তা, এইটেই প্রমাণ করে যে এই বৈষম্যের জন্যে আমাদের মনে একটা অপরাধচেতনা লুক্কায়িত রয়েছে। আমাদের বিবেক এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত নয়।

সম্বোধনটা হল আমাদের হাতে এক ধরনের অঙ্কুশ। মাহুত যেমন হাতীকে অঙ্কুশ তাড়না করে, আমরাও তেমনি সম্বোধনের অঙ্কুশ দ্বারা মানুষকে প্রতিনিয়ত তাড়না করছি এবং প্রত্যেককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি সামাজিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে কার কোথায় স্থান। মানুষকে সমঝাবার, প্রয়োজন হলে ঘায়েল করবার জন্যে আপনি-তুমি-তুইরূপ তিন তিনটে বিষাক্ত শায়ক আমাদের তূণীরে সর্বদাই মজুত আছে। পাত্র ভেদে যখন যেটা প্রয়োজন ঝেড়ে দিই। ব্যস, সম্বোধনের এক ঘায়েই কুপোকাৎ। সম্বোধন তো নয় সম্বধন। সম্যক্‌রূপে বধপর্ব সম্পাদন।

সম্মান এবং তাচ্ছিল্য বোঝাতে ইংরেজীতে (দাউ, দি) কথার প্রচলন আছে বটে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তার ব্যবহার নেই। সেখানে 'ইউ'-রই একাধিপত্য। একমাত্র ইউ, আর কিছু নয়। আমাদের সম্বোধনের বেলাতেও যদি আপনি-তুমির ব্যবধান ঘুচে গিয়ে শুধু মাত্র 'তুমি'র (তুমিই ভাল, যেহেতু সেটা অধিক সুখোচার্য এবং অধিক শ্রবণাভিরাম) প্রচলন হত, তা হলে সামাজিক সম্পর্ক নিরূপণের ক্ষেত্রে অকারণ তিক্ততার সৃষ্টি হত না। সম্বোধনকারী এবং সম্বোধিত দুই পক্ষই বিমূঢ়তার কবল থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচত।

কিন্তু তা কি হবার যো আছে? তা হলে যে ব্যবধান জীইয়ে রাখার একটি মোক্ষম অস্ত্রই হাতছাড়া হয়ে যায়। শ্রেণীবৈষম্যপীড়িত বর্তমান সমাজের মানুষের কাছ থেকে, জাতিভেদ ও হিন্দুয়ানির মনোভাব দ্বারা আচ্ছন্ন হিন্দুর কাছ থেকে এই উদারতা বোধ করি আশা করা যায় না।

চাকর-বাকর বেয়ারা-আর্দালীকে তুই-তুকারি করে সম্বোধন করা কলকাতার সমাজে বিশেষ চলতি। এতে উচ্চ সমাজের বিবেক আদৌ পীড়িত হয় না। পুচকে এইটুকুন এক ছোকরা বা এই একরত্তি একটি খুকি দশাসই জোয়ানকেও তুই বলে হাঁকডাক করছে এ দৃশ্য নিতান্ত মর্মপীড়াদায়ক। যাকে ডাকা হয় তার হয়তো গায়ে বাজে না, অভ্যাসে অভ্যাসে তাচ্ছিল্য-সম্বোধনটি তার গা-সওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু ভদ্র রুচিতে জিনিসটা নিতান্ত দৃষ্টিকটু। শ্রুতিকটু তো বটেই। আর কিছু না হোক, বয়সের সম্মান বলেও তো একটা কথা আছে। সেটাও এ ক্ষেত্রে স্বীকৃত নয়। তথাকথিত নিম্ন জীবিকায় নিয়োজিত ব্যক্তির প্রতি আমাদের অবজ্ঞা যে কত মজ্জাগত এই দৃষ্টান্ত তার অন্যতম প্রমাণ।

অনেকে এ-জাতীয় তুই-তুকারিকে এই যুক্তিতে সমর্থন করেন যে, এই ধরনের সম্বোধনের মধ্যে যে আত্মীয়তার ভাব প্রকাশ পায় তা 'তুমি' কিংবা আর কোন সম্বোধনের মধ্যে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। আত্মীয়তা না হাতি! দেখুন, যে কোন আচরণকে যে কোন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় পিছনে যদি কূটবুদ্ধির পোষকতা থাকে। বুদ্ধিমান লোকেরা প্রায়শ এই প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে অন্যায় কার্যকে সমর্থন করে থাকেন। কূটবুদ্ধির বকযন্ত্রে শোধিত হয়ে অন্যায় আর তখন অন্যায় থাকে না, হয়ে ওঠে প্রচণ্ড এক মহৎ কার্য।

আপনি-তুমির ভেদ ঘুচাবার বিরুদ্ধে একটি রোমান্টিক যুক্তি হল এই যে, তাতে বাঙ্গালী তরুণ-তরুণীর প্রেম-নাট্যের সর্বাপেক্ষা নাটকীয় অংশটিই বরবাদ হয়ে যায়। নায়িকা যেখানে অনেক বায়নাক্কার পর সমস্ত সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে 'আপনি'র বদলে নায়ককে 'তুমি' সম্বোধনে আপ্যায়িত করে উপন্যাসের সেইটেই হচ্ছে সব চাইতে চিত্তাকর্ষক অংশ। অন্ততঃ শরৎবাবুর উপন্যাস থেকে আমরা এই শিক্ষাই পেয়েছি। শরৎবাবু নায়িকার মুখ দিয়ে কখন যে ফস্ করে 'তুমি' বলাবেন তার জন্যে নায়কই মোটে প্রস্তুত থাকে না, পাঠক তো কোন্ ছার। ফলে ব্যাপারটা অল্পতেই বেশ জমে ওঠে। আপনি-তুমির ভেদাভেদ বিলুপ্ত হলে প্রেমপর্বের এই মধুরতম রসটিই যাবে নষ্ট হয়ে। আপনি-তুমির কোন্দলের পাকে ফেলে সেই মধুর রসটিকে কি নষ্ট হতে দেওয়া উচিত?

বুর্জোয়া সমাজে তরুণ-তরুণীর প্রেমের খেলা হয় ছেলেখেলা, নয়তো নিতান্তই একটা ঘিনঘিনে ব্যাপার। বাঙলা উপন্যাসে সচরাচর মন-দেওয়া-নেওয়ার যে চিত্র অঙ্কিত হয়ে থাকে তাকে সস্তা হৃদয়বৃত্তির সুড়সুড়ি ছাড়া আর-কিছু বলা যায় না। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কেন, সে আলোচনা আজ নয়, আরেক দিন অবকাশমত সে প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাবে। আপাততঃ আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সামাজিক অন্যায়-অবিচারের পাশে প্রেম-ফেম কিছু নয়। তথাকথিত প্রেম মেরুদণ্ডহীন মানুষের বিলাস, সুতরাং পরিবর্জনীয়।

॥ ১০ ॥

'আত্মদর্শন'-এর পাঠক কেউ কেউ অভিযোগ করতে পারেন, আমি শুধু বাঙলা সমাজ ও বাঙালী চরিত্রের মন্দ দিক নিয়েই আলোচনা করছি; বাঙালী জীবনের ভালত্ব আমার চোখে পড়ছে না। ছিদ্র অন্বেষণেই আমার তৃপ্তি।

গোড়াতেই বলে রাখি, অভিযোগ খণ্ডনের অভিপ্রায় আমার নেই। অভিযোগটি আমি বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিচ্ছি। শুধু তাই নয়, 'আত্মদর্শন' রচনার সূচনা থেকেই আমি পূর্ণমাত্রায় সচেতন—কাদের নিয়ে লিখব, কী লিখব, কীভাবে লিখব। বাঙালী সমাজকে আঘাত করব বলেই কলম ধরেছি; আর দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য আপাততঃ আমার নেই।

যদি বলেন এই প্রবৃত্তি কেন, এত এত বিষয় থাকতে স্বজাতির দোষত্রুটিকেই কেন বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছি, তা হলে তার একটা কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য। জ্ঞানতঃ যখন একটা কাজ করা হচ্ছে, সেটা কেন করা হচ্ছে এ প্রশ্ন স্বতঃই উঠতে পারে। সুতরাং প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। অতএব পাঠক-পাঠিকারা অবধান করুন।

দেখুন, মোলায়েম কথা, ফুলেল কথা, মিহি সুরে মিহি কথা তো অনেক বলা হয়েছে। তাতে বাঙালীর অর্থাৎ আমাদের চরিত্রের কি কিছু উনিশ-বিশ হয়েছে? বরং চোখের উপর কী দেখছেন?—বাঙালী চরিত্র দিন

থেকে দিনে অধঃপতিত হচ্ছে। আদর্শ ও নীতিভ্রষ্টতার রূঢ় হস্তাবলেপে বাঙালী-জীবন আজ বিনিঃশেষে কলঙ্কিত। অন্যায় ও ব্যভিচারে দেশ ভরে গেল। এই সময়ে যদি আপনি মৃদু সুরে মধুর ভঙ্গিতে সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে যান, আপনি নির্ঘাত উপহসিত হবেন। শুধু তা-ই নয়, তাতে আরও উল্টো বিপত্তি ঘটবে। আপনার অনুনয়-বিনয়ের ভঙ্গি বিপথগামীদের নিরস্ত না করে তাদের আরও উৎসাহিত করবে। তারা ধরে নেবে আপনার তাড়নার পিছনে জোর নেই, আপনার সংশোধন-প্রয়াস ভর্ৎসনারহিত, তাই অনুনয়ের ছলে আপনার সানুনাসিক কান্না। আর সত্যি, কান্না ছাড়া একে কী-ই বা বলা যায়? বিবেচনা করুন, এ পর্যন্ত উপদেশ নির্দেশ অনুজ্ঞা অনুরোধ প্রস্তাব পরামর্শ কত কিছুই তো কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা হল। তাতে কিছু কাজ হয়েছে? কালোবাজারী উৎপাত, ব্যবসায়ীদের মুনাফাগৃধ্নুতা, দুর্নীতিপরায়ণদের ঘুস-খাওয়ার লোভ, ক্ষমতাবানদের আত্মীয়ানুগ্রহ, সুবিধাভোগীদের শোষণপ্রবৃত্তি কিছু কমেছে? মানবশ্রেষ্ঠ গান্ধীজী আজীবন দুহাতে প্রেম বিলিয়ে গেলেন। তাতে লাভটা কী হল? জগাই-মাধাইরা এমন কলসীর কানাই তাঁকে ছুড়ে মারল যে আর তাঁকে উঠতে হল না—প্রেম বিলোতে গিয়ে তিনি প্রাণ দিলেন।

গান্ধীজী যে পথে সুবিধা করতে পারলেন না, সেখানে আমরা তো কোন্ ছার! প্রেমমাহাত্ম্যে বিগলিত হয়ে কলমের মাধ্যমে যদি প্রেম বিতরণ করতে লেগে যাই, তবে লোকে বলবে লোকটার কলম ভোঁতা, তাই ককাচ্ছে। আর যদি যুক্তিজাল বিস্তার করে কিছু বোঝাতে চাই তবে বলবে, পর্বত-প্রমাণ যুক্তি হজম করে বসে আছি, ইনি এলেন আবার নতুন করে যুক্তি ফলাতে। 'এ্যাঙ্ গেল ব্যাঙ্ গেল...ইত্যাদি।'

সুতরাং মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করবার তৃতীয় যে পথ বিদিত অথচ সামান্যই পরীক্ষিত সেইটেই হচ্ছে আমার পথ—চাবুক মারার পথ। হিতকথা বলে মানুষকে জাগাতে না পারি চাবুক মেরে জাগাব। গায়ের উপর আগুনের ছ্যাঁকা লাগিয়ে তাকে সচকিত করব। এ কথা আমি উচ্চ গৃহ-চূড়া থেকে সরবে বল্‌ব, রেখে-ঢেকে কথা বলার দিন আর নেই। বাঙালী সমাজ পচে গলে আজ চারদিকে এমন এক পূতিগন্ধময় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রলেপ লাগিয়ে রোগ আরোগ্য করা যাবে না। চাই কড়া

দাওয়াই—কি কথায়, কি কাজে। মহা মহা ব্যক্তিদের উপদেশ-সমুদ্র যারা অক্লেশে সাঁতরে পার হয়ে গেছে, তাদের আপনি কয়েক ঘড়া জল ঢেলে সায়েস্তা করবেন এত বড় স্পর্ধা আপনার না করাই উচিত। বিবেকের অঙ্কুর যাদের মনে উদ্গত হয় নি, অঙ্কুশই তাদের একমাত্র ঔষধ।

ধনী ও (তথাকথিত) অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমার যে জ্বালা তা মোটেই গাত্রদাহপ্রসূত নয়, সেটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঈর্ষাও তার কারণ নয়। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব একটি মত আছে এবং সবিনয়ে বলব, সেটি কিছু বিশিষ্ট। আমি মনে করি, যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের একটি মাত্র লোকও অনাহারে-অর্ধাহারে থাকতে বাধ্য হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজের আর সব লোক নিদারুণ অপরাধে অপরাধী। আপনি যদি কষ্টে দিনাতিপাত করেন, অভাব ও অনটন যদি আপনার নিত্য সঙ্গী হয়, কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি নিষ্কর্মা থাকতে বাধ্য হন, তা হলে আমি তার দায়িত্ব কিছুতেই এড়াতে পারি না। কেন না আমি এবং আমার ন্যায় আর দশজন সুবিধাভোগীর চক্রান্তেই আপনার এই দৈন্যদশা। পরকে বেকায়দা না ক'রে এ সমাজে কেউ বড় হতে পারে না, বিত্তবান হতে পারে না। আমি যে সমাজের উপরতলায় বসে করুণার দৃষ্টিতে আপনার প্রতি তাকাচ্ছি সেটা সম্ভব হত না যদি না আপনাকে বঞ্চনা করার সঙ্ঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র আমাদের সাফল্যমণ্ডিত হত। আপনাকে এক কালে মই হিসাবে ব্যবহার করেছিলাম বলেই আমার আজ চোখ-ধাঁধানো প্রতিপত্তি, এদিকে আপনি তলায় তলিয়ে আছেন আর পড়ে পড়ে মার খাচ্ছেন। টুর্গেনিয়েভ লিখেছেন, 'সুখ যে পায় অপরকে দুঃখ দিয়েই সে তা পায়।' একজনার সুখ আর অন্য দশজনার দুঃখের উপর নির্ভর করে। এটা জারের আমলের রাশিয়া সম্পর্কে যেমন সত্য, তেমনি আজকের দিনের বাঙলা দেশ সম্পর্কেও সমান সত্য। আমার প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির মূলে রয়েছে আপনার দুর্গতি। আপনার দুর্গতি আমার সাফল্যের সোপান তৈরী করেছে।

সমাজে যারা 'সাক্সেস্‌ফুল ম্যান'রূপে পরিচিত তাদের সাফল্যলাভের ইতিবৃত্ত একটু তলিয়ে দেখলেই এ কথা স্পষ্ট হবে। কেউ পরকে ঠকিয়ে বড় হয়েছে, কেউ সহকর্মীদের অন্যায় ভাবে দাবিয়ে বড় হয়েছে, কেউ পরিবারের আর সকলের উপর খবরদারী করে এবং তাদের চেপে বড় হয়েছে, কেউ খোসামোদের জোরে বড় হয়েছে, কেউ বা টাকার জোরে, কেউ মুরুব্বির

জোরে। যাঁরা সৎ ও সাধু অথচ বিত্ত ও মুরুব্বি হীন, শুধু সততার জোরে এ সমাজে তাঁদের বড় হওয়ার কোন আশাই নেই। 'অনেষ্ট লেবার' দ্বারা জীবনে কেউ সাফল্যলাভ করেছে এমন অদ্ভুত নজীর আমি অন্ততঃ আমার জীবদ্দশায় দেখি নি। শুনেছি বিদ্যাসাগর মহাশয়দের আমলে সততার, সাধু পরিশ্রমের দাম ছিল; সমাজও তাঁর দাম দিত। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে কেন যে, আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়দের যুগ বহু পিছনে ফেলে এসেছি। এটা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। এ যুগে ধনকৌলীন্য ছাড়া আর কোন কৌলীন্যের দাম নেই। তেলো মাথাকে আরও তৈলাক্ত করার নীতিতেই এ যুগের লোক বিশ্বাসবান। সাধুতার কেউ দাম দেয় না, কিন্তু শঠতার শতমুখে প্রশংসা। এ সমাজে শাঠ্যেরই আর এক নাম কুশাগ্র বুদ্ধি। সৎ হয়েও যে বুদ্ধিমান হওয়া যায়, এবং খতিয়ে দেখতে গেলে সততাই যে বুদ্ধিমত্তার শ্রেষ্ঠ নিশানা এ তত্ত্ব আর আজকের সমাজে গ্রাহ্য নয়। এ সমাজে বাহবা পেতে হলে পরকে শোষণ করবার, শাসন করবার, দাবড়ানি দেবার, চোখ রাঙাবার ক্ষমতা অবশ্য থাকা চাই। যাঁরা স্বভাবে ভদ্র, আচরণে ভদ্র, সামাজিক জীবনে তাঁরা নো-পাত্তা: 'বুলি' ও 'বুল' শ্রেণীর জীবেরা তাঁদের গালে চড় মেরে এবং তাঁদের প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়ে, (ভদ্রলোকের প্রতিবাদ কেউ কানে তোলে না) দেখতে দেখতে সামাজিক প্রতিষ্ঠার মই বেয়ে উপরে উঠে যাবে। ভদ্রতার বালাই নিয়ে ভদ্রলোকের নীচে পড়ে থাকাটাই নিয়ম। অপরকে ভেংচি কেটে জব্দ করবার এবং লেংচি কেটে ফেলে দেবার ক্ষমতা যার যত বেশী তার সাফল্য তত সুনিশ্চিত।

সব চেয়ে পরিতাপের ও লজ্জার, এই সব ব্যক্তিগত অসংগতি ও অনাচার কেউ দেখেও দেখে না। সবাই আমরা কম্যুনিজম্ সোস্যালিজম্, র‍্যাডিক্যালিজম্ প্রভৃতি বড় বড় ইজমের সাধনায় ব্যস্ত, সমষ্টির মঙ্গল অভিযানে বহির্গত। কিন্তু ব্যক্তিচরিত্রের উন্নতি না হলে যে কিছুই কিছু নয় এ কথাটা কেউ স্বীকার করেন বলে মনে হয় না। যিনি পরের ভাল করবেন তিনি নিজেই যদি অসৎ হন তবে তাঁর মঙ্গল প্রয়াসের কতটুকু ফল হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তাঁর বড় বড় কথারই বা কী মূল্য! সমষ্টির শুদ্ধির আগে ব্যক্তির শুদ্ধি দরকার। কিন্তু এটা বড় জোর আমাদের মুখের কথা, অন্তরের কথা আদৌ নয়। অন্তরের কথা হলে সমাজের চেহারা অন্যরকম হত।

অন্তরের কথা যে নয় তার একটি প্রমাণ কেউ ব্যক্তিচরিত্রের অসঙ্গতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিবাদ করে না। পরের ট্যাঁক মারা থেকে আরম্ভ করে পরের বউকে ছিনিয়ে নেওয়া পর্যন্ত সর্ববিধ অপকার্যই আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কোন কিছুই আমাদের বিচলিত করে না। সমাজের যাঁরা মাথা, গণ-জীবনের এক-একজন কেষ্ট-বিষ্টু, তাঁরা পর্যন্ত নির্বিকার। সকলপ্রকার অনাচার তাঁরা চক্ষু বুজে অস্বীকার করবার চেষ্টা করছেন। এঁদের প্রশান্তির ঘেরা-টোপটুকু বোধ হয় গণ্ডারের চামড়া দিয়ে তৈরী, তাই কোন কিছুই তার উপর দাগ কাটে না। আর এঁদের সহিষ্ণুতা ততোধিক নীরন্ধ্র। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার সৎসাহস এ সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে।

এর একটা কারণ বোধ করি এই যে অন্যায় যাঁদের দমন করবার কথা তাঁদের মধ্যেই অন্যায়কারীর সংখ্যা বেশী। সরিষা স্বয়ং ভূতগ্রস্ত, সুতরাং ভূত ছাড়ানো কেমন করে সম্ভব? সমাজের উপর-তলায় দু'শ্রেণীর অন্যায়কারী আছে। এক যারা হাতে-কলমে অন্যায় করে, দুই, তাদের মোসাহেবের দল। এদের সকলেই শিক্ষিত বলে সাধারণ্যে পরিচিত। এমন কি এদের মধ্যে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতও অনেক আছেন। জনসাধারণের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে অথচ সুযোগের অভাবে যা প্রকাশের পথ পায় না, এরা সুপরিকল্পিত নীরবতার চক্রান্ত দ্বারা তাকে চেপে-রাখবার চেষ্টা করে। কেন না কেলেঙ্কারী জানাজানি হলে সকলেরই সমান অসুবিধা। আর সত্যি, উপরের দিকে সমর্থন না পেয়ে সাধারণের প্রতিবাদস্পৃহা ধীরে ধীরে মিইয়ে আসে, এক সময় একেবারেই তা নিভে যায়। শিক্ষিত, বিত্তবান আর সুবিধাভোগী শ্রেণীর চক্রান্তে জনসাধারণের সম্ভাবিত বিদ্রোহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ভাবেই পরাজিত হয়।

কিন্তু সত্যকে চাপা দেওয়া কি এতই সোজা? বিদ্রোহের পলিতাকে পায়ের তলায় মাড়ালেই কি তার স্ফুলিঙ্গ নিভে যায়? অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শিখাকে জ্বালিয়ে রাখবার জন্যেই কিছু সংখ্যক স্পষ্টভাষী লোকের প্রয়োজন—যাঁরা প্রচলিত ধারার শিক্ষার ধার ধারেন না, বিত্তের ধার ধারেন না, কৌলীন্যের ধার ধারেন না। নির্যাতিত ও শোষিত জনসাধারণের বন্ধুরূপেই 'আত্মদর্শন'-এর লেখকের সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ। তাঁর ভঙ্গিটা বিদ্রোহের, সব কিছুতে সায় দেওয়া মিহি ভদ্রতার নয়। এ কারণে তাঁর লেখা একটু কটু ও তিক্ত মনে হওয়াই স্বাভাবিক। সম্ভাব্য অনুযোগকারী

পাঠকদের আমি দোষ দিই না। পাঠকবর্গ জেনে রাখুন, লেখকের সামাজিক ব্যক্তিত্ব নিরীহ, কিন্তু তাঁর ভিতরটা অগ্নিময়। কাজেই তাঁর রচনায় রোমাণ্টিক আর্দ্রতা আশা করবেন না।

॥ ১১ ॥

এবার ভোজন-তত্ত্ব নিয়ে কিছু বলব। তা বলে ভাববেন না আমি লোকটা ঔদরিক। খিদেয় খিদেয় আমার পেট মরে গেছে। এক্ষণে চোখের সামনে চর্ব-চোষ্য লেহ্য-পেয়ের স্তূপীকৃত সমাবেশ দেখলেও উল্লসিত হই নে, শুধু নিরুপায়ের মত পাহাড়প্রমাণ খাদ্যের প্রতি নিরাসক্তভাবে তাকিয়ে থাকি মাত্র।

আমার কিংবা আমি যাদের প্রতিনিধি তাদের কথা হচ্ছে না। এখানে আমি শুধু তাঁদের কথাই বলব, খাদ্যকে যাঁরা কিনা একটা 'আর্টের' পর্যায়ে নিয়ে তুলেছেন এবং যাঁদের ঘরণীরা এই নিয়ে মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় নূতন নূতন পাকপ্রণালী বর্ণনা করে প্রবন্ধ লেখেন। সুসম খাদ্যের গুণাগুণ কিংবা বিশিষ্ট ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করা হয় কাদের কাছে? না, যে-দেশের শতকরা অন্ততঃ পঁচাত্তরটি লোক অর্ধাশনে থাকতে বাধ্য হয়, অনাহার যে-দেশের অধিবাসী-সংখ্যার একটা মোটা অংশের অনিবার্য দৈনন্দিন নিয়তি। পৃথিবীতে যতরকমের পরিহাস-রসিকতা চলিত আছে এটি তার মধ্যে সব চাইতে উচ্চাঙ্গের রসিকতা —এই অভুক্তের কাছে বিচিত্র ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা পেশ, ফলাও করে তাদের প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণনা। আমাদের সাময়িক পত্রের কর্তাদের যদি কিছুমাত্র বিবেকবোধ থাকত, তা হলে পত্রিকার মারফৎ সুষম খাদ্যের গুণাগুণ প্রচারের পূর্বে বিষয়টি অন্ততঃ কয়েকবার তাঁরা ভেবে দেখতেন।

সম্প্রতি আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট উপবাসের কায়দাটাকে আরও বেশী রপ্ত করার জন্যে জনসাধারণকে উপদেশ দিয়েছেন। কর্তাদের উপদেশেই উপবাস কিনা, তাই উপবাস সম্বন্ধে জনসাধারণকে উপদেশ দিতে তাঁদের আটকায় না। এটা মরার উপর খাঁড়ার ঘা ছাড়া আর কী? যে সমস্ত ভাগ্যবানের উদরপূর্তির সুযোগ অবাধ ও অবারিত, তাঁদের

উপবাস করতে বলার একটা মানে বোঝা যায়, কিন্তু উপবাসই যার বিধিলিপি তাকে আরও কষে উপবাস করতে বলাটা প্রচণ্ড এক বিদ্রূপ। এ বিদ্রূপের তুলনা নেই।

আমাদের সমাজে ধনীরা পালপার্বণ বিবাহাদি উপলক্ষ্যে কাঙ্গালী ভোজনের ব্যবস্থা করে থাকেন। এটা হচ্ছে ডান হাতে অনেক নিয়ে বাম হাতে খানিকটা খুদকুড়ো ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। এই বদান্যতায় প্রীত হওয়া যায় না। সারা বছর পেটে যাদের কিছু পড়ে না, একদিন হঠাৎ ভূরিভোজনে তাদের হিতের চাইতে অহিতই হয় বেশী। অতি-ভোজনের ধাক্কাটা প্রায়ই তারা সামলাতে পারে না। ফল অজীর্ণ ব্যাধি ও পাকাশয়ের বিকলতা।

পুরাতন ধনীরা তবু এটুকু সামাজিক দায়িত্ব অন্ততঃ পালন করেন। তাকে মন্দের ভাল বলা যায়। নূতন ভুঁইকোঁড় ধনীরা তাও করেন না। তাঁদের খানাপিনার ঘটা নিতান্তই আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুচক্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আদান-প্রদানের রীতি অনুযায়ী তাঁদের ভোজনের সমারোহ। অর্থাৎ এ ওকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়; রিটার্ণ ভিজিটের মত রিটার্ণ নেমন্তন্ন। ফলে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের সমারোহটা চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে এবং কখনও তা ঘনিষ্ঠ বন্ধুচক্রের গণ্ডী অতিক্রম করে না।

পারস্পরিক পিঠ-চুলকানির এটা হচ্ছে ঔদরিক সংস্করণ। এখানে 'পেটে খেলে পিঠে সয়' না, বরং তার উল্টো। আগে পিঠের বন্ধুত্বটাকে রগড়ান হয়, তারপর পেটের পালা। এই শেষোক্ত পরীক্ষায় যিনি সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হতে পারেন, ধনীমহলের নূতন পরিভাষা অনুসারে তিনিই যথার্থ বন্ধু। এটাকে তেলো-মাথায় তেল দেওয়ার নবতম প্রক্রিয়া আখ্যাও দিতে পারেন। যার অনেক আছে, ফেলে ছড়িয়ে খেয়েও যার ফুরোয় না, তাকে বাড়ীতে আদর করে ডেকে এনে ষোড়শোপচারে আপ্যায়িত করার কোন অর্থ হয় না। অথচ প্রায়শ এইটেই ঘটে দেখতে পাই। ভরা পেটকে আরও ভরাবার ব্যবস্থাটাই এই সমাজে স্বীকৃত; অভুক্ত উপবাসী লোকের ভাগ্যে খুদ্-কুড়োটিও জোটে না। অপরিমিত আহারে আহারে যার খাদ্যদ্রব্যের প্রতি অরুচি ধরে গেছে, এক অদ্ভুত সামাজিক বিধানবলে তার কোলের দিকেই ঝোল টানা হয়। উপমাটি শুধু ভাষার অলঙ্কার হিসাবে এখানে প্রযুক্ত হয় নি, আক্ষরিক অর্থেও সত্য।

খাদ্যবস্তুর যদি কোথাও প্রচণ্ড অপচয় ঘটে থাকে, এই ক্ষেত্রেই ঘটছে। অথচ এদিকে সদাশয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি নেই। তাঁরা যদি সত্যই খাদ্যের অপচয় রোধ করতে চান, তবে প্রথমেই তাঁদের কর্তব্য হবে এমন একটা নিয়ম বেঁধে দেওয়া যাতে আদান-প্রদানগত সামাজিক নিমন্ত্রণের রীতিটি একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। এই রীতি বন্ধ হলে কারুরই ক্ষতি নেই বরং ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত আইনে এই সুস্পষ্ট বিধান থাকা উচিত যে, সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কাউকে বাড়ীতে আমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারবে না; আইনের এই বিধান যে লঙ্ঘন করবে তাকে পরীক্ষামূলক শাস্তি হিসাবে এক বেলা কি একদিন উপবাস করে থাকতে হবে। তবেই শর্মারাম ঢিট হয়ে যাবেন। পুরিত-উদর ব্যক্তিকে কাবু করবার পক্ষে এক বেলা উপবাসই যথেষ্ট; আর কোন কঠিন শাস্তির প্রয়োজন হবে না।

এই-যে সরকারী স্তরে ঘন ঘন রাজকীয় খানাপিনা লাঞ্চ ডিনারের ব্যবস্থা করা হয় তাতে কী মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় জানি না, তবে পর্বতপ্রমাণ খাদ্য অপচয় হয় এটা প্রত্যক্ষ। এখানেও সেই একই ভরা পেট ভরাবার রাজকীয় ব্যবস্থা। বিলেতে ডিনার টেবিলে বসে "পলিটিকাল স্পীচ" দেবার রেওয়াজ আছে, এ দেশে সে রেওয়াজ অচল। ঠাণ্ডা দেশে শরীর অল্পতেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাই খেয়ে, ঘন ঘন খেয়ে, তাকে গরম রাখতে হয়। বিশেষতঃ গরম গরম রাজনৈতিক বুলি ঝাড়তে হলে ত শরীর অবশ্যই গরম রাখা চাই। সেইজন্যেই সে দেশে খেতে খেতে বক্তৃতা দেওয়া, বক্তৃতা দিতে দিতে খাওয়া। কিন্তু এ দেশে তার কী প্রয়োজন? তবু বিলিতি কায়দায় 'ষ্টেট-ব্যাঙ্কোয়েট' করা চাই; খাবার টেবিলের মাথায় দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে কিছু না কিছু বলা চাই। কথার তো এতে অপচয় হয়ই খাদ্যেরও অপচয় হয়। কথা এবং খাদ্য দুটোই রসনাসম্পৃক্ত; সুতরাং মৌখিক অপচয়ের পরিমাণ মারাত্মক হয়ে ওঠে।

ভোজের টেবিলে ছাড়া আমাদের নেতাদের আলাপ জমতে চায় না। প্রসঙ্গ যা-ই হোক, সঙ্গে কিঞ্চিৎ খাদ্য ও পানীয়ের যোগাযোগ থাকা চাই। কারও কারও আবার এক বিশেষ ধরনের পানীয় না হলে মুখ খুলতে চায় না। এইটেও অসার বিলিতি কায়দা। কথা ঝালিয়ে নেবার জন্যে মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ ঝোল-ঝালের প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু আহারের পর্বটাকে

একট রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজনে পরিণত করার কোন অর্থ হয় না, যা সচরাচর করা হয়ে থাকে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বয়ংনিযুক্ত সমাজসেবী সদাশয় "রোটারিয়ানদের" কথা বিবেচনা করুন। দেশে দেশে রোটারী প্রতিষ্ঠানের শাখা, বড় বড় জাঁদরেল ব্যক্তি সব মেম্বর। সমাজের হিত-চিন্তায় এঁদের নিদ্রার কীরূপ ব্যাঘাত হয় জানি না, তবে আহারের যে বিশেষ ব্যাঘাত হয় না রোটারী ক্লাবের সাপ্তাহিক ভোজসভাগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সভাগুলিতে প্রচুর ভোজনবিলাসের সঙ্গে প্রচুর বাক্যবিলাসের চর্চা হয়ে থাকে। যে-পরিমাণ খাদ্য গেলা হয় সে পরিমাণ কথা ওগরানো হয়। মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখবার এটা একটা পরীক্ষিত উপায়। উপায়টি স্থূল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ফল সূক্ষ্ম আকারে দুঃস্থ ও দুর্গতদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। যে কোন প্রকারের সমাজকল্যাণের প্রক্রিয়া কিছু পরিমাণে আধ্যাত্মিক কিনা, তাই তার ফলটাও সূক্ষ্ম হতে বাধ্য। সাদা চোখে তাকে দেখা যায় না, তাকে প্রত্যক্ষ করতে হলে ঋষির তৃতীয় নয়নের দরকার।

খাদ্য অপচয়ের আর একটি ঢালাও পথ হল উৎসব উপলক্ষ্যে কুটুম-বাড়ীর নেমন্তন্ন। উৎসবটি বিয়ে হতে পারে, ছেলের অন্নপ্রাশন হতে পারে, কিংবা এ জাতীয় আর-কিছু হতে পারে। সম্বৎসরে একটিবার তত্ত্ব নেবার নামটি নেই, কেউ কারও যোগ-জিজ্ঞাসার ধারও ধারে না; কিন্তু বিয়ের আসরে খুঁজে পেতে কুলপঞ্জিকা হাতড়ে আত্মীয়-স্বজন গুষ্টিকুটুম সকলকে নেমন্তন্ন করা চাই। সে এক ইলাহি কাণ্ড। যেন নেমন্তন্নের লিষ্টি থেকে কাউকে বাদ দিলে জাত আর রক্ষা হচ্ছিল না। আদিখ্যেতাটা একবেলা ডেকে এনে খাওয়াবার বেলায়, যদিচ গোটা বৎসরে কেউ কারও কথা ভুলেও স্মরণ করে না। অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্কটা মূলতঃ ঔদরিক, আন্তরিক নয়। এ-জাতীয় বারোয়ারী খাওয়ানোর ঘটা ঘটা করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

॥ ১২ ॥

বড়দিনের ছুটির আর অধিক বিলম্ব নেই। এখন থেকেই তথাকথিত শিল্পামোদী অলস ধনীর দল তৎপর হয়ে উঠছেন। বড়দিনের আসন্নকে

সর্বপ্রকার ললিতকলা ও শিল্পের আয়োজন দ্বারা সমৃদ্ধ করবার প্রস্তুতিপর্ব চলছে। এঁদের আর সর্ববিষয়ে আলস্য, শুধু এই ব্যাপারেই যা প্রচণ্ড উৎসাহ—যে-কোন উপায়ে দেশকে শিল্প-সচেতন করে তুলতে হবে এবং তার গুরু দায়িত্ব এঁরা স্বয়ং কাঁধে তুলে নিয়েছেন। অর্থাৎ আত্ম-আরোপিত দায়িত্ব, কেউ এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবার জন্য তাঁদের মাথার দিব্য দেয় নি। দিব্য-সুখে যাঁরা আছেন তাঁদের দিব্য দেবার প্রয়োজন হয় না; তাঁরা নিজের ভিতরের তাগিদেই দিব্যি সব মহৎ কর্তব্য পালন করে থাকেন।

কলকাতার চৌরঙ্গীকে কেন্দ্র করেই এই সব আভিজাত্য-লাঞ্ছিত শিল্প-তৎপরতার স্রোত মুখ্যতঃ আবর্তিত হয়, বলা বাহুল্য। এই সব আয়োজন অনুষ্ঠানে-যোগ দিতে জনসাধারণের ডাক পড়ে না; তারা ব্রাত্য, তারা অন্ত্যজ (আধুনিক পরিভাষা অনুসারে), তারা বেরসিক। চৌরঙ্গীর উৎসব-অনুষ্ঠানের ঘটা, তার সমারোহ, তার বড়দিন আগাগোড়া বড়দের ব্যাপার; তাতে আমাদের মত সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। বড়দিনের আড়ম্বরের ছিটে-ফোঁটা দেখেই আমাদের আনন্দ, আর সেটা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখাই নিরাপদ।

চৌরঙ্গীর বড়দিন আর বড়দিনের চৌরঙ্গীতে ব্রিটিশ আমলের জৌলুষ আর চোখে পড়বে না সত্য, কিন্তু অতীতের ভগ্নাবশেষ যা রয়েছে তা-ই বা কম কিসে? আর তাছাড়া, শুধু এর বাইরের খোলসটাই বদলেছে, ভিতরের চেহারা তেমন বদলায় নি। আগে সাদা চামড়ার আধিপত্য ছিল, এখন সেটা কমে গিয়ে কালো চামড়ার অধিকার বিস্তৃত হয়েছে। বিলিতি সায়েবের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে দিশি সায়েব, অর্থাৎ জাতীয় নেতার দল এবং তাঁদের অনুগৃহীত সাঙ্গোপাঙ্গ, ধনিকবনিক, ঠিকাদার-দালাল, বাতিল জমিদার এবং সুবিধাভোগী শ্রেণীর আর যে-সব নিষ্কর্মা প্রতিনিধি রয়েছেন তাঁরা। ভোগের আয়োজন-উপকরণ ঠিকই আছে, শুধু মানুষগুলির ভোল বদলেছে।

সকল বিষয়ে পূর্বের ধারা অক্ষুণ্ণ আছে তার একটি বড় প্রমাণ, বড়দিন-ওয়ালাদের শিল্পোৎসাহে এতটুকু ভাঁটা পড়ে নি। বস্তুতঃ, শিল্পই হল বড়দিনের উৎসবের মধ্যমণি; তাকে ঘিরে আর যা-কিছু আয়োজন। এই বিবেচনা করুন, বড়দিন উপলক্ষ্যে চৌরঙ্গীতে যে আর্ট একজিবিশন হবে—যা প্রতিবৎসর হয়ে থাকে—তার কত আয়োজন কত উপচার। মস্ত

মস্ত শিল্পসংগ্রাহক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে ছবি বেছে একজিবিশনে পাঠাবেন; অপেক্ষাকৃত অকুলীন দশজন (বড়দের মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে) সে ছবি প্রত্যক্ষ করে কৃতকৃতার্থ হবেন; চিত্রশিল্পের তথাকথিত রসিকসুজনেরা এই উপলক্ষ্যে বক্তৃতা দেবার লোভ ছাড়বেন না; কাগজে-কাগজে ঢক্কানিনাদ ও স্তুতিবচনের ছড়াছড়ি পড়ে যাবে; আসবেন রাজ্যপাল, নগরকোটাল, আঞ্চলিক সেনাপতি এবং জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলীর ততোধিক জনপ্রিয় মন্ত্রিগণ, এমন কি স্বয়ং রাষ্ট্রপতি মহাশয়ের অভ্যাগমন হওয়া পর্যন্ত অসম্ভব নয়। তিনি কালো চশমার ফাঁক দিয়ে ছবি, মানুষ, মানুষের মন সব কিছু দেখবেন, অথচ তাঁকে কারও দেখা চলবে না, চোখের ঢাকার সাহায্যে মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে নিজের মনকে আড়াল করে তিনি একটি সময়োপযোগী বক্তৃতা দেবেন, চারিদিকে সপ্রশংস হাততালির 'তুফান উঠবে—এক কথায় অভিজাতকুলের শিল্পোচ্ছ্বাসকে কেন্দ্র করে চারিদিকে একটা সোরগোল পড়ে যাবে। এবং লোকে এ কথা নিঃসংশয়ে বুঝবে—যদি আগে না বুঝে থাকে—যে, দেশকে জাগাতে হলে কলাশিল্পের মধ্য দিয়েই তাকে জাগাতে হবে; অন্যান্য পন্থা ইতরজনানুমোদিত পন্থা, সুতরাং ইতর পন্থা। দেশের জনসাধারণের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করা কিছু কাজের কথা নয়; তার থেকে শিল্প অনেক বেশী জরুরী, অনেক বেশী মূল্যবান। না খেতে পেয়ে দুদশটা লোক মরে গেলে কিছু ক্ষতি নেই, কিন্তু শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা চাই। খাদ্যবস্ত্রের স্থূল সমস্যা নিয়ে পড়ে থাকে তারাই যাদের শিল্পবোধ নেই, সৌন্দর্যপ্রিয় সূক্ষ্ম রুচিবান মানুষের পথ ভিন্ন।

ওহো, আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি। যাঁর উদ্যোগে এই আর্ট একজিবিশন হবে, যিনি সমস্ত প্রেরণা ও প্রচেষ্টার মূলে, তাঁর কথাই দেখছি আলোচনা থেকে বাদ পড়ে গেছে। প্রতি বৎসর একজনই যে উদ্যোক্তা হবেন তার কোন কথা নেই। তবে সচরাচর যে শ্রেণীর মানুষ এ-জাতীয় সমারোহের আয়োজনের পশ্চাতে থাকেন, তাঁদের চেহারা মূলতঃ এক। তিনি স্ত্রীলোকও হতে পারেন পুরুষও হ'তে পারেন—সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে তাঁদের শ্রেণীগত রূপ। যেমন তিনি কবি রবীন্দ্রনাথের এককালীন সার্টিফিকেটপূত শিল্পামোদী কোন প্রবীণ জমিদার হতে পারেন, অথবা কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কার, অথবা নীতিহীন কোন

অর্থনীতিবিদ্ (এ সমাজে অর্থ যাঁর আছে তিনিই অর্থনীতিবিদ্), অথবা কোন ঝানু আই-সি-এস-এর স্ত্রী (যাঁর একমাত্র কাজই হল সভাসমিতি করে বেড়ানো) অথবা কোন জাঁদরেল শিল্পপতির শিল্পোৎসাহিনী পুত্রবধূ অথবা এ-জাতীয় আর কেউ।

আলোচনার খাতিরে ধরে নেওয়া যাক নামপঞ্জীর একেবারে শেষে যাঁর কথা বলা হয়েছে তিনিই এ বৎসরের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। তিনি কী জাতীয় জীব ? তাঁকে যদি একটা শ্রেণীর প্রতীক ধরা যায় তবে কেমন সে শ্রেণী ? বলা অসম্ভব নয়, কারণ এ জাতীয় মানুষের স্বরূপ ও কর্মধারার সহিত আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত আছি। এঁরা লাইট হাউস কিংবা এম্পায়ার মঞ্চে মাঝে মাঝে দুর্গত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থে নাচের 'শো'র ব্যবস্থা করে থাকেন, গবর্ণমেণ্ট হাউসের উৎসব-অনুষ্ঠানে স্বামী সমভিব্যাহারে এঁদের নিয়মিত গতায়াত, স্বামী যদি সরকারী কোন বড় আমলা হন তো মূক-বধির বিদ্যালয়ের অথবা কোন অনাথ-আলয়ের এক্স-অফিসিও ভাইস-প্রেসিডেন্ট, চিত্রকলার 'কনয়শ্যর', বিবিধ চারুশিল্প প্রতিষ্ঠানের 'নিরর্থক' পৃষ্ঠপোষিকা ইত্যাদি ও প্রভৃতি। 'অবৈতনিক' কাজ মানে যে কাজের বেতন নেই ; ঠিক সেই সূত্র ধরে 'নিরর্থক' কথাটির মানে হল এমন কাজ যাতে অর্থসাহায্য করতে হয় না। অবশ্য এ বাদেও কথাটির একটি অর্থ আছে—আক্ষরিক অর্থ—যা এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে।

আসল কথা হচ্ছে, সমাজকল্যাণ বল, শিল্পোৎসাহ বল, এঁদের ক্ষেত্রে সমস্তই একটা লোকদেখানো প্রক্রিয়া। শিল্পের জন্যও এঁদের দরদ নেই, সমাজের জন্যও এঁদের দরদ নেই। শিল্পের জন্য এঁদের যে-পরিমাণ উৎসাহ, তার চাইতে শতগুণ বেশী উৎসাহ নিউ মার্কেটে 'শপিং'-এর দিকে। এক একটা 'শপিং' উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ঝুড়ি ঝুড়ি সওদায় এরা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন তাতে তিন তিনটে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের যাণ্মাসিক গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হতে পারে। সিনেমায়, রেস্তোরাঁয়, ক্লাবে এঁরা যে টাকা ঢালেন তার একটা সামান্য অংশও যদি দেশের শিল্পীদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে এরা ব্যয় করতেন তা হলে শিল্প-সাহিত্যের অবস্থা আজ অনেক বেশী উন্নত হত। প্রকৃত শিল্পীরা অর্থাভাবে, সহানুভূতির অভাবে ম্রিয়মাণ, জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে তাঁদের সৃষ্টিকুশলতা ও আত্মপ্রকাশের স্ফূর্তি ব্যাহত, সমাজে তাঁরা অনাদৃত-

উপেক্ষিত, অথচ তাঁদের দিকে ফিরে তাকাবার কথা কারও মনে হয় না। যারা প্রচারবাদী, পৃষ্ঠপোষকতার মুখাপেক্ষী এবং সেই সুবাদে ধনীর তোষামোদ-কারী, তারাই হল শিল্পী, তারাই সকলের মনোযোগের বস্তু, আর যাঁরা কোন অবস্থাতেই রজতকৌলীন্যের নিকট স্বীয় আত্মা বিক্রয় করতে প্রস্তুত নন, শিল্পনিষ্ঠাই যাঁদের একমাত্র গর্বের বস্তু ও পুঁজি, তাঁরা পড়ে আছেন সকলের মনোযোগের বাইরে। এই বিসদৃশ অন্যায় ব্যবস্থার অবসান কবে হবে? অবশ্য এও ঠিক যে, প্রকৃত শিল্পসাধকের দল ধনীর পৃষ্ঠপোষকতার ধার ধারেন না; রাষ্ট্রপতি কিংবা রাজ্যপাল তাঁদের সঙ্গে কর-মর্দন করলে কিংবা সুন্দরী ধনীদুহিতা কুন্দবিনিন্দিত দন্তপংক্তির উদ্ভাসিত হাসির আভায় তাঁদের আপ্যায়িত করলে তাঁরা খুশী হন হয়তো, কিন্তু খুব যে একটা মহৎ প্রাপ্য পেলেন এ তাঁরা মনে করেন না। সুতরাং এঁরা যে অভিজাতচক্রের মনোযোগের বাইরে পড়ে থাকবেন এতে আর আশ্চর্য কি!

আর্ট একজিবিশন কি এ-জাতীয় আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানাদির দ্বারা উপকার হয় না তা বলব না। তবে তার মূল্য খুব বেশী নয়। এতে শিল্পচর্চার অনুকূলে কিছু প্রচার হয় এই মাত্র। কিন্তু সত্যিকার শিল্পীরা এর দ্বারা বিশেষ উপকৃত হন না। শিল্পপ্রীতির নামে শিল্পবোধের অসাড়তার রূঢ় হস্তাবলেপ দ্বারা সমগ্র ব্যাপারটি কলঙ্কিত এবং তা ধনিকস্পৃষ্ট বলে তার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা যায় না।

১৩

কলকাতার হোমরা-চোমরা ডাক্তারদের 'কল' পিছু 'ফি' কারও ষোল, কারও বত্রিশ, কারও চৌষট্টি। কারও তার চাইতেও বোধ হয় বেশী, ঠিক বলতে পারব না। কারণ এখনও যে বেঁচে আছি, বেঁচে থেকে 'আত্মদর্শন' লিখছি, সেইটেই একটা প্রমাণ যে অত মোটা ভিজিটের ডাক্তার ডাকবার সৌভাগ্য হয় নি। অনেকের আবার শুধু ভিজিটে মন ওঠে না, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ভাড়াও আদায় করে নেন। গাড়ী ভাড়া, অর্থাৎ রুগীকে নির্বিঘ্নে বৈতরণী নদী পার করে দেবার পারানি।

মোটা ভিজিটের ডাক্তারের সান্নিধ্য লাভ করে রুগী যে প্রায়ই অক্কা

লাভ করে সেটা ডাক্তারের হাতযশের গুণে নয় (সত্যের খাতিরে এটুকু আমাদের স্বীকার করতেই হবে)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা ঘটে এতগুলো টাকা একসঙ্গে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার শোকের প্রাবল্যে। ডাক্তার প্রশস্ত নির্লিপ্ত মুখে সুবিজ্ঞ রায় দেন : হার্টের আকস্মিক বিকলতাই মৃত্যুর জন্যে দায়ী। বটেই তো। হার্টের আর দোষ কি!

আধুনিক সমাজব্যবস্থায় দুর্বলের উপর সবলের নানা রকম শোষণ-উৎপীড়ন চলছে। আমরা তা দেখেও দেখি না কেন না এইটেই রেওয়াজ। কেউ যদি দুর্বল হয়, তখনি আমরা মনে মনে স্বীকার করে নিই যে, সবলের তাকে পীড়ন করবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে; আর এই থেকেই সবল দুর্বলকে পীড়ন করবার উৎসাহ পায়। মানুষের অসহায়তার সুযোগে এ এক ধরনের উৎকট খেলা—যে যত বেশী হৃদয়হীন তার এ খেলায় তত বেশী উৎসাহ। পীড়ন মাত্রই হৃদয়হীন; কিন্তু ডাক্তারদের এই যদৃচ্ছা পারিশ্রমিক হাঁকার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস বোধ করি হৃদয়হীনতার চরম। মানুষের দুঃখ মূলধন করে স্ফীত হওয়ার চেষ্টার এর চাইতে বেদনাদায়ক দৃষ্টান্ত বুঝি আর নেই।

বলা হবে, ডাক্তারদের মধ্যে যাঁর যেরূপ যোগ্যতা ও খ্যাতি তাঁর দক্ষিণা তদনুযায়ী নির্দিষ্ট হবে এর মধ্যে বিস্ময়ের কী আছে। চাহিদা চড়লে মূল্যও চড়বে, এ তো অর্থনীতির একটা প্রাথমিক সূত্র। ডাক্তারদের বেলায় এই সূত্র প্রয়োগে আপত্তি কেন। যে ডাক্তার চিকিৎসাশাস্ত্রে কৃতবিদ্য, অভিজ্ঞ, প্রচুর হাতযশসম্পন্ন এবং সেই সুবাদে যশস্বী, তিনি যদি তাঁর দক্ষিণার হার না বাড়ান তা হলে তো তাঁকে 'কলের' তাড়নায় অচিরেই বিকল হয়ে পড়তে হবে। দু'টাকা ফিয়ের ডাক্তারদের মত তিনি তো আর বাড়ী বাড়ী ডাক্তারি ব্যাগ বয়ে বেড়াতে পারেন না। রুগীর ধান্দায় সমস্ত শহর চষে বেড়ানো তাঁর দায় নয়। তাঁর সময়ের দাম আছে, অভিজ্ঞতার দাম আছে; কাজেই দক্ষিণার বেলায় তাঁর দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের অবকাশ কোথায়?

যুক্তিটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মোটামুটি এই যুক্তি আমি স্বীকার করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কথা থেকে যায়। ডাক্তারদের বিদ্যাবুদ্ধি, অভিজ্ঞতার পরিমাণের এমন কোন মানদণ্ড কি আবিষ্কৃত হয়েছে যার জোরে বলা যায় অমুক ডাক্তারের ফি দুটাকার বেশী হওয়া উচিত নয়, অমুক ডাক্তারের

ফি চৌষট্টি টাকাই হওয়া উচিত? খতিয়ে দেখতে গেলে সমস্ত ব্যাপারটাই কি গায়ের জোরের মামলা বলে মনে হবে না? কেউ যে ফি হিসাবে অবিশ্বাস্য পরিমাণ মুদ্রা দাবী করে, কেউ তা পারে না, সে কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই জন্যেই নয় যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি যেভাবেই হোক নিজের অনুকূলে একটা কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে, দ্বিতীয়ের সে সৌভাগ্য হয় নি? তুলনামূলক বিচারে প্রথমের যোগ্যতা সমধিক, এ কথা যদি প্রতিপন্নও হয়, তা হলেই কি তাঁর ঐ অবিশ্বাস্য রকমের চড়া দর্শনী হাঁকবার মাত্রাহীন অধিকার জন্মায়?—আমি তা মনে করি না। বোধ করি ডাক্তাররা নিজেরাও তা মনে করেন না। সুযোগ যখন একবার পাওয়া গেছে তখন চুটিয়ে তাকে ভোগ ক'রে নেওয়া যাক—এই হচ্ছে মোটা-ফি-ওয়ালা ডাক্তারদের অধিকাংশের মনের কথা। এই মনোভাবে আর কালোবাজারী ব্যবসায়ীদের মনোভাবে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কালোবাজারীরা সুড়ঙ্গপথে পণ্যদ্রব্য পাচার করে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অসঙ্গত ভাবে বৃদ্ধি করে—ক্রেতার অসহায়তার সুযোগে ক্রেতার ঘাড়ে চেপে মর্জিমাফিক দাম আদায় করে নেয়। এই সব তথাকথিত পসার-ওয়ালা ডাক্তাররাও তাই। রুগীকে যখন বাগে পাওয়া গেছে তখন তার বুকে চেপে বসে যদৃচ্ছা দক্ষিণা আদায় করে নেওয়ার সুযোগ তাঁরা ছাড়তে নারাজ। আর কার্যতঃ ছাড়েনও না। আক্ষরিক অর্থে বুকে চেপে অবশ্য সত্যি বসেন না। তবে স্টেথিস্কোপের নল বুকে লাগিয়ে বুকে চেপে বসার রূপান্তরিত সুখ অনুভব করেন। রুগীরূপী দুঃশাসনকে দুরন্ত ভাবে শাসন না করা পর্যন্ত ডাক্তারবেশী আধুনিক ভীমসেনের স্বস্তি নেই। স্টেথিস্কোপের নলটি হৃৎপিণ্ডের উপর বসানো হয় বটে, কিন্তু তার লক্ষ্য থাকে হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ লালবর্ণ তরল পদার্থটির উপর। আপনি ডাক্তারের স্টেথিস্কোপকে এক ধরনের শোণিতমোক্ষণ যন্ত্রও বলতে পারেন।

সব চাইতে আশ্চর্য, রাষ্ট্রের তরফ থেকে ডাক্তারদের ফি বেঁধে দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। পসার-ওয়ালা ডাক্তাররা যে বত্রিশ টাকা কি চৌষট্টি টাকা ফি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন সেটা তাঁদের অপার করুণা—তাঁরা যে চার-চৌষট্টি দুশো ছাপ্পান্ন টাকা কি তারও বেশী প্রতি কলপিছু দাবী করেন না তাতে তাঁদের চরিত্রের সহজাত মহত্ত্বই প্রকাশ পাচ্ছে। পাঁচশো টাকা ফি হাঁকলেও তাঁদের হাঁকিয়ে দেবার কেউ নেই। রাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্তারা

এ সমস্ত অনাচারের প্রতিকার করবার প্রয়োজন বোধ করেন না; তাঁদের দৃষ্টি আরও জরুরী সব বিষয়ের উপর নিবদ্ধ।

কোন কোন রাজ্যে, যেমন পশ্চিমবঙ্গে প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান চিকিৎসক এক দেহে মিলে আছেন—এ সব জায়গায় এই অব্যবস্থার প্রতিকারের সম্ভাবনা সম্ভবতঃ আরও কম। নিজে চিকিৎসক হয়ে ডাক্তার রায় চিকিৎসকদের দণ্ডবিধান করবেন অতটা কি আশা করা যায়? (তা ছাড়া তিনি আপাততঃ ভূগর্ভস্থ রেলপথ, গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার প্রভৃতি জাতীয় জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক পরিকল্পনাসমূহের রূপদানে নিয়োজিত আছেন। এই দিকে তাঁর দৃষ্টি দেবার অবসর কোথায়?) কিন্তু এটা কি রাষ্ট্রের আবশ্যিক প্রাথমিক একটা কর্তব্য নয়? আপৎকালে, দেশে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলে, দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য পণ্যদ্রব্যের দাম বেঁধে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। দ্রব্যমূল্যকে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার সীমার মধ্যে আনবার সদুদ্দেশ্য নিয়েই এটা করা হয়ে থাকে। কিন্তু চিকিৎসার প্রয়োজনটিও তো রাষ্ট্রের অধিবাসীদের পক্ষে কম জরুরী নয়। তার দর কেন বেঁধে দেওয়া হবে না? রাষ্ট্রের তরফ থেকে এমন ব্যবস্থা কেন করা হবে না যাতে চিকিৎসক তাঁর শ্রমমূল্যকে একটা যুক্তিযুক্ত সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে আইনতঃ বাধ্য হন? ক্রেতার সুবিধার্থে ধান কিংবা পাটের সর্বোচ্চ দর বেঁধে দিতে যদি আপত্তি না থাকে, তবে রুগীর সুবিধার্থে ডাক্তারের দক্ষিণাকেও কেন কড়া হতে নিয়ন্ত্রণ করা হবে না?

আসল কথা, গরীবের মা-বাপ নেই; অসহায়-দুর্বল মানুষের নির্ভর করার মত উপরের দিকে কোন অবলম্বন নেই। যে যেমন ভাবে পারে তাকে শুষে নিচ্ছে। পীড়ণকারী ও শোষণকারীদের পীড়ন-শোষণের ক্ষেত্র আলাদা। কিন্তু তাদের সকলেরই লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ দুর্বলকে হাতের মুঠোয় পেলেই তার হাতে-মাথা কেটে নাও। কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করা চলবে না। সহানুভূতি প্রদর্শনের অর্থ হৃদয়দৌর্বল্য প্রদর্শন করা। সবই নীরন্ধ্র টাকা আনা পাই-এর হিসাব দ্বারা ব্যবস্থিত হওয়া উচিত। কারণ? কারণ বিসনেস ইজ বিসনেস। দুর্বলকে পীড়নের ব্যাপারে বলদর্পী সকল রথী-মহারথীই একজোট।

এ থেকে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, সমাজের উপরতলার প্রত্যেকটি লোক এক একটা রক্তখেকো জীব। আমি আগেও বলেছি,

পুনরায় বলছি, সামাজিক সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে যে যত বেশী উপরের কোঠায় ওঠে তার অপরাধের মাত্রা তত বেশী। প্রতিষ্ঠাবানদের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ এ কথা বলছি না, বর্তমান সমাজব্যবস্থার একটা নির্মম সত্য হিসাবেই কথাটা এখানে লিপিবদ্ধ করছি। মোটা ফিয়ের পসারী পসার-ওয়ালা ডাক্তার আর চোরাকারবারী—এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু পেশায়, নেশায় নয়; নেশাটা উভয়েরই এক—যে কোন সূত্রে যে কোন উপায়ে মুনাফা পকেটস্থ করা। ডাক্তারের আবার মুনাফা কি রকম? —মুনাফা নয় তো কী? এখানে পুঁজি হল নিশ্চিত অথবা অনিশ্চিত বিদ্যা, দৈবাধীন হাত-যশ, সুবিধাভোগী শ্রেণীর সমর্থনপুষ্ট বড়লোকী চাল—কিন্তু পুঁজির এটা হল বহিরঙ্গ। ডাক্তারের মোক্ষম পুঁজি হল রোগের ব্যাপ্তি, প্রাবল্য এবং—রুগীর দুর্গতি। রুগী যত বেশী কাহিল হয় ততই তাকে চেপে ধরবার সুবিধা হয়। সেই একই কালোবাজারী টেকনিক। অর্থাৎ কায়দায় পেয়ে অপরকে বে-কায়দা করবার চক্ষুলজ্জাহীন প্রক্রিয়া।

বলা দরকার, এখানে ব্যক্তিগত ভাবে কোন চিকিৎসকের উপর কটাক্ষ করে কিছু বলা হচ্ছে না। এটা ব্যক্তিগত অপরাধ-অনপরাধের প্রশ্ন নয়। এটা সামাজিক ব্যবস্থার কথা; একটা নির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থায় যে নির্দিষ্ট রীতিপদ্ধতি গড়ে ওঠে তার কথা। মানুষ ব্যবস্থার দাস। একমাত্র অতিপ্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ বাদ দিলে সকল শ্রেণীর মানুষই কোন না কোন আকারে প্রচলিত ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সদিচ্ছা বিশেষ কার্যকরী হয় না। ডাক্তারের বেলায়ও একই নিয়ম। মোটা ফিয়ের লোভ সকল প্রকার লোভের মত প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার চেহারার একটা দিক; কাজেই সংক্রামক, কাজেই তার রূপ ব্যক্তিগত না হয়ে সমষ্টিগত। এতে ব্যক্তিগত ভাবে বিশেষ ডাক্তারের কোন হাত নেই। সুতরাং অনুরোধ, ডাক্তার শ্রেণী আমার সমালোচনায় ক্ষুণ্ণ হয়ে আমার সঙ্গে যেন নন-কো-অপারেশন না করেন। তাঁদের কথা দিচ্ছি, খাই বা না খাই, পরবার কাপড় জুটুক বা না জুটুক, মাথার উপর আচ্ছাদন থাকুক বা না থাকুক, তাঁদের ফিয়ের কড়ি নিশ্চিত গুনব। পরপারে যাবার ট্যাক্স না দিয়ে সরে পড়ব এমন অকৃতজ্ঞ বান্দা আমি নই।

॥ ১৪ ॥

কিছুদিন যাবৎ বাঙলার ছাত্রসমাজের বিরুদ্ধে ঘন ঘন এই অভিযোগ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যে, বাঙলার ছাত্রসমাজ দিন-কে-দিন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে ; অধ্যাপক, শিক্ষক, অভিভাবক এবং অন্যান্য কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি তাঁদের ভক্তিভাব পূর্বের ন্যায় আর অটুট নেই ; বরং অথরিটির প্রতি কারণে-অকারণে একটা চ্যালেঞ্জের মনোভাব তাদের ভিতর ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়ে উঠছে।

আপাত-বিচারে অভিযোগটিকে সত্য বলেই মনে হবে। ছাত্রসমাজের মধ্যে যে একটা অস্থিরতার ভাব দেখা দিয়েছে তা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু কেন এই অস্থিরতা ? কেন অথরিটির বিরুদ্ধে ছাত্রদের এই অসহিষ্ণুতা ?

অভিযোগ যাঁরা করছেন তাঁরা অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তি, কিতাবী ভাষায় যাঁদের বলা হয় প্রবীণ। তরুণ-বয়সের স্বাভাবিক অসংযম, উত্তেজনা, ঔদ্ধত্য এবং তজ্জাত ভুলভ্রান্তির স্তর অতিক্রম করে এঁরা এক্ষণে অনিষ্ট-সম্ভাবনাহীন নিষ্ক্রিয় প্রৌঢ়ত্বের চূড়ায় সমাসীন। চূড়ায় বসে তলার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকানোর লোভ সংবরণ করা একটু কঠিন। বিশেষতঃ দৃষ্টির পাত্রটি যদি হয় ছাত্রসমাজ, তা হলে প্রবীণদের চুলবুলিয়ে-ওঠা উপদেশ দেবার প্রবৃত্তি ও ভর্ৎসনা-প্রবণতা রোধ করে কার সাধ্য। মানুষের স্বভাবই এই যে, যে বয়স সে পেরিয়ে গেছে সে বয়সটার প্রতি সে আর সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাতে পারে না। বিশেষ করে অতিক্রান্ত যৌবনের প্রতি সকল বয়সী এবং সকল শ্রেণীর প্রৌঢ়দেরই কেমন যেন একটা ঈর্ষামিশ্রিত ভাব থাকে। আর এই ঈর্ষা ও অসহিষ্ণুতা থেকেই আসে নিষ্করুণ সমালোচনার প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তিটি কার্যকারণ যোগসূত্র দ্বারা গ্রথিত নয় ; তার হেতু নিতান্ত মনস্তাত্ত্বিক। মনস্তত্ত্বের ভাষায় একে এক ধরনের স্যাডিজ্‌ম্ বা পীড়নস্পৃহা বলতে পারেন। কারণ যাই হোক, ছাত্রসমাজের আচরণ ছাত্রসমাজের স্তরে নেমে এসে বোঝবার চেষ্টা করা উচিত। প্রৌঢ়ত্বের কালটা শুনেছি জ্ঞানগর্ভতার কাল,

বহুদর্শিতার দ্বারা তা বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ—কিন্তু এই জ্ঞানগর্ভতা ও বহুদর্শিতা যতই মূল্যবান হোক, ছাত্রদের আচরণ-বিচারের তা নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড কি না সে প্রশ্ন করা চলে। ছাত্রসমাজের এটা করা উচিত নয়, এটা করা উচিত—বলা বড় সহজ। চুটিয়ে ভোগসুখ করে তারপর অন্যকে নিবৃত্তিমার্গ অনুসরণ করার পরামর্শ কে না দিতে পারে?—জ্ঞানীরা তাই দিয়ে থাকেন, এবং বোকারা জ্ঞানীদের সেই পরামর্শমত কাজ করতে গিয়ে ভোগের সুখও হারায়, নিবৃত্তি-সুখ ভোগ করাও তাদের দ্বারা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অবদমিত ইচ্ছার পীড়ণে তাদের সংযমপ্রয়াস প্রায়শঃ বিকৃত ও হাস্যকর হয়ে ওঠে। লাভের মধ্যে, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের দল প্রথম বয়সের ভোগসুখটুকু অন্যকে ফাঁকি দিয়ে একলাই নিজেরা ভোগ করেন।

এ-ও অনেকটা সেই রকম। ছাত্রবয়সে নিজেরা ছাত্রবয়সোচিত আচরণই করে এসেছেন, কিন্তু এখন প্রৌঢ়ত্বের নিরাপদ কোঠায় এসে ছাত্রদের তাদের স্বভাবধর্ম অনুসরণ করতে দিতে প্রচণ্ড আপত্তি। তরুণ সমাজের আচরণে যদি খানিকটা চঞ্চলতা ও অস্থিরতার ভাব থাকেই, তাকে বয়সোচিত চাপল্য বলে উড়িয়ে দেবার মত ঔদার্য প্রৌঢ়-নামধেয় হঠাৎ-বিজ্ঞ স্বয়ং-নিযুক্ত অভিভাবকদের কেন থাকবে না? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ভোগের মধ্য দিয়েই ত্যাগের পথ। তেমনি জ্ঞানের তীরে উত্তীর্ণ হতে হলে প্রথমে অজ্ঞানতার সমুদ্রে খাবি খাওয়াই নিয়ম। অনেক ভুলভ্রান্তির খানাখন্দ হোঁচট খেয়ে পেরোতে না পারলে প্রবীণতার রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। তা-ই যদি হয়, তবে ছাত্রদের ছাত্রধর্ম পরিহার করে বিজ্ঞ সাজতে বলার কী অর্থ? এককালীন ভোগী এবং সম্প্রতি ভোগে ক্লান্ত ত্যাগী সাধকেরা যেমন ঈর্ষাবশতঃ অন্যকে ভোগতৃষ্ণার সুযোগ না দিয়ে সকলকেই রাতারাতি ত্যাগের ক্যাম্পে ভর্তী করাতে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন; তথাকথিত জ্ঞানীদেরও স্বভাব, তাঁরা অন্যকে অজ্ঞানতার সুযোগ না দিয়ে গোড়া থেকেই সকলকে পক্কপ্রবীণ করবার সাধনায় লেগে যান। ফল পাকবার আগে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফলের কাঁচা থাকাটাই নিয়ম। কিন্তু প্রবীণের দল কাঁচা-বয়সীদের কাঁচা থাকবার সুযোগ আদৌ দিতে রাজী নন। ধোঁয়ার কড়া আঁচে কৃত্রিম উপায়ে কাঁচা ফল পাকাবার মত প্রবীণেরা উপদেশের কড়া আঁচে তরুণদের রাতারাতি পাকিয়ে তোলার নীতিতেই সমধিক বিশ্বাসবান বলে মনে হয়। উপদেশের

সঙ্গে ধোঁয়ার তুলনাটা নিতান্ত আকস্মিক, কিন্তু বড়ই লাগসই। উপদেশ ধোঁয়া নয় তো কী? প্রবীণদের উপদেশমালা, সদ্ভাবশতক, সুভাষিতাবলী প্রভৃতি আর কী উপাদানে গড়া জানি না, তবে সেগুলি নীরন্ধ্র কুয়াসায় ঠাসা, এটা অতি প্রত্যক্ষ।

দয়া করে আমাকে কেউ ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি ঠাওরাবেন না। ছাত্রসমাজের হয়ে এখানে ওকালতি করছি বটে, কিন্তু বয়সটা আমার ছাত্রের নয়, উকিলের। অর্থাৎ অভিভাবকদেরই আমি একজন। কিন্তু নিজে অভিভাবক হলেও ছাত্রদের উপর অভিভাবক শ্রেণীর এই কারণে-অকারণে তম্বি আমার সহ্য হয় না। ছাত্রদের মধ্যে পূর্বে যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না হঠাৎ কেন সেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল, এর জন্য ছাত্রসমাজ সম্পূর্ণ দায়ী, না, তার পশ্চাতে আর কোন গূঢ় কারণ নিহিত রয়েছে—এগুলি সহানুভূতির সহিত ধীরভাবে বিচার করে তবে ছাত্রদের আচরণ সংশোধন করতে বলা উচিত। তা তো নয়, অভিভাবকত্বের সূত্রে কেবল অভিভাবিতের উপর খবরদারী আর চোখ-রাঙানি। এই মনোভাব নিয়ে ছাত্রদের হিত করতে গেলে হিতের চাইতে অহিতের সম্ভাবনাই যে বেশী তা কি প্রবীণ অভিভাবকেরা আজও বুঝবেন না?

কলকাতার ছাত্রসমাজের কথাই ধরা যাক। এই-যে স্কুলে-কলেজে ঘন-ঘন স্ট্রাইক হচ্ছে, রাজনৈতিক জটলা হচ্ছে, যে-কোন তুচ্ছ দাবীদাওয়ার সূত্রে গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলা হচ্ছে—এগুলি সমর্থনযোগ্য নয়, সত্য কথা। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে হঠাৎ কেন এই অত্যুগ্র সংযমবন্ধনহীনতার প্রবৃত্তি মাথা চড়া দিয়ে উঠেছে সেইটে ভেবে দেখা দরকার। অথরিটির প্রতি চ্যালেঞ্জের মনোভাব মানুষের মধ্যে তখনই জাগ্রত হয় যখন সে দেখে অথরিটি আর তার মনে শ্রদ্ধাবোধ উদ্রেক করতে পারছে না। কর্তৃপক্ষের ত্রুটিবিচ্যুতিই কর্তৃত্বাধীনকে বিমুখ করে তোলে। বিমুখতা যতদিন মৃদু থাকে ততদিন চাপা থাকে; তারপর অসন্তোষ ধূমায়িত হতে হতে একদিন তা বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়ে।

কলকাতার ছাত্রসমাজেরও হয়েছে তাই। তারা যখন দেখে যে স্কুল-কলেজগুলি বিদ্যাদানের নামে কতকগুলি পাইকারী-হারে-বিদ্যা-খয়রাত-করা দোকান মাত্র, তখন তথাকথিত বিদ্যাদাতাদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়। বিদ্যামন্দির তো নয় হট্টমন্দির। শিফটে-শিফটে সেখানে

বিশ্বায়সায়নের গামলা থেকে থাবলা থাবলা বিদ্যা তোলা হচ্ছে আর ছাত্রদের বিলোনো হচ্ছে। এ যেন পুণ্যলোভাতুরদের চরণামৃত বিতরণের বারোয়ারি ব্যবস্থা। শিক্ষকের সহিত শিক্ষার্থীর মধুর ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই, ছাত্রদের সমস্যা ছাত্রদের দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝবার চেষ্টা নেই; কেবল কী করে আরও বেশী ছাত্র জুটিয়ে আরও বেশী টাকা কুড়ানো যায় তার নিত্য নূতন ফন্দী উদ্ভাবনের চেষ্টা। অধ্যাপকেরা এই অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু বলেন না, তাঁরা মাসান্তে বাঁধা মাইনের টাকা পেলেই খুশী। গোটা মাস হয় ছাত্রদের পরীক্ষা-বৈতরণী পার হবার সুবিধার্থে 'নোট ডিক্টেট' করেন, নয় তো দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বক্তিমে করেন। আর নয় তো এ দুটির কোনটাই করেন না—যে-কোন অজুহাতে ক্লাশ ফাঁকি দেবার তাল খোঁজেন। এই যেখানে অবস্থা সেস্থলে শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের পূর্বের ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি নেই বলে হা-হুতাশ করা চলতে পারে, কিন্তু হা-হুতাশ করলেই কি আর পূর্বাবস্থা ফিরে আসা সম্ভব? গায়ের জোরে আর কিছু আদায় করা যায় কি না বলতে পারব না, তবে শ্রদ্ধাভক্তি আদায় করা যায় না সুনিশ্চিত।

আর এই শিক্ষাব্যবস্থার ঘাড়ের উপর চেপে বসে আছে যে প্রতিষ্ঠানটি তার তো গুণের সীমাপরিসীমা নেই। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছি। বিশ্ববিদ্যালয় নয় তো চিরস্তন ভোগদখলের স্বত্ববিশিষ্ট জমিদারী —কলকাতার দু একটি প্রতিপত্তিশালী পরিবারের যৌথ মালিকানাভুক্ত তালুক। একটি মাত্র জোর এই এলাকায় খাটে—মামার জোর। 'মামার জোর' কথাটা কে প্রথম বের করেছিল জানি না, কিন্তু দেখছি ভদ্রলোকের দিব্যদৃষ্টি ছিল। কয়েক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরকার অবস্থা সম্পর্কে যে সমস্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল তা এই প্রসঙ্গে সকলকে স্মরণ করতে বলি। এর পর আপনি কী করবেন?—ছাত্রদের উপর দোষ চাপাবেন? না, ছাত্রদের যাঁরা মুরুব্বি তাঁদের দোষী করবেন? ছাত্ররা যত দোষই করুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে দু'একজন কেলেঙ্কারীর যে নমুনা দেখালেন তার পাশে ছাত্রদের আচরণ অতি তুচ্ছ। ছাত্ররা অতদূর নির্লজ্জ হতে পারত না, এ কথা জোর করে বলা যায়।

ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযমের বিরুদ্ধে বড় গলায় চীৎকার করা

হয়, কিন্তু যাঁরা চীৎকার করেন তাঁরা নিজেদের দিকে একবারটি তাকিয়ে দেখেন না। ছাত্রদের উপর কর্তাগিরির সুযোগে যা ইচ্ছা করব আবার একই কালে ছাত্রদের কাছ থেকে পরিপূর্ণ আনুগত্য দাবী করব, পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা আশা করব—এ হয় না, হতে পারে না। সুতরাং ছাত্রসমস্যা সম্পর্কে আত্মানুসন্ধান করতে হয় তো সর্বাগ্রে শিক্ষাব্রতী ও অভিভাবকদেরই তা করা উচিত।

॥ ১৫ ॥

হিন্দু কোড বিল আইনরূপে গৃহীত হয়েছে। এটি ন্যায় ও প্রগতিশীলতারই জয় সূচনা করে। কিন্তু এই নিয়ে ভারতীয় পার্লামেন্টে যে আলোচনা হয় সেই আলোচনায় পরিষদ সদস্যদের একাংশের এবং তার মধ্যে দিয়ে দেশবাসীর একাংশের যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তা স্বাধীন ভারতের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রকেই চিন্তান্বিত করে তুলবে। হিন্দু কোড বিল হিন্দু আইনের যুগোপযোগী সংস্কারমূলক একটি নিরীহ প্রস্তাব। প্রস্তাবটি আদৌ বিপ্লবগন্ধী নয়। অথচ অনিষ্টসম্ভাবনাহীন এই সুসঙ্গত সংস্কার-প্রয়াসের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী কী তুমুল সোরগোলই না পাকিয়ে তোলা হয়েছিল। যেন হিন্দু কোড বিল আইনে বিধিবদ্ধ হলে হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সমাজ রসাতলে যাবে।

সমাজ, ধর্ম রক্ষা করবার জন্য আমাদের কতই না ব্যকুলতা! জাল-জুয়াচুরি, মিথ্যাচার, চোরাকারবার, মজুদদারী করতে একটুও বাধে না, এদিকে সমাজ রক্ষার জন্য, ধর্ম রক্ষার জন্য, চোখের নিদ্রা, মুখের আহার স্খলিত হবার উপক্রম। হিন্দু সমাজের স্বয়ংনির্বাচিত তথাকথিত মোড়লদের কপটাচারের তুলনা সত্যই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর!

হিন্দু কোড বিলে যে সমস্ত মৃদু প্রস্তাব সন্নিবেশ করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিধান হল—পুত্রের সহিতে কন্যাকেও পিতৃ-সম্পত্তির অংশ দানের প্রস্তাব, সঙ্গে সঙ্গে চুক্তিসিদ্ধ বিবাহরীতি বা সিভিল ম্যারেজকে ধর্মীয় বিবাহরীতির (স্যাক্রামেন্টাল ম্যারেজ) দ্বারা বিধিবদ্ধকরণ

এবং দ্বিতীয়োক্ত ধারার সূত্রে ক্ষেত্রবিশেষে হিন্দু-নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকার।

সম্যক্‌দর্শী ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন যে, উল্লিখিত ত্রিবিধ প্রস্তাব কোনটিই অসঙ্গত বা অযৌক্তিক নয়। এ জাতীয় প্রস্তাব আরও অনেক আগেই হিন্দু সমাজের রীতিপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণকারী সংহিতায় সংগ্রথিত হওয়া উচিত ছিল; হয় নি তার কারণ দেশের স্বীকৃত নায়কদের মনোযোগ রাষ্ট্রিক আন্দোলন-আলোড়নের দিকেই এযাবৎ মুখ্যত: নিবদ্ধ ছিল; সামাজিক কানুন সংশোধন ও বিন্যাস করবার সময় বা সুযোগ এতকাল তাঁরা পান নি। আজ সে সময় এসেছে, কাজেই দেশের প্রগতিশীল হিন্দু নেতারা হিন্দু সংহিতার অন্তর্নিহিত কয়েকটি মূলগত ত্রুটি দূরীকরণে অগ্রণী হয়েছেন। বিলটি পাশ হওয়ায় একটি দীর্ঘকালের অত্যাবশ্যক ব্যবস্থা আইনে গ্রথিত হল মাত্র। তার বেশী কিছু নয়।

তবু বিলটির বিরুদ্ধে হাঁকডাক চেঁচামেচির অন্ত ছিল না। আর সব চাইতে আশ্চর্য, কংগ্রেসেরই একাংশ এর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিলেন এবং যা সর্বক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যাঁদের কল্যাণমানসে এই বিল, অথবা কথাটা ঘুরিয়ে বললে, বিলটি পাশ হলে যাঁদের সব চাইতে উপকৃত হবার সম্ভাবনা, সেই নারী সমাজের একাংশ বিলের বিরুদ্ধাচরণে সক্রিয়ভাবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পার্লামেণ্ট ভবনের সম্মুখে হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় তাতে নারী জনতা একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল। বিক্ষোভকারিণীদের সংযত করবার জন্য শেষ পর্যন্ত পার্লামেণ্ট গৃহের অভ্যন্তরে নারী-পুলিস মোতায়েন করতে হয়েছিল।

ঘটনাটি অত্যন্ত পরিতাপের, কিন্তু রূঢ় সত্য। খতিয়ে দেখলে, এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আমাদের সমাজে নারী পুরুষের নিতান্ত বশংবদ হাতে-ধরা জীব। পুরুষ নারীকে দিয়ে যা বলাবে, করাবে, নারী তা-ই বলবে, করবে। যে সমস্ত মেয়েকে রুজ লিপ্‌ষ্টিক মেখে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে শহরের পথে-ঘাটে লীলায়িত ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় তাঁদের সকলেই যে আধুনিক শিক্ষা ও রুচিসম্পন্না প্রগতিশীলা মহিলা এরূপ মনে করা ভুল। বরং অনুসন্ধানে জানা যাবে, এঁদের অধিকাংশ পিতা কিংবা স্বামীর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীলা আপাত-রমণীয়া কতকগুলি ভিতর-ফোঁপরা জীব মাত্র। 'নির্ভরশীলা', কারণ এঁদের বিলাস-

বিভ্রমের উপকরণ যা দিয়ে সংগৃহীত হয়ে থাকে সেই অতি-আকাঙ্ক্ষিত রজতখণ্ড এঁদের হাতে নেই, সেটি পিতা কিংবা স্বামীর মনি-ব্যাগে এবং ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সে সুরক্ষিত। সুতরাং পিতা বা স্বামীর নির্দেশ অমান্য করবার মত মনোবল এঁদের প্রায়শঃ থাকে না এবং কার্যতঃ পুরুষ অভিভাবকদের অভিরুচি অনুযায়ী চলতেই এঁরা সমধিক ভালবাসেন।

হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধবাদিনীদের মধ্যে এই ধরনের নকল-আধুনিকার সংখ্যাই ছিল বেশী। বড় বড় ব্যারিস্টার, সরকারী আমলা, শিল্পপতির তথাকথিত আলোকপ্রাপ্তা পত্নীরা যে বিলটি নাকচ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন তারও কারণ ঠিক একই ব্যাখ্যার মধ্যে নিহিত রয়েছে। কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি পুরুষ-গোষ্ঠীর মনভুলানো কথায় বিভ্রান্ত এবং তোষামোদে আত্মবিস্মৃত হয়ে নারী নিজেই তাঁর স্বার্থ সব চাইতে সক্রিয়-ভাবে খণ্ডন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এই রকমই হয়ে থাকে। রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার যখন সার্ফদের দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্তিদানের প্রস্তাব করেন, তখন সার্ফরাই সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল সব চেয়ে বেশী। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত দাস-মনোভাব সার্ফদের চিত্তবৃত্তিকে এমনভাবে বিকল করে দিয়েছিল যে মুক্তির সম্ভাবনা সুনিশ্চিত ও আসন্ন জেনেও তারা সেই মুক্তির স্বাদ গ্রহণে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করে নি। আমাদের নারী সমাজেরও হয়েছে তা-ই। কিসে তাঁদের ভাল, কিসে মন্দ সেটা পর্যন্ত তাঁরা ঠাহর করতে পারছেন না। এই জন্যে তাঁদের অশিক্ষা অজ্ঞতা আংশিক দায়ী, তার উপর আছে পুরুষের দেবী-মাহাত্ম্য কীর্তনের মাদকতাময় প্রভাব। এই প্রভাবচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে হিন্দু তথা ভারতীয় নারীর মুক্তি নেই।

নারী কর্তৃক নারীর স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণেও আমরা ততটা আশ্চর্য হই নি যতটা আশ্চর্য হয়েছিলাম তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধে যুক্তিজাল বিস্তার করতে দেখে। কংগ্রেস একটি প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান বলেই এতাবৎ সাধারণের ধারণা ছিল, কিন্তু যে হারে তাতে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীলতার বেনোজল ঢুকছে তাতে অচিরেই প্রতিষ্ঠানটি কলুষিত এবং সেই কারণে প্রগতিশীল মানুষের অস্পৃশ্য হয়ে উঠবে বলে শঙ্কা হয়।

কংগ্রেস সভাপতির অভিমত এই যে, ধর্মীয় বিবাহ-রীতি চুক্তিসিদ্ধ

বিবাহ-রীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু হিন্দু সমাজের ঐতিহ্য ও আদর্শ ধর্মীয় বিবাহ-রীতিকেই সমর্থন করে, চুক্তিসিদ্ধ বিবাহ-রীতিকে নয়। দ্বিতীয়তঃ, নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকৃত হলে হিন্দু সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে। এবং তৃতীয়তঃ, সিভিল ম্যারেজ স্বীকার করলে প্রেমজ বিবাহের অধিকারকেও স্বীকার করতে হয়, যা তাঁর মতে অন্যায্য। ডাঃ সীতারামিয়ার ধারণা, প্রেমজ বিবাহ কখনও সুখের হয় না, পক্ষান্তরে অভিভাবক-নিষ্পন্ন বিবাহ শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে সুখের হয়ে থাকে।

ডাঃ সীতারামিয়ার প্রথম আপত্তির জবাব এই যে, এটা সংস্কার-প্রীতির কথা, যুক্তির কথা নয়। হিন্দু সামাজিক অনুশাসনে এককালে একটা বিধান গ্রথিত ছিল বলেই তার আর নড়চড় হতে পারবে না এটা কোন কাজের কথা নয়। ঐতিহাসিক কারণের চাপে এবং যুগধর্ম প্রভাবাৎ ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে হিন্দু সমাজের রীতিনীতির পরিবর্তন হয়েছে তার বহু প্রমাণ আছে।

দ্বিতীয় আপত্তির জবাব, হিন্দু-নারীকে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দানের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অভিনব এমন কথা বলা চলে না। বস্তুতঃ, এমন যে রক্তচক্ষু মনু তিনিও তাঁর সংহিতায় ক্ষেত্রবিশেষে নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকার করেছেন। পুরুষ-শাসিত হিন্দু সমাজে নারীর উপর পুরুষের অত্যাচার-লাঞ্ছনার সীমা-পরিসীমা নেই। নারী সে-সব অত্যাচার অসহায় নিরুপায় হতাশায় মুখ বুজে সহ্য করে। 'হাসি মুখে' বলতে পারলে খুশী হতুম, কিন্তু সমাজের প্রকৃত অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। নারীর চোখের জল সহজে নামে, তাই নারীর চোখের জলের মূল্য সহজে আমরা দিতে চাই না। স্বামীর অত্যাচারপ্রপীড়িতা আর স্বামী-সোহাগ-বঞ্চিতা নারীর চোখের জলে মেশানো বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস কত সহস্র সহস্র হিন্দু পরিবারের আনাচে-কানাচে ঘন বাষ্প হয়ে জমে আছে কে তার হিসাব রাখে, কে তার খোঁজ করে ?

'ডিভোর্স' বা বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার নারীকে পুরুষের অসহনীয় অত্যাচার থেকে মুক্তি দানের সামান্য একটি সুযোগ মাত্র। সমস্ত সভ্য দেশে এই সুযোগ স্বীকৃত, আমাদের দেশেও স্বীকৃত না হবার কারণ দেখা যায় না। আশার কথা, সম্প্রতি এই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। নারীর প্রতি এই ন্যূনতম সুবিচার বিহিত হওয়ায় হিন্দু সমাজের সুনাম বাড়বে বই কমবে না।

প্রেমজ বিবাহ সুখের হয় না—এটা একটা ধরতাই বুলি মাত্র। লোকের মুখে মুখে কথাটা প্রায়ই ফিরতে দেখি, আর বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিই। যদি বলি আমাদের দেশের মেয়েরা দাম্পত্য-প্রেম কাকে বলে জানেই না, দাম্পত্য-প্রেমের একটা প্রচলিত ধারণার দ্বারা তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চালিত হয়, তা হলে কথাটা কেমন শোনায়? কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এইটেই সত্য কথা। অভিভাবকদের দ্বারা নিষ্পন্ন বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম হয় সেটা প্রেমের একটা সংস্কার মাত্র, তাকে ঠাটও বলা যায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যকারের ভালবাসা শুধু প্রেমজ বিবাহেই সম্ভব।

যে দাম্পত্য প্রেমের মহিমা কীর্তনে ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া গদগদ হয়েছেন সেটা আসলে কী জাতীয় প্রেমের আদর্শ? —'স্বামী' নামক আইডিয়ার চরণতলে নারীর স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছু বিনিঃশেষে সঁপে দেওয়ার আদর্শ; স্বামী লম্পট, ব্যভিচারী, বেশ্যাসক্ত জেনেও তাকে মাথায় তুলে রাখার আদর্শ; স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ভরণপোষণের দাম সতীত্ব দিয়ে চুকানোর আদর্শ; স্বামীর দেওয়া শাড়ী-গয়নার বিনিময়ে চিরজীবনের তরে স্বামীর সেবাদাসী হয়ে থাকার আদর্শ; স্বামীকে বারংবার পিতৃত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দায় স্বীকারের আদর্শ; রন্ধনশালা সহ শতসহস্র বিধিনিষেধের নিগড়ে চিরবন্দিনী হয়ে থাকার আদর্শ।

এই কি সুস্থ আদর্শ? দাম্পত্য প্রেমের ধারণা আমাদের দেশে কখনও কি এর চাইতে উচ্চে উঠবে না? সেই যে জনৈক খ্যাতনামা আধুনিক লেখক লিখেছেন, আমাদের দেশে ছেলেতে-মেয়েতে বিয়ে হয় না, বিয়ে হয় দুই পরিবারের মধ্যে—অভিভাবক-নিষ্পন্ন বিবাহ সম্পর্কে এইটেই হচ্ছে মোক্ষম কথা।

॥ ১৬ ॥

এবার আমি অনধিকার চর্চা করব। রাজ্যসুদ্ধ লোক যার যা কাজ নয় তাই করে বেড়াচ্ছে এবং তা করেও বেশ বহাল-তবিয়তে আছে। সুতরাং আমি যদি একটু অব্যাপারের ব্যাপারী হবার চেষ্টা করি সেটা এমন কিছু দোষের নয় নিশ্চয়। অন্ততঃ 'আত্মদর্শন'-এর পাঠক-পাঠিকারা উদার প্রসন্নতাবশে সে দোষ ক্ষমা করবেন, এ ভরসা আছে।

এবার বাংলা দেশে সঙ্গীতচর্চার বিষয় নিয়ে কিছু বলব। এযাবৎ আমি যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি তার সঙ্গে সঙ্গীতের যোগ অতি সামান্য। সঙ্গীত হচ্ছে সৌন্দর্য ও অনুভূতি-রাজ্যের ব্যাপার, আর আপাততঃ আমি ব্যস্ত আছি বাঙ্গালীর জীবনধারণ অর্থাৎ জীবন-মরণের সমস্যা নিয়ে। একটির সঙ্গে আরেকটির বিরোধ অতি স্পষ্ট। ফলে এবারকার আলোচ্য বিষয়টি আমার নিজের কাছেই অভিনব ঠেকছে, পাঠকদের কাছেও লাগবে তা একপ্রকার জোর করেই বলা যায়।

সঙ্গীত একটি উচ্চাঙ্গের চারুশিল্প। কথায় বলে, "গানাৎ পরতরং নহি।" কবিগুরু লিখেছেন, "মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই, গান দিয়ে তার চরণ ছুঁয়ে যাই।" এবং সঙ্গীতের মহিমা কীর্তন করে আরো অনেকে আরো অনেক কথা লিখেছেন ও বলেছেন, সে সকল কথা আপাততঃ মনে আসছে না। (আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল। এমনিতে ঝুরি ঝুরি 'কোটেশনে' মাথা ভর্তি হয়ে থাকলেও দরকার মত লাগসই কোটেশন খুঁজে পাই নে। আমার রচনার এটা একটা মস্ত দুর্বলতা। দুর্বলতা আরও এজন্যে যে, এই মহাজন-প্রদর্শিত রীতিতে আমি বিশ্বাস করি যে জায়গা মত কোটেশন ঝাড়তে না পারলে লেখা ঠিক লেখার পর্যায়ে ওঠে না। লেখার একটা প্রধান অঙ্গ হল লম্বা লম্বা কোটেশন, সেটা যদি তারকা-চিহ্নিত হয়ে 'ফুটনোট' হিসাবে ব্যবহৃত হয় তবে জিনিসটা আরো খোলতাই হয়। শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে সেই রচনা, যাতে উদ্ধৃতি অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ জায়গা জুড়ে থাকবে; লেখকের নিজস্ব বক্তব্য একেবারে না থাকলেও ক্ষতি নেই। আত্মনেপদী বিধানে পাঠকদের আস্থা কম। পরস্মৈপদী বিধানটাই হল রচনারাজ্যের মুখ্য ও মোক্ষম কথা।)

সঙ্গীত একটি উচ্চাঙ্গের কলা এবং তা সূক্ষ্ম অনুভূতিসাপেক্ষ ব্যাপার, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ দেশে সাধারণতঃ যে শ্রেণীর মানুষ সঙ্গীত চর্চা করে থাকে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা জীবন-ধারণ পদ্ধতি ও রুচি কোনটাই সঙ্গীতকলার বিশিষ্টতার সমর্থক নয়। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরী—হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের এই যে চারটি প্রধান প্রকারভেদ এগুলি আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুশ্রেণীর মানুষের মধ্যে অনুশীলিত হয়ে থাকে। এক, পরশ্রমপুষ্ট অলস জমিদার শ্রেণী; দুই, তাঁদেরই অনুগৃহীত ও পরিপোষিত অশিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত ওস্তাদ শ্রেণী। প্রথমোক্তের জীবন-ধারণ পদ্ধতি অত্যন্ত স্থূল ও প্রায়শঃ

বিলাসব্যসন দ্বারা বিকৃত; আর দ্বিতীয় বর্গের সঙ্গীত-অনুশীলনকারীরা অশিক্ষা কিংবা অর্ধশিক্ষাপ্রসূত অজ্ঞতার দ্বারা এতদূর আচ্ছন্ন যে তাঁদের নিকট সূক্ষ্ম সৌন্দর্য আশা করাই বাতুলতা। তবু মাঝে মাঝে এঁদের মুখ ও হাত থেকেও যে হঠাৎ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বেরোয় অশিক্ষিতপটুত্বই তার কারণ। বিখ্যাত সঙ্গীত-সংহিতাকার পরলোকগত পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ওস্তাদদের এই অশিক্ষিতপটুত্বের কথা বিশেষভাবে বলে গেছেন।

বাংলা দেশের অলস ধনী শ্রেণীর দ্বারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অনুশীলিত, তার চাইতেও বেশী, পরিপোষিত হওয়ার কারণ, এটাকে তাঁরা বরাবর তাঁদের বনেদিয়ানার একটা অঙ্গ মনে করে এসেছেন। এই মনোভাবের ভিতর দিল্লী আগ্রার পুরাতন বাদশাহী সংস্কারটাই প্রবল। যা এককালে ছিল বাদশাহের দরবারের প্রধান চর্চা ও মনোযোগের বিষয়, তা কিছুদিন আগে পর্যন্তও জমিদারের বৈঠকে আশ্রয়লাভ করে আত্মরক্ষার প্রাণপণ প্রয়াস করেছে। দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে এই সঙ্গীতের তেমন যোগ নেই।

আজ অবশ্য জমিদারী ব্যবস্থা বাতিল হয়েছে। তা বলে পুরাতন জমিদারী মনোভাব দূর হয় নি। অত সহজে একটা দীর্ঘস্থায়ী সংস্কারের জড় মরে না। জমিদারী মনোভাব দূর হয় নি, কাজেই পুরাতন সাঙ্গীতিক দৃষ্টিভঙ্গীরও বদল হয় নি।

স্বভাবতঃই জমিদারী আবহাওয়ায় যে সঙ্গীতের পরিপুষ্টি ও বিকাশ তা কখনও প্রগতিমুখী হতে পারে না। এর অন্তরের টান পশ্চাদ্‌গতির অভিমুখে, যেমন জমিদারী ব্যবস্থা স্বয়ং একটি পশ্চাদ্‌গতিমূলক ব্যবস্থা। তানসেন কিংবা সদারঙ্গ-অদারঙ্গের নাম উচ্চারণ মাত্র কান খামচানোর রেওয়াজ, 'ঘরানা' ওস্তাদদের ঠিকুজী-কোষ্ঠী নিয়ে মারামারি, কড়ি মধ্যম ব্যবহার না করে বেহাগ গাওয়া চলতে পারে কিনা এই নিয়ে বিসংবাদ কিংবা যত রকমের টোড়ী আছে তার প্রকার বর্ণনা, গায়কের সঙ্গে তালসঙ্গতি কালে তবলা-বাদকের অতিরিক্ত কসরৎ আর এই নিয়ে দুজনের মধ্যে তালঠোকাঠুকি, সুরের নামে আসুরিক লীলা (কলকাতার কোন এক বেনারসী মিশিরজীর গান স্মরণ করুন), চুমকি-বসানো যাত্রাগানের পোশাক পরে ওস্তাদদের আসরে অবতরণ, বাঈজীদের 'ভাঁও' সহযোগে ঠুংরী গান, সঙ্গীতের আসরে মদিরার উচ্ছ্বাস—এগুলির দ্বারা কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় এই কথাই যে, এ দেশে রাগ বা মার্গ সঙ্গীতের ধারাটা এসেছে প্রতিক্রিয়ার খাত বেয়ে। তার

মধ্যে সূক্ষ্ম রুচি বা সৌন্দর্য খুঁজতে যাওয়া বৃথা, অবশ্য মুষ্টিমেয় সংখ্যক প্রথম শ্রেণীর গায়ক-বাদকদের কথা আলাদা। অথবা এককালে তা সৌন্দর্যের আধার ছিল, অধুনা সৌন্দর্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বিকৃতির পথ ধরেছে। ধ্রুপদ গানের একটা শান্ত মহিমা আছে, খেয়াল কিংবা ঠুংরী গানের সে মহিমা নেই। অন্ততঃ আজকালকার জমিদারী পরিবেশে যে ধরনের খেয়াল ঠুংরী গাওয়া হয় তার উপর বিকৃত রুচির ছাপ অতি স্পষ্ট। ভোগবিলাসের আবহাওয়ায় সঙ্গীতও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অন্যতম স্থূল উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতায় প্রতিবৎসর কতকগুলি সঙ্গীত সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। তার কোনটা 'নিখিল-ভারত' কোনটা 'নিখিল-বঙ্গ'। এই সম্মেলনগুলি ও তাদের সঙ্গীতানুষ্ঠান বিকৃতি রুচির রূঢ় হস্তাবলেপ দ্বারা কলঙ্কিত। প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার উদ্যোক্তাদের মনোভাব দ্বারা পুরাপুরি নিয়ন্ত্রিত বলে আমার ধারণা। রুচিবান শ্রোতার সৌন্দর্যানুভূতি এই কলঙ্কিত আবহাওয়ায় পীড়িত না হয়ে পারে না। বাংলা দেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক বলতে প্রধানতঃ বাতিল জমিদার শ্রেণীকেই বোঝায়। কলকাতা শহরের তথাকথিত বনেদী ধনীকুলও রাগসঙ্গীতের প্রচণ্ড ভক্ত। কলকাতার বনেদী ধনীদের মধ্যে কারও কারও বাড়ীতে বংশানুক্রমিকভাবে ওস্তাদ পোষণের রীতি আছে। এখন অবশ্য অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতার চাপে এই নিয়মের ধারা ক্ষীণ হয়ে এসেছে, কিন্তু একেবারে লোপ পায় নি। পূর্ববঙ্গের, বিশেষ করে ঢাকা ও ময়মনসিংহের এককালীন জমিদারদের মধ্যেও ওস্তাদ পোষণের অভ্যাস বহুদিন থেকে চলিত। ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর, মুক্তাগাছা, রামগোপালপুর, ভবানীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদারদের রাগসঙ্গীতপ্রীতি সঙ্গীতমহলে সুবিদিত।

কিন্তু সে কেমন সঙ্গীত? স্পষ্ট ভাষায় মন-না-রাখা কথা যদি বলতে হয় তা হলে বলব, পুরাতনের চর্বিতচর্বণই এই জমিদার-পোষিত সঙ্গীতের মূল লক্ষ্য। যুগপ্রভাবের সঙ্গে তাল রেখে চলবার চেষ্টা নেই, নিত্য নূতন সুরভঙ্গী উদ্ভাবনের দ্বারা সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করবার প্রয়াস নেই, নেই প্রচলিত রাগরাগিণীর নূতন নূতন সম্ভাবনা আবিষ্কারের চেষ্টা; কেবল পুরাতনপ্রীতি আর পুরাতননিষ্ঠা। পৌনঃপুনিকতার বেড়াজালে আটকা পড়ে সঙ্গীত তার বিপ্লবী ঐতিহ্য, বৈপ্লবিক স্বরূপ হারিয়েছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রগতির অর্থ

গণ-মানসের সঙ্গে তার যোগ প্রতিষ্ঠা। এখনও পর্যন্ত সে যোগ অত্যন্ত সরু সুতোয় ঝুলে আছে। গণজীবনের সঙ্গে যদি সঙ্গীতের একাত্মতা স্থাপন করতে হয় তা হলে সামন্ততান্ত্রিক নাগপাশ ছেদন করে সঙ্গীতকে বৃহত্তর পটভূমিকার মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। সঙ্গীতের প্রগতি এই পথেই শুধু সম্ভব।

এ তো গেল এক দিক। অন্য দিকে আরেক ধরনের উৎপাত। 'আধুনিক গান' নামধেয় কিম্ভূত সঙ্গীতের উৎপাত। আধুনিক কেতাদুরস্ত মেয়েলি ভাবাপন্ন কতকগুলি ফচকে ছোঁড়া হল এই সঙ্গীতের প্রধান উদ্গাতা। রেডিও মহলে এঁদের গানের খুব চাহিদা, সাধারণ শ্রোতৃ মহলেও। কিন্তু এঁরা যে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন তার না আছে বৈশিষ্ট্য, না আছে সৌন্দর্য। এই গায়কদের চরিত্রের যেমন কোন মেরুদণ্ড নেই, তেমনি এঁদের গানও মেরুদণ্ডবিহীন। এক কথায় চারিত্রবর্জিত, আ-লোনা। আধুনিক বাংলা গান সুরের জগাখিচুড়ি; সঙ্গীতের আবরণে সেগুলি কবিতার সানুনাসিক আবৃত্তি মাত্র। এগুলিকে যাঁরা সঙ্গীতের আধুনিক ভঙ্গি বলে চালাতে চান তাঁরা আধুনিকতার স্বরূপ জানেন না। আধুনিকতা মানে চটুলতা নয়, হালকা-হাওয়ায়-ভেসে-চলা সস্তা ফুবফুরেপনা নয়। আধুনিকতা একটা বলিষ্ঠ মতবাদ। একটা বিশিষ্ট জীবনদর্শন। যা কিছু অশ্রদ্ধেয়, বিগত-মূল্য, অসুন্দর, তাকে সরাসরি অস্বীকার করার দুঃসাহসিক ব্রত আধুনিকতারও ব্রত। আধুনিক বাংলা গানের উপর আধুনিকতার যে ছোপ সেটা রাংতার ছোপ, রাংতার মূল্যেই তার মূল্য। আধুনিকতার এর চাইতে বিকৃতি কল্পনা করা যায় না। যাঁরা আধুনিক বাংলা গান নামধেয় সঙ্গীত ভালবাসেন বলে গর্বানুভব করেন তাঁরা তদ্দ্বারা প্রকারান্তরে স্বীয় মেরুদণ্ডহীন চরিত্রটাকেই লোকচক্ষে প্রকটিত করেন মাত্র।

॥ ১৭ ॥

কলিকাতায় প্রতি বৎসর একাধিক সঙ্গীত-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আর কয়দিন বাদে বড়দিন (বড়দিনের প্রাক্কালে লিখিত); এই সময়েই সাধারণতঃ সঙ্গীত-সম্মেলনের 'গাওনার' পর্ব সুরু হয়। তারপর কিছুকাল এর জের চলতে থাকে। প্রথমে 'নিখিল-বঙ্গ' তারপর 'নিখিল-ভারত', অথবা প্রথমে

'নিখিল-ভারত' তারপর 'নিখিল-বঙ্গ'—বড়দিনের মরসুমে কলকাতার সঙ্গীতরস-পিপাসুদের মনোযোগ এই দুইটি 'নিখিল' সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পালাক্রমে আবর্তিত হতে থাকে। আবার মধ্য-সাপ্তাহিক (মিড-উইক) আমোদের ন্যায় মাঝে মাঝে বৎসরের মধ্যভাগেও সঙ্গীত-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়। আসলে সঙ্গীত-সম্মেলনগুলি কখন হবে না হবে সেটা গৌণ বিষয়, তাদের প্রধান লক্ষ্য হল ব্যবসায়িক সিদ্ধি। সঙ্গীতের মাধ্যমে মোটা কিছু মুনাফা পকেটস্থ করা ছাড়া সঙ্গীত-সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না। অন্ততঃ তাঁদের কার্যকলাপ এ কথাই বলে। আর যেখানে মুনাফা নিয়ে কথা, সেখানে শীত-গ্রীষ্ম-জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য।

যদি দেখা যেত, কলকাতা তথা বাংলা দেশের সঙ্গীতামোদী জনসাধারণকে সম্বৎসরে অন্ততঃ একবার ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের প্রখ্যাত রাগসঙ্গীত-শিল্পীদের সঙ্গীত শ্রবণের সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনগুলির আয়োজন হয়, তা হলে বলবার কিছু থাকত না। কিন্তু তা তো নয়, এ হচ্ছে বৎসরের কোন একটা সময়কে উপলক্ষ্য করে কতকগুলি জ্ঞাত-অর্ধজ্ঞাত (অনেক সময় অজ্ঞাতকুলশীল) ওস্তাদকে একত্র জমায়েত করে তাঁদের গান ও বাদনের সাহায্যে পয়সা কামাবার বারোয়ারী ব্যবস্থা। ব্যবস্থাটি ব্যবসাদারী বুদ্ধিপ্রসূত হলেও বাইরে তার শিল্পপ্রীতির বিজ্ঞাপন; সুতরাং লোকে সহজে এর স্বরূপ ধরতে পারে না।

সঙ্গীত-সম্মেলনগুলির উপর সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রভাব অতিশয় প্রবল সে কথা আগেই বলেছি। কথাটার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

আধুনিক কালে যে কোন রকমের শিল্পঘটিত অনুষ্ঠান পরিচালনার কতকগুলি স্বীকৃত রীতি আছে। সঙ্গীতানুষ্ঠানই বলুন আর নাট্যানুষ্ঠানই বলুন, আধুনিক মানুষের রুচি ও প্রয়োজনের দাবী স্বীকার না করে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে গেলে কার্যক্ষেত্রে নানারূপ অসুবিধা দেখা দিয়ে থাকে। বর্তমান যুগের শিল্প-পরিবেশকেরা এই অসুবিধাগুলি বরদাস্ত করতে রাজী নন, কাজেই তাঁরা সচরাচর আধুনিক জীবনযাত্রা পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়েই তাঁদের প্রোগ্রাম রচনা ও পরিচালনা করে থাকেন।

কিন্তু কলকাতার সঙ্গীত-সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এই নীতি মানেন বলে মনে হয় না। তাঁদের সেরা প্রোগ্রামগুলি সুরু হয় রাত একটায় আর

শেষ হয় ছটায়, কখনও তারও পরে। স্বাচ্ছন্দ্য আর আরামের প্রশ্ন ছেড়েই দিলাম, আধুনিক যুগের মানুষের সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের উপর এর চাইতে নির্মম অত্যাচার কল্পনা করা যায় না।

আজকের শহরবাসী মানুষ ঘড়ি-ধরা জীব। সকলের পক্ষে কথাটা হয়তো সমান খাটে না, কিন্তু এইটেই যে আদর্শ হওয়া উচিত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? ঘড়ির মাপে মানুষের প্রত্যেকটি কাজের মাপ নিরূপিত হলে তবেই তার জীবনে শৃঙ্খলা আশা করা যায়, নচেৎ নয়। সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ নিয়মনিষ্ঠা। নিয়মনিষ্ঠা আর সময়ানুবর্তিতা। অন্যান্য ক্ষেত্রে তো বটেই, রসোপভোগের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম মেনে চলার প্রয়োজন আছে। "সর্বম্ অত্যন্তম্ গর্হিতম্"। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে অতি উচ্চাঙ্গের রসের জিনিসও নিমতিতো হয়ে ওঠে, উঠতে বাধ্য।

সঙ্গীত-সম্মেলনের নৈশ অনুষ্ঠানগুলিই এর প্রমাণ। গোলাম আলি খাঁ সাহেব (কিংবা শ্রীমতী কেশর বাঈ কারকার) গান ধরলেন রাত তিনটেয়। রাত তিনটেয়, কেন না সেরা শিল্পীদের দিয়ে আগেভাগে গান গাইয়ে অনুষ্ঠান মাটি করা যায় না; তাই ঝড়তিপড়তিদের আগে ঠেলে দিয়ে ওস্তাদের গান শেষভাগে বিন্যস্ত করাটাই রেওয়াজ। ওস্তাদের মার শেষরাত কিনা তা-ই। ততক্ষণে কারও চোখ ঢুলছে, কারও নাক ডাকতে সুরু করেছে, কারও মন বাড়ি যাবার জন্য উসখুস করছে। কিন্তু যেহেতু গোলাম আলি খাঁ সাহেব গান ধরেছেন, সে-কারণ চোখ কান প্রাণপণ চেষ্টায় টান করে রেখে সঙ্গীতরস কর্ণকুহরে ঢালতে হবে বৈকি। নইলে যে টিকিটের পয়সাটাই মাটি! আর তা ছাড়া খাঁ সাহেবের গান শুনতে এসে খাঁ সাহেবের গানই যদি না শোনা গেল তা হলে পরদিন লোকের কাছ থেকে এই নিয়ে বাহবাই বা আদায় করা যাবে কী করে।

অবশ্য এমন অকৃত্রিম সঙ্গীতানুরাগী কেউ কেউ থাকতে পারেন, ভাল গান শোনবার জন্যে যিনি একরাত কেন দশরাত একটানা জেগে কাটাতে প্রস্তুত। কিন্তু এঁরা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। এঁদের কথা হচ্ছে না। এখানে তাঁদের কথাই বলা হচ্ছে—শ্রোতৃদলের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশী—যাঁরা সঙ্গীত ভালবাসেন কিন্তু সঙ্গীতপ্রীতির খাতিরে নিয়মের উপর অত্যাচার সইতে রাজী নন। তাঁদের জন্যে সুবিধাজনক সময়ে একটা

সুসঙ্গত পরিমাণ কাল জুড়ে—তার বেশীও নয় কমও নয়—শ্রেষ্ঠ প্রোগ্রামের কেন ব্যবস্থা হয় না সেইটাই এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য।

আসল কথা, এই জাতীয় অনুষ্ঠানগুলির যাঁরা উদ্যোক্তা ও কর্তা, তাঁরা এ কালে বাস করলেও এ কালের কেউ নন। তাঁদের মন পড়ে রয়েছে বিগত যুগে, বাতিল সমাজব্যবস্থার ততোধিক বাতিল পদ্ধতি-প্রকরণের প্রতি তাঁদের অন্তরের টান। তাই আধুনিক সঙ্গীতানুষ্ঠানেও পুরাতন বৈঠকী ব্যবস্থা—বিলাসী জমিদারের স্থূল সঙ্গীত-মজলিসের অনুকরণে রাতভোর সুরের স্রোত বওয়াবার ঢালাও আয়োজন। সুরের স্রোতের সঙ্গে সুরার স্রোতটাও কেন চলে না তাই ভেবে এক এক সময় আমার আশ্চর্য মনে হয়।

রসোপভোগের ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতা আর নিয়ম-শৃঙ্খলার উপর এই গুরুত্ব আরোপ কারও কারও চোখে একটু বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। অনেকে হয়তো এরই মধ্যে মনে মনে আমাকে বেরসিক ঠাওরে বসেছেন। আমি ধারণাটি খণ্ডন করবার চেষ্টা করব না, শুধু বলব, যত বড় উচ্চাঙ্গের শিল্পই হোক না কেন, তার পরিবেশনে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও রুটিন মেনে না চললে অচিরেই তা সৌন্দর্যভ্রষ্ট হয়ে পড়তে বাধ্য। ইউরোপীয়রা শিল্পপরিবেশনের এই আদর্শ স্বীকার করে, তাই তাদের নাট্য-সঙ্গীত-নৃত্যানুষ্ঠানগুলি এত সুন্দর। আমাদের দেশের শিল্প-পরিবেশকেরা এ সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নন বলে মনে হয়। একমাত্র শ্রীউদয়শঙ্করকে জানি, যিনি এই রীতিটিকে সজ্ঞানে অনুসরণ করবার চেষ্টা করছেন। উদয়শঙ্কর এ ক্ষেত্রে সফলকামও হয়েছেন। তাঁর নৃত্যানুষ্ঠানের প্রত্যেকটি অংশ মাপা, পূর্ব-নিরূপিত ও অপরিবর্তনীয়। তাঁর অনুষ্ঠানগুলি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন মনে হওয়ার এইটেই যে আসল কারণ তা বোধ করি সকলেই স্বীকার করবেন।

আনন্দ ও রসোপভোগের ক্ষেত্রে ছন্নছাড়া খ্যাপামি ও বাঁধভাঙা অকাজের 'কাল্ট' এ দেশে প্রবর্তন করে গেছেন যিনি, তিনি পরোক্ষে বাঙালী জাতির সমূহ ক্ষতি করে গেছেন। যদিও তাঁর নিজের জীবনটি ছিল কাজে ঠাসা। পরকে অকাজ করতে বলে, নিয়ম-শৃঙ্খলা ভাঙতে বলে নিজে আজীবন কাজ করে গেছেন, কাজের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলেছেন। অপরকে ছুটিয়ে ছুটির আনন্দ উপভোগ করতে বলে নিজে তিনি ছুটিয়ে কাজ করেছেন। যাঁর কথা বলছি তিনি আমাদের সকলের নমস্য। তাঁর নিকট বাঙালী জাতির ঋণের শেষ নেই। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ গৌরবস্থলও বটেন। তবে

যত বড় মহাপুরুষই কেউ হোন তাঁর কোন দিক নিয়েই সমালোচনার ভঙ্গিতে কিছু বলা যাবে না এমন গুরুবাদে আমাদের বিশ্বাস নেই। তবে কিনা আলোচ্য মহাজন সম্পর্কে এখনও আমরা স্পর্শালুতার মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারি নি, তাই তাঁর নামটা উহ্য রাখলাম। বুদ্ধিমান পাঠক যে নামটা ধরে ফেলতে পারবেন তা আমি দূর থেকেই অনুমান করতে পারছি। অনুচ্চারিতনাম মহাপুরুষের কাছ থেকে আমরা তাঁর ছন্নছাড়া খ্যাপামির আদর্শটা নিয়েছি, তাঁর নিয়মনিষ্ঠা নিই নি। ফল যা হবার হয়েছে—আমরা বখে গেছি।

ভিন্ন প্রসঙ্গ থাক্। আমাদের আলোচনা হচ্ছিল সঙ্গীতানুষ্ঠানগুলির প্রগতি-বিরোধী প্রবণতা নিয়ে। এর আরেকটা বড় প্রমাণ শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশের শ্রেণীরূপ। উদ্যোক্তারা টিকিটের যা হার বেঁধে দিয়েছেন তাতে একমাত্র অলস ধনী, চোরাকারবারী ব্যবসায়ী, ঠিকাদার প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষদেরই এই সঙ্গীতানুষ্ঠানগুলিতে প্রবেশলাভ সম্ভব; সাধারণ দশজনার প্রবেশ সুগম করবার কোন সুযোগই এঁরা রাখেন নি। মাদ্রাজের সঙ্গীত সম্মেলনগুলিতে সঙ্গীতপ্রিয় অথচ টিকিট-ক্রয়ে অসমর্থ সাধারণ শ্রোতাদের জন্য বাহিরে লাউড-স্পীকারের ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু পাছে দর্শনীর অঙ্কে কমতি পড়ে সেই আশঙ্কায় কলকাতায় এই ব্যবস্থা সেদিন পর্যন্ত অগ্রাহ্য ছিল। মাত্র হালে অবস্থাটির পরিবর্তন হয়েছে। লাউডস্পীকার এবং রেডিওর কল্যাণে সমাগত ওস্তাদদের কিছু কিছু গান আজকাল জনসাধারণ শোনবার সুযোগ পেয়ে থাকে। কিন্তু খোদ্ সঙ্গীতানুষ্ঠান যেখানে হয় সেখানে ইতরজনের প্রবেশ নিষেধ। সেখানে দর্শকদের সারিতে ক্রশ স্ট্রীট ও খোংরাপট্টির চোরাবাজারী ধনীদেরই একাধিপত্য। আর আসেন সপারিষদ তথাকথিত সঙ্গীতামোদী 'অ্যাবসেন্টি' জমিদারের দল। কালখোলার 'রাজা' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, অনুষ্ঠানের সমাপ্তিভাষণ দেন এ-জাতীয় আর কোন মাথামোটা ভূম্যধিকারী। বক্তৃতাদিও এঁদের শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণতঃ দিয়ে থাকেন। কখনও কখনও শিল্পপতিকে দিয়ে সঙ্গীনানুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করানো হয়। কারখানার শিল্পও শিল্প আবার সঙ্গীতশিল্পও শিল্প। সুতরাং কারখানাপতির অপেক্ষা সঙ্গীতানুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করবার যোগ্যতা অধিক আর কার আছে? অথচ শিল্প-সংস্কৃতির যাঁরা সত্যিকারের প্রতিনিধি তাঁদের এই সম্মেলনগুলিতে ডাকা হয় না। তাঁরা এখানে অবাঞ্ছিত। বাংলার

বাইরে থেকে সঙ্গীতশিল্পী যাঁরা আসেন তাঁদের কারও কারও কথা আর কী বলব। কড়া স্যুট-টাই-এর সঙ্গে মাথায় দশাসই পাগড়ী বাঁধা—এঁরা মাইকের সামনে যখন দীর্ঘগ্রীব হয়ে গান করতে থাকেন, সে এক চমৎকার দৃশ্য দেখতে হয়। কারও পোশাকের বাহার দেখলে মনে হয়, বহির্জগতের সম্পর্ক বিবর্জিত মধ্যযুগীয় কোন সামন্তরাজ্য থেকে সঙ্গীত-জগতের রিপ-ভ্যান-উইঙ্কল বুঝি সত্ত উঠে এলেন কলকাতায়। তালসঙ্গত নিয়ে তবলচীর সঙ্গে গায়কের তাল ঠোকাঠুকির কথা আগেই বলেছি। রসের ক্ষেত্রে এর চাইতে স্থূলতা কল্পনা করা যায় না। রাগরাগিণী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অলোচনার ব্যবস্থা নেই, নেই নূতন নূতন রাগিণীর সম্ভাব্যতার উপর অলোকপাতের চেষ্টা, নেই বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বক্তৃতাদি দেওয়াবার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা, নেই জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গীতপ্রচারের আয়োজন। শুধু জটলা আর জটলা। গানের জটলা আর গায়কের জটলা। থোড় বড়ি খাড়া, আর খাড়া বড়ি থোড়। মোট কথা, যেদিক থেকেই বিচার হোক না কেন, কলকাতার সঙ্গীতানুষ্ঠানগুলি আধুনিক যুগের রুচি ও আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী, এ কথা স্বীকার না করে উপায় থাকে না।

সঙ্গীতানুষ্ঠানগুলিকে যদি যুগোপযোগী করে তুলতে হয় তা হলে তাদের সময়-সীমা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, নির্মম হস্তে অধিবেশনের সময় সংক্ষেপ করতে হবে। এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার, যে ব্যবস্থায় আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ছন্দ বিপর্যস্ত হয়ে যায় আত্যন্তিক সঙ্গীতপ্রীতির খাতিরেও তা সমর্থন করা চলে না। প্রাণের প্রয়োজন আর জীবনের প্রয়োজনে সামঞ্জস্য হলে তবেই আনন্দ, নয়তো চিত্তের স্ফূর্তি পদে পদেই ম্লান হতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, উদ্যোক্তাদের মুনাফার লোভ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। এ কথা কোনক্রমেই ভুললে চলবে না যে, এ সকল সঙ্গীত-সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গীতচেতনার ব্যাপ্তি ঘটানো, জনসাধারণকে উপযুক্ত সঙ্গীত-শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। তা না করে তার বদলে ব্যক্তিগত অর্থলাভের প্রবৃত্তিটাকেই যদি বড় করে তোলা হয় এ-জাতীয় সম্মেলনের মৌলিক অভিপ্রায়কেই খর্ব করা হয়। জানি একেবারে নিস্পৃহ বৈরাগ্যের বশে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর প্রস্তাব হাস্যকর, তা বলে এ জাতীয় বারোয়ারী অনুষ্ঠানে ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে

আদর্শবাদী অভীপ্সাকে একেবারে কোণঠাসা করে রাখারও কোন অর্থ হয় না। সম্মেলন প্রভৃতি ব্যাপারে দেশের প্রয়োজনকে বরাবরই ব্যক্তিক প্রয়োজনের উপরে অগ্রপ্রাধান্য দিতে হয়। এ না হলে সম্মেলন করার সার্থকতা থাকে না। এই কথাটা যত তাড়াতাড়ি আমরা বুঝব ততই আমাদের মঙ্গল।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ ১ ॥

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব—বহু পুরাতন পুথির কথা। মানুষ অনেকে মিলে একত্র যূথবদ্ধ ভাবে বাস করতে ভালবাসে, মানুষের এই প্রবৃত্তি নাকি সনাতন। অপর পক্ষে, মানুষের একাকী, নিঃসঙ্গ বাসের ইচ্ছাটা অস্বাভাবিক ও অসামাজিক, এইরূপ শুনে আসছি। যাঁরা সাধুসন্ত মহাপুরুষ, অধ্যাত্ম-সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছেন, এবং যাঁদের মন রুগ্ন ও বিকৃত—কেবলমাত্র এই দুই বিরল শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই একা থাকতে চাওয়া স্বাভাবিক। সমাজের আর সকলে মিলেমিশে, পাশাপাশি ও ঠাসাঠাসি থাকতেই সমধিক পছন্দ করে।

হয়ত কথাটা মিথ্যে নয়। তবে সবটুকু সত্যি তাও বলতে পারি নে। কথাটাকে যদি একটা ব্যাপক সাধারণ বিবৃতি হিসাবে ধরা হয়, তা হলে তাকে মিথ্যে বলা যায় না। কিন্তু যদি তাকে সঙ্কীর্ণতর অর্থে প্রয়োগ করা হয়, বিশেষ সীমা ও কালের পরিসরের ভিতর কথাটির যাথার্থ্য পরীক্ষা করে দেখা হয়, তা হলে মানতেই হয় কথাটির মধ্যে অনেকখানি ফাঁক আছে। সেই ফাঁকটুকুর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই রচনার উদ্দেশ্য।

মানুষ সামাজিক জীব, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এই সামাজিকতা একটা একটানা ঢালা সামাজিকতা নয়, তার মধ্যে বহু স্তরভেদ আছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থার রকমটাই এমন যে সামাজিকতার প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে গিয়েও মানুষ তার স্বাতন্ত্র্য ভোলে না। মানুষ শুধু তার সঙ্গেই মেশে, মিশতে ভালবাসে, যার মানমর্যাদা ও কৌলীন্য ঠিক তার নিজের মানমর্যাদা ও কৌলীন্যের অনুরূপ। এবং যেহেতু আর্থিক সঙ্গতি কিংবা অসঙ্গতিই হচ্ছে এই মানমর্যাদার নিয়ামক, সেই হেতু বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে বিত্তপ্রতিপত্তিই হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের আসল বিধাতা। যাঁর সঙ্গে আপনার জীবনযাত্রার পদ্ধতি মেলে না, কথাবার্তার ধরনধারণ মেলে না, পোশাক-আসাক মেলে না, তাঁর সঙ্গে আপনি মিলবেন, আপনার সাধ্য কি? মানুষের সহিত আচরণে এরূপ পার্থক্য ভাল নয়—আপনি না বোঝেন এমন নয়, হয়ত প্রয়োজন হলে বুদ্ধির তূণ থেকে যুক্তির বাণ

নিক্ষেপ করে সর্বপ্রকার অসাম্যকেই আপনি ধরাশায়ী করতে পারেন। কিন্তু আপনার সংস্কার যাবে কোথা? বহুদিনের অভ্যাসই আপনাকে বলে দেবে, যাঁর সাজসজ্জা বেশভূষা ঠিক আপনার অনুরূপ নয়, যাঁর কথাবার্তায় ঠিক আপনার কিংবা আপনার মেলামেশার চৌহদ্দির অন্যান্য দশজনের কথাবার্তার সুর লাগে না, যাঁর আচরণ আপনার প্রার্থিত মার্জিত রুচির অনুরূপ নয়, তেমন ব্যক্তিকে আপনি আপনার সঙ্গ দান করে ধন্য করতে পারেন না। হয়ত মনে মনে এই ধরনের ব্যক্তিকে খানিকটা তাচ্ছিল্য করাও আপনার পক্ষে বিচিত্র নয়। এবং সব চাইতে যেটা বেদনার, আপনি সম্ভবতঃ এই জন্যে কোন মানসিক ক্লেশ বোধ করেন না।

কেন এমন হয়? হয় এইজন্যে যে, ভেদবাদী সভ্যতার সংস্কারে মানুষ আপনি, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণমুখী, সংশ্লেষণমুখী নয়। অপরের সহিত আপনার পার্থক্যটাকেই আপনি বড় করে দেখতে ভালবাসেন; অপরের সহিত আপনার যে যে বিষয়ে সাদৃশ্য সেগুলি আপনার চোখে পড়তে চায় না। মানুষে মানুষে পার্থক্যের চাইতে সাদৃশ্যই অধিক। কিন্তু এই সত্য আজও আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি। বৈচিত্র্যবাদীদের যুক্তির সূত্র অনুসরণ করে আমরা কেবলই বলে আসছি এবং বিশ্বাস করে আসছি যে, মানুষে মানুষে অজস্র পার্থক্য। আচরণে বিশ্বাসে ক্রমাগত এই ভেদ-বাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে আমাদের সামাজিকতা শুধু একটা কথার কথা হয়েই রইল, তা বাস্তব ও জীবন্ত হতে পারল না। যে সামাজিকতা নিয়ে আমাদের কারবার, যে সামাজিকতার আমরা জাঁক করি, তা নিতান্তই "স্কন্দকাটা, পোকায়-খাওয়া" সামাজিকতা; এই সামাজিকতা আজও আমাদের নিজে-হাতে-দাগানো সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করতে পারল না। যাঁদের আমরা বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, উদারচেতা বলে ভাবি তাঁরাও এই সংস্কারের দাসত্ব থেকে মুক্ত নন। মানুষ অপরকে প্রথমে তার বহিরঙ্গ দিয়ে বিচার করে। এই বহিরঙ্গের পরীক্ষায় অপরিচিত ব্যক্তিটি যদি উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হন, তবেই মাত্র তাঁর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন দেখা দেয়, তার পূর্বে নয়।

বিষয়টিকে তত্ত্বকথার পর্যায় থেকে বাস্তব দৃষ্টান্তের পর্যায়ে নিয়ে আসা যাক। এ কথা সকলেই জানেন যে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপর্যয়কারী প্রভাবের ফলে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজে প্রচণ্ড ভাঙন দেখা দিয়েছে। অনেক লোক

ঠিকাদারী, কালোবাজার ও অন্যান্য যুদ্ধসংক্রান্ত কার্যকলাপের ফলে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। আবার সেই অনুপাতে অনেক লোক বিচিত্র বিরূপ অবস্থার চাপে দারিদ্র্যের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গেছে। এই ঊর্ধ্বগতি ও অধোগতির সংঘাতের ফলে সামাজিক সম্পর্কের চেহারাও অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। যারা একলাফে সামাজিক বিন্যাসের দু'তিনটে স্তর পেরিয়ে এল, তারা এখন টাকার জোরে বুনিয়াদী বিত্তবানদের সঙ্গে দহরম-মহরম করছে। আর যে সব হতভাগ্য অবস্থার টানাপোড়েনে পা হড়কে দু'তিন ধাপ নীচে নেমে এল তারা এখন ভদ্রসমাজ থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া অধঃপতিতের দল। তাঁরা এককালে লেখাপড়া শিখেছিল সেটা আজ আর ধর্তব্য নয়, তাদের বর্তমান সঙ্গতির মাপকাঠিতেই তাদের সামাজিকতার চৌহদ্দি নির্ধারিত হচ্ছে। আমার এক বন্ধুকে জানি, যিনি যুদ্ধপূর্ব কালে শিক্ষায়, দীক্ষায়, বিত্তে, সামাজিক সম্পর্কের কৌলীন্যে অনেকেরই ঈর্ষার স্থল ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যুদ্ধ তাঁকে পথে বসিয়ে দিয়ে গেছে। আজ তিনি থাকেন কলকাতা শহরের এক অখ্যাত পল্লীর ততোধিক অখ্যাত এক বস্তিতে। বস্তিবাসীর জীবনযাত্রা থেকে তাঁর জীবনযাত্রা আজ আর পৃথক করে দেখার উপায় নেই। কিন্তু সেইটেই তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের চরম কথা নয়। তাঁর দুর্ভাগ্য আরও গভীর, আরও শোচনীয়। পুরাতন বন্ধুরা একে একে সকলেই তাঁকে বর্জন করেছে; আগে মাঝে মাঝে কথাবার্তায় তাঁর প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থাকত, এখন তিনি আলোচনার ক্ষেত্রেও অপাংক্তেয়। আরও যেটা পরিতাপের, এখন তিনি নিজেই পুরাতন বন্ধুদের পরিহার করে চলেন, পাছে তাঁর দুরবস্থা তাদের করুণামিশ্রিত সহানুভূতির উদ্রেক করে সেই আশঙ্কায় (আশঙ্কাটি অসঙ্গত নয়)। তিনি শামুকের মত নিজের খোলে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে এনেছেন।

বলতে পারেন, আপনার ভাগ্যবিড়ম্বিত বন্ধুটির হীনতাবোধ অযৌক্তিক। যেন কিছুই হয় নি এইভাবে তিনি আগের মত পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে মিশলেই তো পারেন। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা এক, বাস্তব সত্য আর। সামাজিক সম্পর্ক কদাচিৎ আমাদের বাঞ্ছিত সীমারেখা অনুসরণ করে চলে। কতদূর পর্যন্ত সে সীমারেখা প্রসারিত করবে, কোথায় গিয়ে থামবে, সে সম্পর্কে তার নিজস্ব আইনানুন আছে। আমাদের ব্যক্তিগত অভিপ্রায় সেখানে অগ্রাহ্য।

সামাজিকতার এই খেয়ালপনাকে কেউ কেউ এই যুক্তিতে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন যে, সমাজে বাস করতে হলে সুবিধার খাতিরে স্বীয় মেলামেশার গণ্ডীকে সঙ্কুচিত করে আনতে হয়ই—সকলের সঙ্গে সামাজিকতা বজায় রাখতে গেলে আর টেঁকা চলে না। সামাজিকতার দায় রক্ষা করতেই যদি প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে, তা হলে করণীয় কর্তব্য সম্পাদনের উপযোগী উদ্বৃত্ত শক্তি মানুষ কোথা থেকে পাবে ?

কথাটা মিথ্যে নয়। মানুষের সহিত সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কোথাও না কোথাও একটা সীমারেখা টানতেই হয়। কিন্তু সেইটে এক কথা আর আর্থিক সম্পদের মানদণ্ডে বন্ধুবান্ধব নির্ণয় সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। এমার্সন বন্ধুত্বকে মহৎ গুণ আখ্যা দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে অনেক কিছু লিখেছেন। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত কি আজ পর্যন্ত কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে মানুষ বন্ধুত্বের তাগিদেই শুধু বন্ধু নির্বাচন করেছে, বাইরের আর কোন ঘটনা বা বিষয় তার নির্বাচনকে প্রভাবিত করে নি ? ধনী দরিদ্রের সঙ্গে যে মেশে না এমন নয়; সময় সময় গরীব ধনীতে ঘনিষ্ঠতা হতেও দেখা যায়। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেই ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা নয়; অনুগ্রহকারী ও অনুগ্রাহকের ঘনিষ্ঠতা, চাটুকারিত ও চাটুকারের ঘনিষ্ঠতা। কথাটা রূঢ় হলেও সর্বাংশে সত্য যে, পদমর্যাদা অনুরূপ না হলে দুজনের মধ্যে বন্ধুতা হতে পারে না। একজন ধনীমূর্খের সঙ্গে একজন ধনীবিজ্ঞের বন্ধুতা হতে পারে, কিন্তু একজন ধনীবিজ্ঞের সঙ্গে একজন গরীব বিজ্ঞের বন্ধুতা সাধারণতঃ সম্ভব নয়। বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লিখিত দুই ব্যক্তির মধ্যে মেলামেশায় ও ভাববিনিময়ে কোন বাধা না থাকলেও অবস্থার তারতম্যগত এমন কতকগুলি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে যা তাদের সম্পর্ককে প্রতি পদে সঙ্কুচিত করে তুলবে। মিলতে মিশতে দুদিক থেকেই বাধোবাধো ঠেকবে, শেষে এক সময় দুজনেই হাল ছেড়ে দিয়ে আলাদা হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি, একজন গরীব-মূর্খের সঙ্গে গরীব-বিজ্ঞের আত্মীয়তা হওয়া সম্ভব, কিন্তু গরীব-মূর্খের সঙ্গে ধনী-মূর্খের ভাব-সাযুজ্য স্থাপিত হতে পারে না। মূর্খতা এই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একটি প্রতিবন্ধকের কাজ করে।

নরনারীর প্রেম নামক বস্তুটির প্রতি অনাবিল, স্বার্থলেশহীন দিব্যভাব আরোপ করে আমরা কত সুখ পাই। কিন্তু প্রেমের জহুরীও জহুর

চেনে, বিশুদ্ধ ভালবাসার দোহাই পেড়ে তাকে ভজানো শক্ত। "প্রথম দৃষ্টিতে ভালবাসা"র কত রোমাঞ্চকর গল্প আপনারা বইতে পড়েছেন, কত কাহিনী লোকমুখে শুনেছেন—কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত কি আপনারা খুব বেশী দেখাতে পারবেন যেখানে এই ভালবাসা 'অপাত্রে' অর্থাৎ ভিন্ন-কুল গোত্র, আর্থিক সঙ্গতিযুক্ত ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়েছে? ছেলেমেয়েরা "প্রথম দৃষ্টিতে ভালবাসার" ক্ষেত্রেও আঁটঘাট বেঁধেই ভালবাসে; আর আশ্চর্য, প্রায়ই তাদের হিসাবে ভুল হয় না। গোত্র মিলিয়ে, ঠিকুজী বিচার করে কেউ অবশ্য প্রেমে পড়ে না, কিন্তু জজ-সাহেবের মেয়ে গরীব কেরাণীর ছেলেকে বিয়ে করবার বায়না ধরেছে এমন দৃষ্টান্ত আপনি কটা দেখাতে পারবেন? পূর্বরাগ মানে কি? না, পূর্বাহ্নে সমস্ত লক্ষণ মিলিয়ে অনুরাগ।

সামাজিকতা সম্পর্কেও ওই একই কথা। বরং এই ক্ষেত্রে আঁটঘাট বেঁধে লক্ষণ মেলাবার প্রক্রিয়াটা আরও উৎকটভাবে চোখে পড়ে। প্রেম নামক 'দিব্যবস্তুটির' ক্ষেত্রেই যখন এত হিসাবনিকাশ, তখন সামাজিক সম্পর্কের ন্যায় একটি পার্থিব ব্যাপারে মানুষের পাটোয়ারী বুদ্ধি আরও তীক্ষ্ণ হবে তাতে আশ্চর্য কি? কিন্তু সেটাও তত আপত্তিকর নয় যত আপত্তিকর হচ্ছে মানুষের এই বিশ্বাস যে, এই ভাবে লাভ-লোকসানের খতিয়ান দ্বারাই মানুষের সামাজিক সম্পর্ক চিরকালের জন্যে নির্ণীত হবে। এর চাইতে ভ্রমাত্মক বিশ্বাস আর কিছু হতে পারে না। আমরা যে সমাজব্যবস্থার আওতায় বাস করছি তা চিরন্তন কোন ব্যবস্থা নয়, আগে হোক পরে হোক তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; তেমনি এই সমাজের কৃত্রিমসৃষ্ট ও পুষ্ট সামাজিকতার সম্পর্কও শাশ্বত কোন ব্যাপার নয়, তার প্রক্রিয়ায় অগে পরে ভাঙন ধরবেই।

বর্তমানের বিভিন্ন সামাজিক গণ্ডীগুলি নিতান্তই কৃত্রিম, খণ্ডিত কতকগুলি দ্বীপ বিশেষ। একটির সঙ্গে আরেকটির কোন যোগ নেই, সম্পর্ক নেই—মাঝে অমনোযোগ আর ঔদাসীন্যের যোজনব্যাপী ব্যবধান। ফলে একটি দ্বীপের অধিবাসীর সঙ্গে অন্য আরেকটি দ্বীপের অধিবাসীর সমগ্র জীবনেও এক সাধারণ ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াবার সময় হয় না। এদের কক্ষপথই শুধু ভিন্ন নয়, এদের সূর্যও আলাদা। আত্ম-আবর্তিত হতে হতে যে যার কক্ষপথে নিজ নিজ সমাজসূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

কৃত্রিম সামাজিকতা কৃত্রিম সমাজ-ব্যবস্থারই প্রতিফলন মাত্র। কিন্তু ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থায় সর্বপ্রকার অসাম্যই ঘুচে যাবে বলে আশা করা যায়। কাজেই কৃত্রিম বিভেদও তখন থাকবে না। মানুষে মানুষে সত্যিকার সামাজিক সম্পর্ক মাত্র তখুনি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। আর একটি কথা। দার্শনিক হবস বলেছেন, মানুষের মধ্যে সামাজিকতার প্রবৃত্তি সহজাত নয়, মানুষ স্বার্থের তাগিদেই মূলতঃ একত্রবাসের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। কথাটা অবশ্য কেউ স্বীকার করে না, কিন্তু যুক্তির দ্বারা আজও এই তত্ত্বকে খণ্ডন করা সম্ভব হয় নি। মাত্র ভবিষ্যতের সমাজেই হবসের এই তত্ত্ব নিঃশেষে ভুল প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব।

॥ ২ ॥

ক্রমক্ষয়িষ্ণু বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ আজ ক্ষয়িষ্ণুতার চরম অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তার শোচনীয় দৈন্যদশা সকলেরই করুণার উদ্রেক করছে। বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়ে ক্রমাবনতি দুই বিশ্ব-মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন বৎসরগুলিতেই সুরু হয়েছিল; কিন্তু বিগত যুদ্ধের অধ্যায়ে তা চরম আকারে আত্মপ্রকাশ করে। সেই যে বাঙালী মধ্যবিত্তের সর্বব্যাপী দুর্গতি দেখা দিয়েছে তার আর অবসান ঘটল না; বরং যুদ্ধ-পরবর্তী বৎসরগুলিতে মধ্যবিত্তের দুর্গতি আরও যেন উদগ্র হয়ে উঠেছে। এইরূপ অবস্থা যদি আরও কিছুকাল অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে, তা হলে সম্প্রদায় হিসাবে বাঙালী মধ্যবিত্তের বিলুপ্তি অবধারিত।

অথচ জ্ঞানে গুণে শিক্ষায় দীক্ষায় শিল্পে সাহিত্যে জাতীয়তার পথ প্রদর্শনে ও জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম পরিচালনে এককালে বাঙালী মধ্যবিত্ত সকলের পুরোভাগে ছিল। যেমন চিন্তায়, তেমনি কর্মে তার দানের তুলনা নেই। এ দেশের প্রতিটি বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টা, প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলন-আলোড়ন বাঙালী মধ্যবিত্তের সক্রিয় অনুপ্রাণনায় পুষ্ট ও বর্ধিত হয়েছে। কি রাজনৈতিক আন্দোলন, কি ধর্মীয় আন্দোলন, কি সমাজ-সংস্কার আন্দোলন—সর্বক্ষেত্রে বাঙালী মধ্যবিত্তই ছিল অগ্রণী। মহামান্য গোখলের বিখ্যাত উক্তি—"বাঙালী আজ যা চিন্তা করে, অবশিষ্ট ভারত কাল তা অনুসরণ করে"—বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছিল। এই

বহুল-প্রচারিত উক্তিটি এককালে আমাদের অনেক অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে; সঙ্গত আত্মপ্রসাদে ভরে দিয়েছে আমাদের মন। কিন্তু আজ এই আত্ম-শ্লাঘা স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হতে চলেছে। দেখতে দেখতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ হল এবং দেখতে দেখতে অন্যান্য প্রদেশের মধ্যবিত্তরা বাঙালী মধ্যবিত্তকে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গেল। আজ সর্বভারতীয় আসরে বাঙালী—মধ্যবিত্ত বাঙালী—প্রায় অপাংক্তেয় বললেই চলে। শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনকালেই বাঙলী অন্যান্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে নি। কিন্তু এমন যে রাজনীতি—যাতে বাঙালীর প্রতিভা ও কৃতিত্ব অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল—সেখান থেকেও আজ বাঙালী পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়েছে। বাঙালী ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেছিল সকলের আগে এবং পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা আত্মসাৎকরণের প্রচেষ্টায় তার আগ্রহও ছিল সকলের চাইতে ঐকান্তিক। ফলে বাংলা দেশে একটা শক্তিশালী বৃত্তিজীবী শ্রেণী বা professional class গড়ে ওঠে। উকিল, ডাক্তার, সরকারী কর্মচারী, অধ্যাপক, শিক্ষক, কেরাণী প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষ এত অধিক সংখ্যায় সৃষ্ট হতে লাগল যে বাংলার নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়েও বহু উদ্বৃত্ত থেকে গেল। উদ্বৃত্তরা জীবিকার তাগিদে বাংলা দেশের বাইরে কর্মক্ষেত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। সেই উদ্বৃত্ত বৃত্তিজীবীদের নিয়েই যাঁদের আমরা প্রবাসী বাঙালী বলি সেই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। বলাই বাহুল্য যে, বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকেই এই বৃত্তিজীবী শ্রেণীর লোক আহৃত হয়েছিল।

কিন্তু আজ আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? দেখছি যে অন্য প্রদেশবাসীরা আজ বাঙালীর অস্ত্রে বাঙালীকেই মারছে। বাঙালীর উপর গুরুমারা বিদ্যা প্রয়োগ করছে। অন্যান্য অঞ্চলগুলিতেও বাঙালী মধ্যবিত্ত বৃত্তিজীবী শ্রেণীর ন্যায় সুস্পষ্ট বৃত্তিজীবী শ্রেণী গড়ে উঠেছে। প্রবাসী বাঙালীর অস্তিত্ব বিপন্ন। 'ডোমিসাইল' না নিয়ে কোথাও তাঁদের টেকবার যো নেই। নিজ প্রদেশেও তাঁরা অনাকাঙ্ক্ষিত। তাঁদের দুর্গতি অনুমেয়।

প্রবাসে অপ্রবাসে বাঙালী মধ্যবিত্তের এই-যে দুর্গতি, এটা নিতান্ত অকারণ নয়। যে কোন শ্রেণীর উদ্ভব ও বিলয়ের একটা ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়ে বিশেষ ঐতি-হাসিক যোগাযোগে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। আজ সেই ঐতিহাসিক যোগাযোগ বিলুপ্ত হয়ে এসেছে; ফলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও অস্তিত্বকাল

ঘনিয়ে এল। এজন্য আক্ষেপ করা বৃথা, কেন না ঐতিহাসিক বিধানের অমোঘতা ও অনিবার্যতাকে যদি আমরা স্বীকার করি, তা হলে আমাদের এই পরিণামকে স্বীকার করতে হবে।

বাঙালী মধ্যবিত্ত বিদ্যায় বুদ্ধিতে শিক্ষায় দীক্ষায় এককালে যতই শীর্ষ-স্থানীয় থাকুক, এ কথা মানতেই হবে যে, যে ঐতিহাসিক কার্যকারণ থেকে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব সেটা খুব গৌরব করে বলার মত ঘটনা নয়। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসক এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার সৃষ্টি করেছিল স্বীয় সাম্রাজ্য-বাদী শাসন অক্ষুণ্ণ রাখবার হীন অভিপ্রায়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের লোভনীয় টোপ ফেলে বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী ব্রিটিশসমর্থক একটি বিশেষ সম্প্রদায় সৃষ্টি করে তারা সাম্রাজ্য-শাসনকে সুরক্ষিত করতে চেয়েছিল। বাংলার জমিদার শ্রেণীর এইভাবেই উদ্ভব। সরকার জমিদারদের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট বৎসরান্ত খাজনা পেলেই খুশী থাকত; জমিদারদের আর সব ব্যাপারে খোলা মাঠ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। জমিদারদের অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার অধিকারে হস্তক্ষেপ করবার কোন পথই যখন আর রইল না, জমিদার শ্রেণী সর্ব বিষয়ে একচ্ছত্র হয়ে উঠল। এরূপ অবস্থায় জমিদার শ্রেণী যে নিরতিশয় অত্যাচারী ও পীড়ক হয়ে উঠবে তা না বললেও চলে। হলও তাই। জমিদারকুলের হস্তে প্রজার উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা ক্রমেই মাত্রাহীন হয়ে উঠল। সমাজে একটি পরশ্রমজীবী, আরাম-আয়েসনির্ভর জাতীয়তাবিরোধী পরগাছা শ্রেণীর সৃষ্টি হল।

কিন্তু কোন বস্তুই বোধ হয় নিরবচ্ছিন্ন মন্দ নয়। বিষবৃক্ষেও নাকি অমৃত ফল ফলে। জমিদারী প্রথার মন্থনদণ্ডে যেমন বিষ উঠল, তেমনি সুধাও উঠল। কালক্রমে করদাতা জমিদার ও করগ্রহীতা সরকারের মধ্যে অনেকগুলি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হল। তালুকদার, জোতদার, পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, বর্গাদার প্রভৃতি এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী। এবং এই শ্রেণী-গুলিই হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রকৃত মেরুদণ্ড। এদের থেকেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে এবং কালক্রমে তারা শহর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। তালুকদার, জোতদাররা প্রজা শোষণের ক্ষেত্রে জমিদারদেরই ক্ষুদে সংস্করণ; কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে বহুল অবকাশের অধিকারী ও অর্থসমস্যার দ্বারা বিব্রত না হওয়ায় এই শ্রেণীর মানুষেরা বাংলার সমাজকে নানাভাবে সমৃদ্ধও করেছে। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিবিষয়ক প্রচেষ্টাগুলি

অবকাশের আবহাওয়াতেই স্ফূর্তি লাভ করে অধিক। বিদ্যাভ্যাস এবং জ্ঞান-সাধনার জন্যে চাই চিন্তাক্লেশবিরহিত সম্যক মানসিকতার পরিমণ্ডল। উপরোক্ত শ্রেণীগুলির হাতে এই দ্বিবিধ সুবিধা প্রচুর পরিমাণে থাকার দরুণ তারা শিক্ষায় দীক্ষায় শিল্প-সংস্কৃতিতে বাংলা দেশকে স্থায়ী মূল্যের অনেক কিছু দান করে গেছেন।

যে কথা আগে বলেছি, জাতীয়তার হোতাও এই মধ্যবিত্ত বাঙালী। আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্জনের মধ্য দিয়ে স্বদেশসেবার পথে বাঙালীই প্রথম চলতে শিখেছিল; পরে অন্যান্য প্রদেশবাসীরা বাঙালীর প্রদর্শিত দেশসেবার সূত্রটুকু তুলে ধরে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে আধ্যাত্মিক আন্দোলনে, স্ত্রীজাতির উন্নতিবিধানে, আত্মোপলব্ধির সাধনার ক্ষেত্রে ও সমাজসংস্কার-প্রচেষ্টায় যে বহুমুখী চাঞ্চল্যের সাক্ষাৎ আমরা পাই তা এই নব-জাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মপ্রয়াসেরই ফল। অবশ্য এঁদের মধ্যে অভিজাত বা আরিষ্টোক্রাটও কেউ কেউ ছিলেন (যেমন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি), কিন্তু বাদ বাকী প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তান। বঙ্কিমচন্দ্র এই নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একজন সুযোগ্য প্রতিনিধি। প্রথম প্রতিনিধি না হলেও প্রথম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। এবং এই সম্প্রদায়েরই শ্রেষ্ঠ শেষ তিনজন প্রতিনিধি হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র। মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ উভয়প্রান্তের মধ্যে সুদৃঢ় যোগসূত্র স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সুবিশাল মহিমায় ও অভ্রভেদী গৌরবে। বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এঁরা এক একজন দিকপাল। এঁদের ও এঁদের ন্যায় অন্যান্য আরও অনেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সারা ভারতের সপ্রশংস শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল।

পাশ্চাত্ত্যের 'বুর্জোয়া' আর বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত কিংবা পাশ্চাত্ত্যের 'পাতি-বুর্জোয়া' আর বাংলার নিম্ন মধ্যবিত্ত ঠিক এক বস্তু নয়। পাশ্চাত্ত্যের বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution) থেকে; আর এদেশে মধ্যবিত্ত নামে যাঁরা পরিচিত তাঁরা এদেশের সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থারই পরোক্ষ দান। মাটি থেকে পর্যাপ্ত অন্নবস্ত্রের যোগান হয় না বলে পরে এরা শহর অঞ্চলে ক্রমবর্ধিত সংখ্যায় ছড়িয়ে পড়ে এবং এই ভাবে বৃত্তিজীবী শ্রেণীগুলির সৃষ্টি হয়। কিংবা এমনও হতে পারে যে মাটি এদের

ধরে রাখতে পারে নি ; মাটির আকর্ষণ কাটিয়ে এরা নগরীর বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছিল। কিন্তু পল্লীর মোহ একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ফলে এঁদের মানসিকতায় নগরকেন্দ্রিকতা আর পল্লীপ্রাণতার মধ্যে একটা সংঘাত থেকেই গেছে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য বুর্জোয়া শ্রেণীর চিত্তবৃত্তিতে এই সংঘাত নেই। তারা নিরবচ্ছিন্ন নগর-সভ্যতার দান ; শিল্পবিপ্লব তাদের চোখ থেকে পল্লীর মোহাঞ্জন নিঃশেষে মুছে নিয়েছে। বাঙালী তথা ভারতীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবন ও কর্মধারা শহরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও মুখ্যতঃ এদেশের কৃষিসভ্যতারই মানসসন্তান তারা। কৃষির সংস্কার এ দেশের মানুষের একেবারে অস্থিমজ্জায় নিহিত। শিল্পের সংস্কার (যদিও কিছু কিছু শিল্পায়িতকরণ এদেশে হয়েছে) এখনও এদেশবাসীর মনে পাক ধরে নি। এইখানেই পাশ্চাত্ত্য বুর্জোয়ার সঙ্গে এ দেশীয় মধ্যবিত্তের মূলগত পার্থক্য।

বাঙালী মেধা ও বুদ্ধির যে বিস্ময়কর স্ফুরণ আমরা বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখি তা আকস্মিক কোন ব্যাপার নয়। সর্বাগ্রে বাংলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার উপরেই আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে) প্রবর্তিত হওয়ায় এবং বাঙালী ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ সকলের আগে গ্রহণ করায় বাংলা দেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও সৃষ্টি হয় সর্বপ্রথমে এবং স্বভাবতঃই বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিভা ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য তৎকালে অনুন্নত অন্যান্য প্রদেশবাসীর চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। কিন্তু এজন্যে বাঙালী মধ্যবিত্তের অতিরিক্ত আত্মপ্রসাদ লাভের কোন কারণ নেই। বাঙালী বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকলের বড়, এই কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ববোধ দ্বারাও নিজেদের প্রতারিত করার কোন কারণ দেখি না। বাঙালীর প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের চেতনা নিছকই চোরাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত। নানা বাস্তব অবস্থার দরুণ অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসী শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ অপেক্ষাকৃত পরে লাভ করেছে বলে তথায় সুসংহত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠতে স্বভাবতঃই কিছু বিলম্ব হয়। কিন্তু এক্ষণে তাঁরা তাঁদের প্রাথমিক বিলম্বীকরণজনিত ত্রুটিটুকু শুধরে নিয়েছে আর উন্নতির পথে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলেছে।

অপরপক্ষে, বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিভা ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। তাঁরা আজ নানা কারণে নিষ্প্রভ। তাঁদের যা দেবার ছিল তাঁরা

দিয়েছে। তাঁরা তাঁদের বিপ্লবী সম্ভাবনাকে জাতিগঠনের কাজে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। আজ তাঁরা ফতুর, দেউলে! রঙ্গমঞ্চ থেকে এবার তাঁদের বিদায় নেবার পালা। অন্যান্য রাজ্যের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এখনও প্রসার্যমাণ; পাকিস্তানের দৌলতে নূতন সৃষ্ট মুসলিম মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তো রীতিমত aggressive। কিন্তু বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্কোচনপ্রক্রিয়া সুরু হয়ে গিয়েছে অনেক আগে থেকেই। তাদের মধ্যে প্রাণ যেটুকু বা ধুকপুক করছে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদে তাও স্তব্ধ হবার উপক্রম। অবশ্য জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সকল রাজ্যকেই সমানভাবে আঘাত করবে, কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের মধ্যবিত্তদের অবস্থান্তরের সহিত নিজেদের মানিয়ে চলার যেটুকু বা সুযোগ আছে বাঙালী মধ্যবিত্তের তাও নেই। কেন না বাঙালী মধ্যবিত্তের আয়ু ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ীই নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন হয় তাকে নবসৃষ্ট বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভোল বদলিয়ে টিকে থাকার প্রয়াস করতে হবে, নয়তো প্রোলিটারিয়েটের খাতায় নাম লিখিয়ে নিজের স্বতন্ত্র শ্রেণীসত্তা বিলোপ করে দিতে হবে।

মধ্যবিত্তের প্রবণতা দ্বিমুখী। কখনও সে প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী, কখনও নিম্নাভিমুখী। উচ্চতর জীবনযাত্রার প্রতি তার সহজাত লোভ, সে লোভ চরিতার্থ না হলে নিম্নমুখে তার দৃষ্টিপাত। ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, অবস্থার চাপে শেষ পর্যন্ত তাকে শ্রমিকসত্তার মধ্যেই নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে মিশিয়ে দিতে হয়। মুষ্টিমেয় সংখ্যকের ঊর্ধ্বমুখী দৃষ্টান্ত অবশ্য আলাদা। বাঙালী মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রেও এই অমোঘ বৈজ্ঞানিক নিয়মের ব্যতিক্রম হবার কারণ নেই। ফলতঃ এই নিয়মানুযায়ী প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। বাঙালী মধ্যবিত্ত ও বাঙালী শ্রমিক জনসাধারণ—এই দুয়ের মধ্যে শ্রেণীভেদ ক্রমেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধকালীন বৎসরগুলির শোচনীয় অর্থকৃচ্ছ্রতা, দুর্ভিক্ষ, মারী ও মড়ক, যুদ্ধপরবর্তী বৎসরগুলির দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর্থিক সঙ্কট ও ক্রমস্ফীত বেকারসমস্যা বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভিতর যে গভীর ভাঙন ধরিয়েছে তার ফলে তার স্বতন্ত্র শ্রেণীসত্তা খারিজ হবার উপক্রম। দলে দলে "ভদ্রলোক" কলমের বদলে কারখানার হাতিয়ার ধরছে। ধুতি-পাঞ্জাবী রূপান্তরিত হচ্ছে হাফ-প্যাণ্ট ও হাফ-সার্টে। অবশ্য এখনও কাপড়ে-চোপড়ে ভদ্রলোকের ঠাট বজায় রাখার একটা চেষ্টা চলছে। কিন্তু প্রয়াসটা প্রাণান্তকর। কালক্রমে এ ঠাটটুকুও থাকবে না। ইংরেজী

শিক্ষার উৎস থেকে উৎসারিত মধ্যবিত্ত ধারা প্রোলিটারিয়েট জনসমুদ্রে মিশে একাকার হয়ে যাবে। সেদিনের কি খুব বিলম্ব আছে?

॥ ৩ ॥

গত কয়েক বৎসরে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটেছে যাতে স্ত্রীপুরুষের বিবাহিত জীবনের সমস্যাটির উপর আবার নতুন করে দৃষ্টি দেবার সময় হয়েছে। প্রথমা স্ত্রী বর্তমানে আরেকবার দারপরিগ্রহ করার দৃষ্টান্ত কিছু নতুন নয়; আমাদের সমাজে এই কুঅভ্যাস বহুকাল থেকেই প্রচলিত এবং উনবিংশ শতকের প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারকদের আমল থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী বহু মনীষীই এই প্রথাটিকে সমাজদেহ থেকে নির্মূল করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু মনে হয় এই অভ্যাস নির্মূল তো হয়ই নি, গত কয়েক বছরে নতুন করে তা সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। আগে যে সমস্ত দ্বিবিবাহ বা বহু-বিবাহের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ত তা সমাজের কৌলীন্যগর্বী অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এবার একটি নতুন ব্যাপার চোখে পড়ল। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যতগুলি দ্বিবিবাহের দৃষ্টান্ত আমাদের গোচরীভূত হয়েছে তার অধিকাংশেরই নায়ক হলেন শিক্ষিত, রুচিবান ভদ্র শ্রেণীর মানুষ—এঁদের মধ্যে কলেজের অধ্যাপক থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যিক, কবি, অভিনেতা, বনেদী ঘরের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলে প্রভৃতি একাধিক স্তর ও জীবিকার মানুষই রয়েছেন।

অন্যত্রেও এই ধরনের বিবাহ অনেক ঘটে থাকবে নিশ্চয়, তাদের সব খবর আমরা রাখি না। কিন্তু এক কলকাতা শহরেই যতগুলি এই ধরনের বিবাহ গত কয়েক বৎসরে অনুষ্ঠিত হয়েছে তাদের সংখ্যা ও পৌনঃপুনিকতার নজীর থেকে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে দ্বিবিবাহের অমার্জনীয় অপরাধপ্রবণতা একটা প্রবল তরঙ্গের মত আমাদের শিক্ষিত সমাজদেহকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। হঠাৎ এই অভ্যাস আবার কেন নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তার কারণ নির্ণয় করার আগে এ কথা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, এই প্রবৃত্তি

অসামাজিক, প্রগতিবিরোধী ও সমগ্রভাবে নারীসমাজের অপমানকর। পুরুষের মধ্যে বহুচারিতা (polygamy)-র প্রবৃত্তি সহজাত এ কথা অস্বীকার করি না, কিন্তু সেই যুক্তিতে একটি নারীকে জীর্ণ বাসের মত পরিত্যাগ করে আরেকটি নারীকে অবলীলাক্রমে গ্রহণ করাকে কিছুতেই বরদাস্ত করা চলতে পারে না। যে সমস্ত শিক্ষিত ছেলে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এ কাজ করছেন বুঝতে হবে তাঁদের ভিতর বিবেকবোধ যথেষ্ট প্রবল নয়; ভারতীয় সমাজে নারীর অসহায়তা সম্পর্কেও তাঁরা সম্যক সচেতন নন বলে মনে হয়। আধুনিকতার নজীরে তাঁদের কাজকে সমর্থন করার আগে এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতের নারীসমাজের অবস্থা আর ইউরোপ কিংবা আমেরিকার নারীসমাজের অবস্থা সমপর্যায়ের নয়। তাই তাদের দেশে যেটা স্বাভাবিক সেটা এদেশে স্বাভাবিক নাও হতে পারে।

এই পর্যন্ত পড়ে অনেকেরই মনে হতে পারে লেখকের কথাগুলি পিউরিটানের মত শোনাচ্ছে, হয়তো লেখক রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন ভদ্রলোকদের হয়ে ওকালতি করবার জন্যেই কলম ধরেছেন। কিন্তু যাঁরা আমার মতামতের সঙ্গে পূর্বাপর পরিচিত আছেন তাঁরা অন্তত: আমার প্রতি সুবিচার করবেন এই আশা আমি করতে পারি। এই কিছুদিন আগেই স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলামেশার পক্ষে ওকালতি করবার জন্যে আমাকে অনেকের বিরাগভাজন হতে হয়েছে। স্ত্রীপুরুষের সমস্যা সম্পর্কে আমার মত অত্যন্ত স্পষ্ট, রূঢ় ও বৈপ্লবিক। আমি মনে করি বাঙালী ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁদের ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত হয়েই থাকবে। তাদের সহজাত অধ্যবসায়, উদ্যম ও কর্মক্ষমতাকে নানাদিকে বিকশিত করে তুলতে হলে, তাদের আচরণে শালীনতা ও শান্তশ্রী আনতে হলে, তাদের যথার্থ স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী করে তুলতে হলে, তাদের পরস্পরের সুস্থ সাহচর্যে আসা একান্তই দরকার—ছেলে মেয়েদের মধ্যে কল্পিত বিভেদের প্রাচীর তুলে আমরা বাঙালী যুবশক্তির নিরর্থক অপচয় করছি বই নয়। কিন্তু এই মত পোষণ করা মানে দায়িত্বহীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়, সংযমের বাঁধকে আলগা দিতে বলা নয়। স্বাধীনতা অর্থ যদৃচ্ছা প্রবৃত্তির খোরাক জুটিয়ে চলা নয়; নিজেকে নিজের অধীন করাকেই বলে স্বাধীনতা, অক্ষরগত ও ভাবগত এই দুই অর্থেই। যে স্বাধীনতায় মানুষের মানবতাবোধ

লাঞ্ছিত হয়, বিবেকবোধ হয় পীড়িত, সেই স্বাধীনতা কখনও প্রকৃত স্বাধীনতা পদবাচ্য হতে পারে না। আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত ছেলেরা এক স্ত্রী বর্তমানে এই যে আরেক স্ত্রী গ্রহণ করার অভ্যাসটিকে ক্রমাগতই দৃষ্টান্ত দ্বারা সমাজদেহে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করছেন তাতে স্বাধীনতা আর স্বাধীনতা নেই, তা হয়ে দাঁড়িয়েছে পাপাচরণের সামিল।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই মধ্যে বোধ হয় বহুচারিতার প্রবৃত্তি বর্তমান। নারী মনে মনে বহুবল্লভ, পুরুষ এক নারীকে ভালবেসেও অন্তরে মধুকরবৃত্তির তাগিদের দাস। সাহিত্যে কাব্যে সামাজিক জীবনে আমরা একনিষ্ঠার যত প্রশস্তিই গাই না কেন, এটা সকলেই আমরা জানি—মুখে কবুল না করলেও মনে মনে অন্ততঃ স্বীকার করি—যে, একনিষ্ঠাটুকু আদর্শ হিসেবেই প্রশংসনীয়, নইলে শতকরা পঁচানব্বই জন মানুষই অন্তরে অন্তরে বহুচারী প্রবৃত্তির অধীন। কিন্তু এই প্রবৃত্তি আছে বলেই কিছু মানুষ আর সব সময় প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় না, কোথাও না কোথাও তাকে সীমারেখা টানতে হয়ই। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আর সমাজের প্রয়োজনের মধ্যে কোন এক জায়গায় এসে রফা করা একান্ত দরকার এবং মানুষ তা করেও। নইলে পৃথিবীতে শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হতে পারত না; পৃথিবী সভ্যতাবিকাশের আদিম স্তরে আজও দাঁড়িয়ে থাকত। প্রবৃত্তিকে সংযমের শাসনে বাঁধতে পারার নামই সভ্যতা, শালীনতা, শিষ্টাচার। প্রবৃত্তিকে বাঁধতে বাঁধতেই মানুষ সভ্যতার ক্রমস্ফুরণের পথে সম্মুখে এগিয়ে চলেছে—মানুষের সভ্যতার ইতিহাস আর কিছু নয়, দুঃসাধ্য সংযমসাধনার অন্তহীন ইতিবৃত্ত। সংযমই মানুষকে ধরে রেখেছে; নইলে বনের পশুতে আর হাতপা-ওয়ালা মানুষ নামক জীবে কোন তফাৎ থাকত না। সংযম যখন অবদমনে গিয়ে দাঁড়ায় তখন সেটা খারাপ, বিকৃতির নামান্তর—কিন্তু এম্নিতে সুস্থ সংযমই সভ্য মানুষের আদর্শ, আচরণীয় নীতি। মানুষের বহুচারিতার প্রবৃত্তিটিকে সমাজের অনুমোদিত সুস্থ পথে বিকশিত ক'রে তুলতে পারা যাচ্ছে না বলেই সমাজদেহ নানা বিকৃতির কলুষে ভরে উঠছে, নানা পাপাচারে সমাজমনের সুগুপ্ত অলিগলি ক্লেদাক্ত হ'য়ে উঠছে। সুস্থ সহজ পথে মানুষের একান্ত স্বাভাবিক বহুচারিতার তাগিদটুকু উন্মুক্ত করতে পারলে মানুষ আর গোপন সুযোগ সন্ধান করত না, ন্যায়সঙ্গত ভদ্রভাবেই সে তার

প্রবৃত্তিকে বহুজনের সান্নিধ্যের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে চরিতার্থতা খুঁজে পেত। নরনারীর স্বাভাবিক মেলামেশার অধিকার স্বীকার সেই চরিতার্থতারই একটি ভদ্র, শিষ্টাচারসম্মত পথ। এখানে প্রবৃত্তির চরিতার্থতা বলতে স্থূল চরিতার্থতা বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে নরনারীর সন্নিধিজাত সেই সূক্ষ্ম মানসিক চরিতার্থতা, যাকে কোনক্রমেই গর্হিত বলা চলে না। নরনারীর স্বাধীন মেলামেশায় মানুষের বহুজনের সন্নিধির কামনা সূক্ষ্মভাবে অন্ততঃ পরিতৃপ্ত হয়, সভ্য মানুষের জীবনে স্থূল অনিয়ন্ত্রিত পরিতৃপ্তির চাইতে এই সূক্ষ্ম রুচিসম্মত পরিতৃপ্তির দাম যে অনেক বেশী সে কথা আশা করি মার্জিতরুচি ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন। প্রবৃত্তিরূপ সাপটিও মরল অথচ সমাজযষ্টিটুকুও ভাঙল না এই যদি মানুষের কাম্য হয়ে থাকে তা হলে নরনারীর মধ্যে সুস্থ সাহচর্যের প্রসার অবশ্যই সমর্থনযোগ্য।

কিন্তু এক স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করার অভ্যাস এই সূক্ষ্ম পরিতৃপ্তির পথটিকেই না বেছে স্থূল বিকৃত পরিতৃপ্তির পথটিকে বেছে নিচ্ছে বলে মনে হয়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ন্যায় অনগ্রসর দেশে—যেখানে নারী আজও তার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শেখে নি—এই প্রথা মারাত্মক অপরাধেরই সামিল। আমাদের এইসব তথাকথিত অগ্রসরপন্থী যুবকের দল, যাঁরা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করার পর প্রথম স্ত্রীকে হেলায় পরিত্যাগ করছেন, তাঁরা প্রথমা স্ত্রীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতটুকুও ভাবিত নন বলে মনে হয়। আমাদের সমাজে বিবাহিতা নারী সর্বব্যাপারে স্বামীর মুখাপেক্ষিণী, আর্থিক স্বাধীনতা বলে তাঁর কিছু নেই, অন্ততঃ আজ অবধি সে এই অধিকারটুকু থেকে বঞ্চিত, যদিও আজকাল কোন কোন মেয়ে স্বাধীনভাবে কিছু কিছু রোজগার করতে শিখছেন। বিবাহিত নারীর এই সর্বাঙ্গীণ স্বামী-নির্ভরতা নীতি হিসাবে গ্রাহ্য নয়, তাকে আদর্শ অবস্থা বলেও স্বীকার করা চলে না। কিন্তু সেটা গ্রাহ্য হোক বা না হোক, যা fact তার প্রতি আমরা চোখ কান বুজে থাকতে পারি না। এখনও ভারতবর্ষে সেই অবস্থা আসে নি যেখানে নারী স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হলেও ভয়ের কিছু নেই, যেখানে নতুন ভরসায় বুক বেঁধে স্বামী-নিরপেক্ষভাবে জীবনারম্ভ করার সুযোগ তাঁর রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সমাজে বিবাহিত নারীর অবস্থা একান্ত ভাবেই স্বামীনির্ভর। তাই কোন স্বামী যখন বিরক্ত হয়ে বা ক্লান্ত হয়ে বা সন্দিগ্ধ হয়ে বা অন্য যে কোন

কারণে প্রথমা স্ত্রীকে বর্জন করে দ্বিতীয়া স্ত্রীর নেশায় মেতে ওঠে, অনাদৃতা প্রথমা স্ত্রীর অবস্থা যে কী শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমেয়। লাঞ্ছিতা পরিত্যক্তা নারী সেক্ষেত্রে হয় সমস্ত দুর্ভাগ্যের বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিতান্ত অপরাধিনীর ন্যায় পিতার বা ভ্রাতার সংসারের এককোণে এসে ঠাঁই নেয়, নয়তো সেখানে জায়গা না পেয়ে পরাশ্রিতার মত সকলের করুণা কুড়িয়ে বেড়ায়। যাঁদের নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গতি আছে তাঁদের অবস্থাটাও বিশেষ প্রীতিপ্রদ নয়। স্বামী কর্তৃক অবহেলিতা বা পরিত্যক্তা নারীর নিজের অপরাধ থাকুক, নাই থাকুক এ সমাজে কেউ তাঁকে প্রীতির চক্ষে দেখে না; ঘৃণা, অবজ্ঞা, উপহাস, করুণা এইগুলিই তখন তাঁর একক চলার পথের একমাত্র সঙ্গী হ'য়ে দাঁড়ায়। আর যাঁদের আর্থিক সঙ্গতিও নেই, স্বাধীনভাবে চলবার মত মনোবলও নেই, তাঁদের স্বামীবিরহিত হয়ে চলবার চেষ্টাটা প্রায়ই ট্র্যাজেডিতে পর্যবসিত হয়—এইরূপ কত শত শত হতভাগিনী স্বামীসোহাগবঞ্চিতা নারীর দীর্ঘশ্বাস সমাজের আনাচে-কানাচে অশ্রুবাষ্প হয়ে জমে আছে কে তার হিসাব রাখে?

তাই বলছিলুম, নিছক মানবতার মুখ চেয়ে, বিবেকবোধের তাড়নাতেই ওই অপরাধপ্রবণতা সংযত করা উচিত। যে দেশে একটি নারীকে পরিত্যাগ করা মানে তার ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দেওয়া শুধু নয়, জীবনটুকু পর্যন্ত বরবাদ করে দেওয়া, সে দেশে অন্ততঃ দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণের বিলাসিতা সাজে না। শুদ্ধমাত্র মানবতার দিক দিয়েই তা অত্যন্ত গর্হিত আচরণ বলে ধিক্কৃত হওয়া উচিত। আজ যদি ভারতীয় সমাজে নারীর স্বাধীন সত্তা আর তার স্বোপার্জনের ক্ষমতা থাকত, থাকত তার ডিভোর্সের বা পুনর্বিবাহের অধিকার, তা হলে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হলেও তার বিশেষ কিছু এসে যেত না, সে নিজেই নিজের পথ করে নিয়ে নতুন ভাবে আবার জীবনারম্ভ করতে পারত। কিন্তু যে সমাজে তাঁর নামমাত্র স্বাধীনতার পথটুকু পর্যন্ত রুদ্ধ, সেই সমাজে নারীকে বিসর্জন দেওয়া যে কত বড় গর্হিত আচরণ এ কথা আমাদের তথাকথিত প্রগতিবাদী শিক্ষিতের দলকে কে বোঝাবে? *

---

* এই প্রবন্ধ দশ বছর আগে লেখা। সুখের বিষয় আজ হিন্দু নারীর ডিভোর্সের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, আইন করে বহুবিবাহও রোধের ব্যবস্থা হয়েছে।

অনেকে ইউরোপীয় সমাজের নজীর তুলে এই অপরাধকে কিয়ৎ পরিমাণে স্খালন করতে চাইবেন জানি, কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, ইউরোপীয় সমাজের অবস্থা আর ভারতীয় সমাজের অবস্থা এক নয়। ইউরোপের মেয়েরা অল্পবিস্তর স্বাধীন, অন্ততঃ পুরাপুরি স্বাধীন না হলেও তাঁদের স্বামী-নিরপেক্ষ আলাদা একটা সত্তা আছে। স্ত্রী নয় মাতা নয় ভগিনী নয় নিছক নারী হিসেবেই সমাজে তাঁদের একটা স্বতন্ত্র স্বীকৃতি রয়েছে। এই কারণে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হলেও সেটা তাঁদের তেমন গায়ে বাজে না যেমন আমাদের দেশের মেয়েদের বাজে। তাদের সমাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখবার বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে, অসংখ্য অগণন কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখকষ্ট কথঞ্চিৎ ভুলে থাকতে পারে। তাছাড়া তাদের সমাজে ডিভোর্সের পথ খোলা আছে—সুতরাং নারীলাঞ্ছনার সমস্যাটি কোন সময়েই সেখানে জটিল আকার ধারণ করতে পারে না। আমাদের সমাজের অবস্থা তা নয়। এখানে নারী আজ পর্যন্ত পরবশতাকেই জয় করতে পারল না—অন্যান্য অধিকার লাভ করা তো দূরের কথা। তাই অতি স্বাভাবিক কারণে আমাদের দেশের প্রতিটি নারীবিবর্জনের কাহিনী অশ্রুজলে নিষিক্ত, শোচনীয় বিয়োগান্ত ঘটনায় তার পরিণতি।

এ তো গেল জীবনধারণের সমস্যার দিক। এ ছাড়া আরও দিক আছে। তার ভিতর ভালবাসার ব্যর্থতাটাই সব চাইতে মর্মান্তিক। অনেক সময় সাময়িক মোহে বিভ্রান্ত হয়ে পুরুষকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করতে দেখা যায়—প্রথমা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা সব ক্ষেত্রেই যে ফুরিয়ে আসে তা নয়। এই সব ক্ষেত্রে হৃতগৌরব প্রথমা স্ত্রীর ভাগ্য নানা কারণেই বেদনাকরুণ হয়ে ওঠে। আবার এমনও দেখা যায় যে, স্বামী স্ত্রীকে ভালনা বাসলেও স্ত্রী স্বামীকে প্রাণ দিয়েই ভালবাসে। হয়ত এই সব স্বামীপ্রেমের বেলায় স্বামী নামক ব্যক্তিটির প্রতি ভালবাসা বড় কথা নয়, বড় কথা হল স্বামী নামক আইডিয়ার প্রতি ভারতীয় নারীর মনে যুগযুগান্ত ধরে যে শ্রদ্ধাবিমিশ্র মনোভাব সঞ্চিত হয়ে আছে সেই মনোভাব। তবে উৎস যাই হোক, স্ত্রীর প্রতি স্বামী খোলাখুলি ঔদাসীন্য প্রকাশ করলেও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যে প্রায়ই ব্যত্যয় ঘটতে দেখা যায় না। সেই নারী যখন পরিত্যক্তা হয়, বেদনায়, ব্যর্থতার পীড়নে, মনস্তাপে তাঁর হৃদয়ে যে হাহাকার পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে তার বুঝি তুলনা

মেলে না। ভালবাসার অপমান সমাজে প্রতিনিয়তই ঘটছে, এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশের অবকাশ থাকলেও প্রায়শ সে ক্ষোভের প্রতিকার মেলে না। কিন্তু যখন কোন শিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন বলে পরিচিত যুবক প্রবৃত্তির তাড়নায় বা এমনি ধরনের কোন বিভ্রান্তির ফলে প্রকাশ্যে সেই ভালবাসার অপমান করে, তখন আধুনিকতার নজীরে কী করে যে সেই কাজকে সমর্থন করা যায় আমি অন্ততঃ তা বুঝতে পারি নে।

নারীজীবনের ট্রাজিডি আমাদের সমাজে একটি নির্মম, নিষ্করুণ সত্য। এম্নিতেই তাতে জটিলতার অন্ত নেই, সেই ট্রাজিডিকে যখন কয়েকটি শিক্ষিত বিপথগামী যুবকের দৃষ্টান্তের যুক্তি দিয়ে সমর্থন করবার, এক কথায় 'rationalise' করবার চেষ্টা করা হয় তখন তা আরও বেশী মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। যৌনজীবনের ক্ষেত্রে অনেকখানি সংস্কারমুক্ত ইউরোপীয় সমাজেও এর ফল ভাল হয় না তার ঐতিহাসিক নজীর আছে। মেরী গডউইনের প্রেমে আচ্ছন্ন শেলী যখন হ্যারিয়েটের প্রতি ক্লান্ত হয়ে তাকে ত্যাগ করলেন, সন্তানসম্ভবা হতভাগিনী হ্যারিয়েট জলে ঝাঁপ দিয়ে সকল জ্বালা জুড়িয়েছিল। আমাদের সমাজে আত্ম-অবলুপ্তির মধ্যে সকল জ্বালা জুড়োবার এইরূপ কত-শত বেদনাদায়ক দৃষ্টান্ত যে লোকচক্ষুর অগোচরে জমে জমে উঠছে কে তার সন্ধান রাখে? যে নারী পরিত্যক্তা হয় না, শত লাঞ্ছনা সয়ে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহকারী স্বামীর সংসারে অনাদৃতা দুয়ো রাণীর মত পড়ে থাকে, তার দুঃখ বুঝি আরও শতগুণে মর্মান্তিক। কিন্তু কে তাঁর খোঁজ করে, কে তাঁর দুঃখের বার্তা লয়?—আমাদের এই পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর দুঃখ কি আর একটা দুঃখ যে সেই দুঃখ মোচনে সমাজ-প্রধানরা অগ্রসর হবেন? বরং অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, কৃত্রিম আধুনিকতার জেল্লায় বিভ্রান্ত আমরা এইসব বিপথগামীর আচরণকে অভিনন্দন জানাতে ছুটে যাই; ভাবি তাদের কাজ মস্ত বড় একটা বাহাদুরী, আর সেই বাহাদুরীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমরাও তথাকথিত সংস্কারমুক্তির প্রেরণায় প্রশংসায় প্রশংসায় অবারিত হয়ে উঠি!

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিচার্য। অনেক সময় দেখি, এই সব শিক্ষিত দুষ্কৃতকারীরা সন্তানবতী নারীকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করে না। বিবাহিত জীবনে সন্তান মস্ত বড় একটি বন্ধন—সন্তানের মধ্য-বর্তিতায় অনেক অশান্তি অনেক অতৃপ্তি অনেক দুঃখ দূর হয় বা চাপা পড়ে;

স্বামী স্ত্রী উভয়েরই জীবনে সন্তান প্রবল একটি প্রেরণা, স্বামী স্ত্রী সম্পূর্ণ দুই স্বতন্ত্র মনোজগতে বাস করেও শুধুমাত্র সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলের মুখ চেয়ে একত্র বাস করে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। মনের দিক দিয়ে পরস্পর-বিশ্লিষ্ট স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সন্তান মস্ত বড় এক যোগসূত্র—তাদের বহুবিধ দুঃখের সে হন্তারক। এমন যে সন্তান, সেই সন্তানের আকর্ষণের চাইতেও যখন এইসব শিক্ষিতম্মন্যদের মনে রূপজ মোহ প্রবল হয়ে ওঠে, বুঝতে হবে তাদের আচরণে কোন না কোন এক জায়গায় দুষ্প্রবৃত্তির পোষকতা আছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল স্ত্রীপুরুষের যৌন জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত সংস্কারমুক্ত মত পোষণ করেন; তাঁর মতামত এদেশীয় সংস্কার ও বিশ্বাসের পটভূমিকায় অতিশয় বিপ্লবাত্মক বলে প্রতিভাত হবে। কিন্তু তাঁরও মত এই যে, সন্তান যেখানে মধ্যবর্তী রয়েছে সেখানে স্ত্রীপুরুষের যদৃচ্ছা যৌন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার পথ অনেকখানি রুদ্ধ। সন্তানের মুখ চেয়েই সে ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিকে কমবেশি দমন করা উচিত। শুধু তাই নয়, তিনি মনে করেন সন্তান যেখানে রয়েছে সেখানে পিতামাতার ডিভোর্সের অধিকার যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হওয়া উচিত।*

রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসে দেখতে পাই, কুমু তার স্বামী মধুসূদনকে ভালবাসতে পারে নি, স্বামীর অতিরিক্ত কর্তৃত্বব্যঞ্জক boorish আচরণে বিরক্ত হয়ে কুমু তার দাদার সংসারে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আজন্মশত্রু ঘোষাল পরিবারের সঙ্গে মুখুজ্যে পরিবারের যে বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল তা যদি শুধু আনুষ্ঠানিক বিবাহবন্ধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত তা হলে হয়ত কুমুর পক্ষে স্বামীর কাছ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে দাদার সংসারে বাস করা অসম্ভব হত না। কিন্তু ততদিনে ঘোষাল পরিবারের সঙ্গে মুখুজ্যে পরিবারের নাড়ীতে নাড়ীতে গাঁঠছড়া বাঁধা পড়ে গিয়েছিল, কুমুর সন্তানসম্ভাবনার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠতে সেই নিবিড় রক্তের আত্মীয়তা সব ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠল। তখন আর কুমুর পক্ষে স্বতন্ত্র মর্যাদায় দাদার সংসারে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ল—ঘোষাল পরিবারের যে রক্তস্রোত সে নিজের দেহে ধারণ আর লালন করছিল তারই প্রেরণায় তাকে আবার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে হল। এর ভিতরকার কথাটি হল এই যে, সন্তানই কুমুর সঙ্কল্পে বাদ সাধল—যে সন্তান এখনও সম্ভাবনা মাত্র,

* রাসেলের Marriage and Morals গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

ভ্রূণের বন্ধনদশা এখনও যার মোচন হয় নি, সেই সন্তানের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কুমুর স্বামীবিমুখতা টলল। কুমুর জীবনে সন্তানের আবির্ভাব তার সমস্ত সমস্যাটাকে টেনে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল—সেই পরিণাম প্রীতিকর হোক না হোক, সন্তানজন্মের সম্ভাবনা সেই পরিণামের দিকেই তাকে সজোরে টেনে নিয়ে গেছে।

যেটা কুমুর বেলায় সত্য সেটা যে কোন সন্তানবান বা সন্তানবতী স্ত্রীর বেলায় সত্য। সন্তানের দিক দিয়ে যদি আমরা সমস্যাটির বিচার করি তা হলে এই সিদ্ধান্তে আমাদের আসতেই হয় যে, সন্তান বর্তমানে স্ত্রীত্যাগ (অথবা স্বামীত্যাগ) নিতান্ত সমাজবিরোধী, গর্হিত আচরণ—তাকে কোন যুক্তিতেই সমর্থন করা চলে না। মনে রাখতে হবে দেহবাদী প্রবৃত্তির চরিতার্থতাটুকুই বিবাহিত জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। হয়ত ওই প্রবৃত্তির তাগিদ মিলনেচ্ছার অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে, কিন্তু তার ফলে যে সন্তান জন্মলাভ করে তার শুভাশুভই পরিণামে স্বামীস্ত্রীর সর্বাধিক বিবেচ্য। আদিতে হয়ত সন্তানের চিন্তা মনে আসে না, কিন্তু একবার সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলের ধারণাটাই স্বামীস্ত্রীর চিন্তায় সব ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠা উচিত। সন্তান বর্তমানে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীত্যাগ যেমন অপরাধ, স্বামীর পক্ষেও তা তেমনি অপরাধ। শুধুমাত্র তখুনি স্বামীর স্ত্রী ত্যাগ বা স্ত্রীর স্বামীত্যাগ সমর্থনীয় মনে করা যেতে পারে যখন দুজনকে জোর করে একত্র বেঁধে রাখা তাদের দেহমনের উপর নিদারুণ অত্যাচারের সামিল—ডিভোর্স ই সেখানে একমাত্র রাস্তা। কিন্তু যতদিন না সমাজে আইনবদ্ধভাবে ডিভোর্সের অধিকার স্বীকৃত ও কার্যতঃ প্রযুক্ত হচ্ছে, যতদিন না মেয়েরা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছেন, ততদিন যত সুসঙ্গত কারণই থাকুক নারীকে অবহেলায় পরিত্যাগ করা পাতকের সামিল। এইভাবে নারীকে পথে বিসর্জন দেওয়ার ফলে পুরুষ হয়ত নিজে বেঁচে যায়, কিন্তু এ কথা তাঁর এক মুহূর্তের জন্যও ভোলা উচিত নয় যে আরেকটি জীবনকে ধ্বংস করেই তাঁর এই আত্মরক্ষা সম্ভব হয়। যে আত্মরক্ষায় কেবল নিজের মুক্তি অপরের সর্বনাশ, সে আত্মরক্ষা আত্মরক্ষাই নয়। কোন যুক্তিতেই তেমন আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিকে সমর্থন করা চলে না। যে কোন বিবেকবান মানুষের কাছে সেই আচরণ নিন্দনীয় বলে মনে হবে।

বিবেকের প্রশ্ন বাদ দিয়ে সমস্যাটির কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। এই যে কলকাতা শহরে কতকগুলি বিবাহের ট্রাজিডি পর পর ঘটল তার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, তার অধিকাংশেরই মূলে রয়েছে অভিভাবক-শাসিত বিবাহের কুফল। অভিভাবকেরা স্বীয় স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে ধরে বেঁধে প্রায়শঃ এমন সব ছেলেমেয়ের মধ্যে বিবাহ ঘটান যাদের ভিতর না আছে রুচির মিল, না শিক্ষাদীক্ষার মিল, না বা যৌন প্রবৃত্তির মিল। ফলে মেজাজ ও রুচির মিলের অভাবে, যৌন অতৃপ্তির চাপে, দুদিনেই স্বামী ক্লান্ত হয়ে ওঠে, ক্লান্ত হয়ে অন্য নারীর সাহচর্য পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে পড়ে। যাঁদের জীবনে আকাঙ্ক্ষিত সাহচর্যের সুযোগ আছে তাঁরা অচিরে সেই সুযোগ গ্রহণ করে, আর যাঁদের জীবনে সে সুযোগ নেই তাঁরা অবদমিত ইচ্ছার প্রতিক্রিয়ায় নানারূপ বিকৃতাচারের শরণাপন্ন হয় কিংবা অতৃপ্তিজনিত স্নায়বিক পীড়ায় ভোগে।

সমস্ত অশুভ সম্ভাবনাই নিরাকৃত হতে পারত যদি গোড়াতেই ভালবেসে বিবাহ করার সুযোগ ছেলেমেয়েদের দেওয়া হত। পাত্রপাত্রী নির্বাচনে অভিভাবকেরা উড়ে এসে জুড়ে বসেন বলেই পরিণামে সমাজে উপরি-উল্লিখিত অনাচারের দৃষ্টান্ত ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। যে স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসতে পারল না, তার শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে চেষ্টা করেও নিজের শিক্ষাদীক্ষার সাযুজ্য ঘটাতে পারল না, তার সঙ্গে দেহমিলনে কোন আনন্দই পেল না, তাদের বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হবে না ত কী হবে? অভিভাবকনিয়ন্ত্রিত বিবাহের ফলেই যে দাম্পত্যজীবনের এইরূপ শোচনীয় পরিণতি ঘটে সে সম্বন্ধে সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নেই। এইভাবে বিবাহ ব্যর্থ হয় বলেই পরিণামে স্বামী বেচারা স্ত্রী ছেড়ে অন্যস্ত্রী গ্রহণের অসামাজিক, অসঙ্গত তাগিদ অন্তরে অনুভব করে।

বিবেকের মানদণ্ডে এইরূপ স্বামীর আচরণ যতই নিন্দনীয় হোক না কেন, এ কথা যেন আমরা না ভুলি যে অতৃপ্ত স্বামীকে অপরাধপ্রবণতা ও পাপাচরণের মধ্য দিয়ে অভিভাবক-কৃত ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। অভিভাবকদের তরফে আরেকটু দূরদৃষ্টি থাকলে কিংবা পাত্রপাত্রী নির্বাচন-সমস্যা ছেলেমেয়েদের নিজেদের উপর ছেড়ে দিলে অনেক বিবাহেরই পরিসমাপ্তি অন্যরকম হত তাতে সন্দেহ নেই।

নারীজাতির অমঙ্গল রোধের সর্বপ্রধান উপায় নারীর আর্থিক স্বাধীনতা

ও ডিভোর্সের অধিকার স্বীকার। ডিভোর্সের পথ খোলা রাখা মানে অগণিত নারীর জীবনে আত্মমর্যাদার পথ উন্মুক্ত করা। বছর কয় আগে নিখিল-ভারত মহিলা সম্মেলন কলকাতায় মিলিত হয়েছিল। তাঁরা যে ভারতীয় নারীর অধিকারের সনদ (Charter of Rights for the Women of India) ঘোষণা করেছেন তাতে দাবী করা হয়েছে যে ভারতীয় নারীর অবস্থার উন্নতি সাধন করে তাকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে। সনদের "বিবাহ আইন" অংশে পুরুষের বহু-বিবাহ ও পাত্রপাত্রীর মত না নিয়ে বিবাহের বিশেষভাবে নিন্দা করা হয়েছে। এইগুলি যে খুবই সঙ্গত দাবী তাতে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। বরং বলা চলে এগুলি ন্যূনতম দাবী মাত্র; নারীর অধিকার আরও অনেকদূর সম্প্রসারিত হওয়া উচিত।

॥ ৪ ॥

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এ দেশে সত্যকার স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের আন্দোলন আরম্ভ হয়। আরম্ভ হয় সত্য, কিন্তু ১৯২১ সনের আগে পর্যন্ত সেই আন্দোলন এক প্রকার ঢিমিয়ে ঢিমিয়েই চলে এসেছিল। আমাদের দেশে যথার্থ নারীজাগরণ যেটুকু হয়েছে তা প্রধানতঃ গান্ধীজী প্রবর্তিত আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে হয়েছে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। উনিশ শতকের শেষ ত্রিশ বছর ও বর্তমান শতকের প্রথম কুড়ি বছর—এই পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায়, বাংলার উদারমতাবলম্বী সমাজসংস্কারকেরা তখন এইটুকুই মাত্র চেয়েছেন যে মেয়েরা খানিকটা লেখাপড়া শিখুক; তার বাইরে এবং বাড়াও যে নারী-জাগরণের ক্ষেত্র রয়েছে সে কথা তাঁরা তলিয়ে দেখেন নি। তাঁদের উনিশ-শতকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীপ্রগতির অর্থ সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে, কতক স্ত্রীলোক সে সময় লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন বটে কিন্তু বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের অভাবে সে শিক্ষা ফলপ্রসূ হতে পারে নি। রুদ্ধ গৃহের দুটো একটা জানালা খুলে দিতে পেরেই তাঁরা ভেবেছিলেন আলোর সমস্যা এবারে ঘুচল, কিন্তু বাইরের মুক্ত আঙিনায় পা দিয়ে আলোক-স্নান করবার কথা তাঁদের মনে হয় নি।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর থেকে এ অবস্থার মোড় ঘুরে গেল। মেয়েদের মধ্যে যাঁরা লেখাপড়া শিখেছিলেন প্রকাশ্য সংগ্রামে তাঁরা ত পুরুষের পাশে এসে দাঁড়ালেনই, অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মেয়েরাও দলে দলে গৃহের বন্ধন ও আত্মক্ষয়কারী অহেতুক লজ্জার নাগপাশ এড়িয়ে দলে দলে বাইরে এসে পা দিলেন বাপ ভাই আর স্বামীর দুঃখকষ্টের অংশ গ্রহণ করবার জন্যে। এই যে জাগরণ এইটেই সত্যকার নারীজাগরণ: এতে একদিকে যেমন শিক্ষাবিস্তারের সমস্যাটিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে নারীপুরুষের মেলামেশার প্রশ্নটিকে চাপা না দিয়ে তাকেও প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে নারীর শিক্ষা পুরুষের শিক্ষার মতই হয়ত বাইরে থেকে খানিকটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে; কিন্তু গান্ধীজীপ্রবর্তিত সংগ্রামের অভিনবত্ব ও বলিষ্ঠ আদর্শবাদ ভিতর থেকে নারীর অচল, অনড় মনকে যে ধাক্কা দিয়েছে তাতে নারীর শিক্ষা ব্যাহত ত হয়ই নি, বরং সে শিক্ষার পথ আরও বেশী সুগম হয়েছে। এদিকে নারীপুরুষে একযোগে কাজ করার অভ্যাসের ফলে প্রত্যক্ষ এই উপকার হয়েছে যে, মেয়েদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় দেখা দিয়েছে, তাঁদের অহেতুক জড়তা গেছে ভেঙে, বাইরের পুরুষের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা পাওয়ার দরুণ তাঁরা ঘরের মানুষের কাছ থেকেও নতুন করে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। অসংযমের দৃষ্টান্ত হয়ত এখানে সেখানে দুটো একটি চোখে পড়েছে, কিন্তু তার জন্যে ভয় পাবার কিছু নেই। মস্ত বড় অধিকার, মস্ত বড় লাভ যখন হাতের মুঠোয় আসবার উপক্রম হয় তখন ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতিকে গ্রাহ্য করলে চলে না।

এ কথা বলব না যে এ দেশে নারীপ্রগতি ষোল আনা পূর্ণ হয়েছে—বস্তুতঃ, এ পথে এখনও অনেক কিছু করবার বাকী আছে। তাই বলে যতটুকু পথ অগ্রসর হওয়া গেছে তাকে স্বীকার না করাও অন্যায়। বিগত শতাব্দীর সংস্কারকেরা এবং বর্তমান শতাব্দীতে তাঁদের উত্তরসাধকেরা পঞ্চাশ বৎসরের চেষ্টায় নারীর উন্নতির জন্যে যা না করতে পেরেছেন এই গত পঁচিশ বছরের স্বাধীনতা-অর্জন-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নারী নিজেই নিজের জন্যে তার চাইতে অনেক বেশী অধিকার আদায় করে নিয়েছেন। গত পঁচিশ বছরের ভিতর তিন তিনটে বড় রকমের

আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষকে নাড়া দিয়ে গেছে—মনে রাখতে হবে সংগ্রামবিমুখ আরামস্পৃহ মডারেট নেতাদের আপোষ ও আর্জির পথ দিয়ে সে আন্দোলন অগ্রসর হয় নি; অসহযোগ ও সরাসরি সংগ্রামের কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়েই বারবার তার মৃত্যুঞ্জয় অভিযান চালিত হয়েছে। যদি কোনদিন এই আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংকলিত হয় তখন দেখা যাবে ভারতীয় নারী এই গৌরবান্বিত ইতিহাসের একটি সম্মাননীয় অংশ অধিকার করে আছেন—পিছন থেকে তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং পাশ থেকে সক্রিয় সাহচর্য না পেলে একা পুরুষের পক্ষে এই সংগ্রাম চালনা করা সম্ভব হত না।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন যেমন নারীর যুগসঞ্চিত জড়তা ও অজ্ঞতাকে প্রচণ্ড রকমের ধাক্কা দিতে সহায়তা করেছে তেমনি চীনদেশেও দেখি মাঞ্চু রাজত্বের অবসানের পর গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান প্রথম সে দেশে সত্যকার নারীজাগরণের সূচনা করেছে। ১৯১২ সনের আগে পর্যন্ত সামাজিক অধিকার ও শিক্ষার ক্ষেত্রে চীনা নারীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল; কিন্তু নূতন ভাবাদর্শ, নূতন বিপ্লবের জোয়ারের মুখে তাদের বহু-দিনের সঞ্চিত কুসংস্কার গেল ভেসে, চীনা নারী আলোর দেশের তীরে উত্তরিত হবার চেষ্টা করলেন। সেই উত্তরণ প্রচেষ্টা আজও শেষ হয় নি। জাপ যুদ্ধের ধাক্কায় যা গতিবেগ লাভ করেছিল, নয়া চীনের পরিবর্তিত অনুকূল পরিবেশে তা আরও বলসঞ্চয় করেছে। সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে চীনা নারীর মুক্তি ঘটতে চলেছে। তুরস্কেও দেখি একই দৃষ্টান্ত। রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের মুখে বিপ্লবী কামাল যদি না সেখানে দৃঢ়হস্তে নূতনভাবে সমাজ-গঠন-প্রচেষ্টায় হাত দিতেন তা হলে সে দেশে নারীর মুক্তি এমন অবিশ্বাস্যরকম দ্রুত সাধিত হতে পারত না।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকে এই শুধু প্রমাণ হয় যে, কোন দেশেই প্রচণ্ড রকমের আলোড়ন ছাড়া নারীজাগরণ সম্ভব হয় নি। অবশ্য সেই আলোড়ন দেশ ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে; তবে নারীজাগরণের গোড়ায় আলোড়ন থাকা চাই-ই। একটি কথা ভারতবর্ষের নারীজাগরণ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার। আমরা জানি ভারতবর্ষে এখনও সংরক্ষণশীল সনাতনপন্থীর সংখ্যাই অধিক। সমাজে যাঁরা মাথাওয়ালা লোক তাঁদের ভিতর গোঁড়া ধর্মধ্বজীরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

সমাজের এইসব তথাকথিত চাঁইরা চান না যে সমাজের বর্তমান কাঠামোর এতটুকু নড়চড় হোক। দেখা যায়, কোনরূপ সামাজিক পরিবর্তনের কথা উঠলে এঁরা ছলেবলে সেই পরিবর্তনপ্রচেষ্টাকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। আর নারীজাগরণের নামে তো এঁদের প্রায় মূর্ছা যাবার যোগাড়। কী ভাবে পদাধিকার ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে এঁরা পরিবর্তনকে রোধ করবার চেষ্টা করেন হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধাচরণের নমুনার মধ্যে তার খানিকটা আভাস পাওয়া গিয়েছিল। এইসব ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে কি করে ভারতবর্ষে নারীজাগরণ সম্ভব হল? আদর্শবাদী তরুণ-তরুণীরা কি ভাবে সংরক্ষণকামীদের সঙ্ঘবদ্ধ পরিবর্তনবিমুখতাকে পরাস্ত করল? এর উত্তরে এই বলা যায় যে, নারীর স্বাধীনতার সংস্কার ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত আছে। তা যদি না হত তা হলে ভারতীয় নারীজাগরণের পথ এত সহজ হতে পারত না, পদে পদে সেই পথে বাধা জড়িয়ে থাকত। এ দেশের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে আব্রুর সংস্কার খুব প্রবল নয়; স্ত্রীপুরুষের সহজ মেলামেশাকে তারা খুব দোষাবহ বলে মনে করে না। নিম্নমধ্যবিত্ত ও সাধারণ মধ্যবিত্তদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে যেটুকু বিরুদ্ধতা আছে, সেই সংস্কারের মূলও খুব গভীরে প্রোথিত নয়। অত্যন্ত ক্ষীণ, নিষ্ফল প্রতিবাদ জানানো পর্যন্ত সেই বিরুদ্ধতার দৌড়; স্বাধীনতার প্রবল ইচ্ছার নিকট সেই বাধানিষেধ বরাবর শোচনীয়ভাবে হার মেনেছে। প্রথমে খানিকটা নিস্তেজ আপত্তি জানিয়ে শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত অবস্থাকে স্বীকার করে নিতে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিভাবকদের কখনও সঙ্কোচ করতে দেখা যায় নি—সহজেই তাঁরা বিরুদ্ধাচরণের গ্লানি মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন। কংগ্রেসের আন্দোলনগুলিতে যত নারী যোগদান করেছেন তাঁদের অধিকাংশ সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, এটা বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন।

স্ত্রী-স্বাধীনতার সক্রিয় বিরুদ্ধতাটুকু এসেছে উচ্চশ্রেণীর কাছ থেকে; নারীর অগ্রসরকামনাকে ব্যাহত করতে তারা চেষ্টার ত্রুটি করে নি। এ দেশের অভিজাত সমাজে আমরা যে নারীস্বাধীনতা দেখতে পাই তা যথার্থ স্বাধীনতাপদবাচ্য নয়; তা উচ্চতর জীবনযাপনপদ্ধতির একটা অভিব্যক্তিমাত্র। যেখানে জীবনযাত্রার মান উচ্চ সেখানে

নারীর যদৃচ্ছাবিচরণের স্পৃহাকে একটু আলগা না দিয়ে উপায় নেই, তাই বলে তাকে স্বাধীনতা বলে ভুল করা চলে না। নিউ এম্পায়ারে নাচের 'শো'র তদারকি করতে পারা অথবা একা একা নিউ মার্কেটে গিয়ে 'শপিং' করে আসতে পারাটাই যদি স্বাধীনতা হত তা হলে আর কথা ছিল না। ক্লাবের বার্ষিক ভোজসভায় এককালীন ছোটলাটবাহাদুরের সঙ্গে করমর্দন করতে পারাটাও স্বামীর 'সার' উপাধি সূত্রে পাওয়া 'লেডী' অমুকের পক্ষে স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতার জাতই আলাদা। দেখা গেছে নারীস্বাধীনতাকে একটা নীতি হিসেবে স্বীকার করবার প্রশ্নে অভিজাত সমাজের চাঁইরা একযোগে সব বেঁকে বসেছেন। তাঁদের অজুহাত এই যে, এতে করে সনাতন ধর্মীয় সংস্কারের উপর আঘাত হানা হয়, মনুর বিধান অস্বীকার করা হয়, সুতরাং নারীস্বাধীনতাকে কিছুতেই স্বীকার করা চলতে পারে না। কিন্তু পুরাতনের প্রতি যখন এঁদের এত দরদ তখন এঁরা বৈদিক যুগের নারীদের মুক্ত অবস্থা বিস্মৃত হয়ে বহুপরবর্তী অন্ধকার যুগটাকে কেন নজীর হিসেবে খাড়া করেন তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। নারীস্বাধীনতামূলক হিন্দু কোড বিলের যাঁরা বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তাঁদের বেশীর ভাগই যে উচ্চশ্রেণী-সম্ভূত, এটা নিতান্ত আকস্মিক ঘটনা নয়। স্থিতাবস্থা থেকে যাঁরা সব রকমের সুযোগসুবিধা ভোগ করছেন, পরিবর্তনের নামে তাঁরা আঁৎকে উঠবেন এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তবে সমাজগঠনের প্রশ্নে ধর্মকে কেন এঁরা হেঁচড়ে টেনে আনেন সেইটেই শুধু বোঝা যায় না। বিশিষ্ট ব্যবহার-জীবী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত রাও বিলের উপর সুলিখিত কয়েকটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, আইন বিধিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে ধর্মের প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু বিরোধী যুক্তির তূণীর থেকে ধর্মের বাণটুকু খসে পড়লে যে মোক্ষম অস্ত্রটিই হাতছাড়া হল! ধর্মমোহ কি অত সহজে ত্যাগ করা যায়?

যাক, যা বলছিলাম। ভারতের ইতিহাসে নারীস্বাধীনতার ঐতিহ্য আছে বলেই এ দেশে নারীস্বাধীনতার আন্দোলন অগ্রসর হতে পেরেছে। এবং আশা করা যায়, ভবিষ্যতে আরও অগ্রসর হবে। ইংলণ্ডে নারীসমাজের মধ্যে যে স্বাধীনতা চোখে পড়ে তার বাইরের চটক দেখে অনেকে বিভ্রান্ত হন। আসলে তার কিছুটা মেকী। সে দেশে একদিন সাফ্রাজিস্ট আন্দোলন যে ভাবে আরম্ভ হয়েছিল তার মূল প্রেরণাটাই ছিল কৃত্রিম। সরকারী গৃহের জানালার কাঁচ ভেঙে ইংলণ্ডের মেয়েরা সোরগোল বাধিয়েছেন

যথেষ্ট এবং পরিণামে ভোটাধিকারও অর্জন করেছেন; কিন্তু সেই ভোট-দানের অধিকারকে এঁরা কী ভাবে প্রয়োগ করেছেন? বার্নার্ড শ' লিখেছেন, ভোট দেবার বেলা মেয়েরা দলীয় নীতি বিসর্জন দিয়ে, দলের হোক বেদলের হোক সুন্দর মুখকেই জয়যুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে। শিক্ষায় অনগ্রসরতাই যে এই অবস্থার জন্য দায়ী সেটা বোঝা যায়। কিন্তু ভারতীয় নারী শিক্ষায় যত অনগ্রসরই হোন তাঁর দ্বারা এমন আত্ম-অবমাননাকর সৌন্দর্য-উপাসনা যে কখনও সম্ভব হত না এ কথা জোর করে বলা যায়।

তাই বলে ভারতীয় নারী স্বাধীনতা অর্জনের পথে যতটুকু অগ্রসর হয়েছেন তা নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা চলে না। এখনও তাঁকে এই পথে বহুদূর অগ্রসর হতে হবে। স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার ক্ষেত্রে কৃত্রিম ব্যবধান এখনও প্রাচীরের মত খাড়া হয়ে আছে। সেই প্রাচীর সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় নারী যথার্থ স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়েছেন এ কথা বলা যায় না।

মেলামেশার স্বল্পতা কিংবা অভাব উভয় দিক থেকেই ক্ষতিকর। যেমন নারীর পক্ষে তেমনি পুরুষের পক্ষেও এ জিনিস সমান আত্মক্ষয়কারী। এ সম্পর্কে বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করা বৃথা; কুসংস্কার ও অহেতুক সঙ্কোচ পরিহার করে সমস্যাটির মুখোমুখি দাঁড়ানোটাই হল কাজের কথা। স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার নামে যাঁরা আঁৎকে ওঠেন তাঁরা যে উচ্ছৃঙ্খলতার আশঙ্কাতেই ওই রকম করেন তা বেশ বোঝা যায়। আশঙ্কাটি অমূলক নয় তাও স্বীকার্য। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা কি অবদমনের ক্ষতির চেয়েও মারাত্মক? উচ্ছৃঙ্খলতা আর অমিতাচার হয়ত এখানে সেখানে কিছু সমস্যার জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু অবদমন যে সমগ্রভাবে একটা জাতিকে পিষে মারার ক্ষমতা রাখে সেই শোচনীয় সম্ভাব্যতাটা কেউ চিন্তা করে দেখেছেন কি? নারীপুরুষের সন্নিধিমাত্রই ভয়ের কারণ নয়, তার সুবিধাগুলিও এই সূত্রে চিন্তা করা দরকার। স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক সাহচর্যে পরস্পরের ব্যবহারে স্নিগ্ধতা আসে, বর্বরতার রুক্ষ ধারগুলি ক্ষয়ে যায়, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আচরণে শালীনতা ও সৌজন্য বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে, অবদমন মানুষকে ভিতর ভিতরে ক্ষয় করে ফেলে। বিশীর্ণ দেহ, কোটরগত চক্ষু, তোবড়ান গালের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সত্যই প্রতিভাত হবে যে কোন না, কোন ভাবে অবদমনের ট্রাজিডি এর সঙ্গে জড়িত আছে। অবদমন বলতে আমি আক্ষরিক অর্থে জৈব অতৃপ্তিকে বোঝাচ্ছি না, স্ত্রীপুরুষের সাহচর্যের অভাবজাত শূন্যতাবোধকেই আমি ব্যাপক ভাবে অবদমন অর্থে ব্যবহার করেছি। এই শূন্যতাবোধ এযাবৎ জাতির পক্ষে কী মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়েছে তা বিশদভাবে বলে বোঝাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

মনুর কঠোর অনুশাসন, মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীসুলভ পরিহারনীতি কিংবা পর্দার ঘেরাটোপের ভিতর নারীকে অসূর্যম্পশ্যা করে রাখবার নিষ্ঠুর প্রথা—এর প্রত্যেকটিই এ যুগে সম্পূর্ণ অচল। যুগ বদলেছে সেই সঙ্গে মনোভাবেরও বদল হয়েছে। পুরনো যুগের অসুন্দর আদর্শকে এখন আর আঁকড়ে থাকবার কোন অর্থ হয় না।

নারীর অধিকারের প্রশ্নে স্বভাবতঃই বিবাহের প্রশ্ন আসে। পণপ্রথার কুফল নিয়ে এ পর্যন্ত সংবাদপত্রে, বক্তৃতামঞ্চে ও ঘরোয়া বৈঠকে যথেষ্ট আলোচনা হতে দেখেছি, কিন্তু বিবাহের আরেকটি দিক—এবং তা সমান গুরুত্বপূর্ণ—এর কুফলের প্রতি এখনও জনসাধারণের দৃষ্টি তেমন ভাবে আকৃষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না। আমি অভিভাবকদের দ্বারা স্থিরীকৃত বিবাহের কথা বলছি। এই হৃদয়হীন সনাতন প্রথাটি আমাদের দেশে এখনও যে টিকে আছে তার কারণ এই যে, স্ত্রীপুরুষের সহজ মেলামেশার অধিকার এখনও এ দেশে বাস্তবসত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, এমন কি নীতিরূপেও তা স্বীকৃত হয়েছে কিনা সন্দেহ। স্ত্রীপুরুষের মেলামেশার ক্ষেত্র যেখানে এমন সঙ্কুচিত সে স্থলে নির্বাচনের দায়িত্ব যে অপরে লুফে নেবে এত সাদাসিধা কথা। মেলামেশার ক্ষেত্র যদি আশানুরূপ প্রশস্ত হত ত বরকন্যার পক্ষ হয়ে অভিভাবকদের আর এমন অনাবশ্যক মাথা ঘামাতে হত না—ছেলেমেয়েরা নিজেরাই নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ স্থির করতে পারত। আমাদের দেশে ছেলেতে মেয়েতে বিবাহ হয় না, বিবাহ হয় এক পরিবারের সঙ্গে আরেক পরিবারের—সুপরিচিত কোনও এক আধুনিক লেখকের এই মতটি নিতান্ত কথার কথা নয়; এ দেশের অধিকাংশ বিয়ের ভিতরকার ব্যাপার সত্যিই তাই। পণপ্রথার সমস্যা বাস্তবিক বহু পরিমাণে সহজ হয়ে যেত যদি পূর্বপরিচয়ের সূত্রে ছেলেমেয়েরা নিজেদের পছন্দানুযায়ী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত। ছেলেমেয়েতে মেলামেশার ক্ষেত্র নিতান্ত

সীমাবদ্ধ বলেই আজও পুত্রকন্যার বিবাহের নামে অভিভাবকেরা দরকষাকষি করবার সুযোগ পান। কথাটা অদ্ভুত হলেও সত্য, এ দেশে এমন সব ছেলেও আছে যারা মা বোন কিংবা এমনি ধারা নিকট আত্মীয়া ছাড়া কখনও কোন মেয়ের সংস্পর্শে আসে নি। এদের ব্যক্তিত্ব যে নিতান্ত অপরিণত সে কথা আশা করি না বললেও চলে। কাজেই এই সব ছেলের বিয়ের প্রশ্ন যখন ওঠে, তাদের অভিভাবকেরা যে আগে থাকতেই কন্যাপক্ষ থেকে দাঁও মারবার আশায় পাঁয়তারা কষতে আরম্ভ করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি! পণপ্রথা দূর করবার প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় হল নারীপুরুষের সহজ-সুস্থ সাহচর্যের অধিকার স্বীকার করা। তাই বলে সহশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে ধরনের সাহচর্য খয়রাত করা হয় সে জাতীয় দ্বিধাযুক্ত, কুণ্ঠিত সাহচর্য নয়; বলিষ্ঠ, দৃপ্ত, সুস্থ সাহচর্য।

অভিভাবকশাসিত বিবাহের আরেকটি কুফল এই প্রসঙ্গে বিচার্য। যেভাবে এদেশে বিবাহ স্থিরীকৃত হয় তাতে মনে হয় নারীপুরুষের প্রকৃতিদত্ত আবয়বিক পার্থক্যটাই সেখানে একমাত্র বিবেচনার বিষয়; আর যেন কিছু বিবেচ্য নেই। ভাবটা এই, স্ত্রীপুরুষ একজোড়া ধরে এনে জোড় মিলিয়ে দিলেই হল। যেন বিবাহরূপ মিলনটিরই মাত্র অপেক্ষা, তারপর বাকী কাজটুকুর ভার প্রাকৃতিক নিয়মের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। যে ছেলে যে মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়ে অন্ধকারে ঝাঁপ দিচ্ছে তাদের দুজনার মধ্যে স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণ জন্মাতে পারে, নাও জন্মাতে পারে। এখানে রুচিসঙ্গতির প্রশ্ন একটা মস্ত বড় সমস্যা। অভিভাবকশাসিত বিবাহে এই অনিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে আগে থেকে কিছুই জানার উপায় থাকে না। ফলে কত বিবাহ যে ব্যর্থ হয় তার আর সীমাসংখ্যা নেই। এই প্রসঙ্গে একজন আধুনিক ভারতীয় লেখকের আত্মজীবনীমূলক বই থেকে খানিকটা এখানে তুলে দিচ্ছি: "In this mad rush to produce ideal marriage and stud children, one fact is often overlooked. Do these two young people who are about to join in holy matrimony feel any physical attraction towards each other? No one can make two people happy who do not feel a mutual sex-attraction." [I Go Wast D. F. Karaka]

অর্থাৎ, আদর্শ বিবাহ ও সন্তান উৎপাদনের অশোভন ব্যস্ততায়

একটি সত্য প্রায়ই কারও চোখে পড়ে না। সেটি এই, পবিত্রবিবাহসূত্রে এই যে দুটি তরুণতরুণী আবদ্ধ হতে যাচ্ছে তারা একে অপরের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে কি? পরস্পরের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব না করলে তাদের কেউ সুখী করতে পারে না।

নারীপ্রগতির মূল ভিত্তি হল তিনটি—শিক্ষা, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সহজ সাহচর্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। এর মধ্যে শেষোক্তটিকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলা চলে। বস্তুতঃ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যতদিন না পূর্ণাংশে নারীর অধিগত হবে ততদিন কোনকিছুই কিছু নয়; আর্থিক ক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা ও যদৃচ্ছা বিচরণের স্বাধীনতারও কোন অর্থ হয় না। আর্থিক স্বাধীনতা বলতে স্বীয় উপার্জনের ক্ষমতা ত বোঝায় নিশ্চয়ই, সেই সঙ্গে অর্জিত অর্থ যদৃচ্ছা ব্যয় করবার ক্ষমতাও বোঝায়। এই দ্বিবিধ ক্ষমতা নারী যখন নিজের করায়ত্ত করতে পারবেন তখনই মাত্র তিনি প্রকৃত স্বাধীন হয়েছেন বলা যেতে পারে। হিন্দু কোড বিলে নারীকে সম্পত্তিতে ভাগ দেওয়ার প্রস্তাবে একশ্রেণীর লোক ক্ষেপে গিয়ে কাণ্ড-কারখানা বাধিয়ে তুলেছিল। বর্তমান সামাজিক অবস্থায় স্ত্রীর অর্থের অধিকার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কার্যতঃ স্বামীর উপরই বর্তায়, এই সুবিধাটুকু সত্ত্বে বিরুদ্ধবাদীদের সোরগোলের অন্ত নেই! আর যদি নারী নিজের সম্পত্তি ও অর্থ নিজে স্বাধীন ভাবে ভোগ করতে পারতেন তা হলে বুঝি বা প্রতি-বাদীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ত! সে যাই হোক, আর্থিক ক্ষেত্রে নারী যতদিন না নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছেন ততদিন সমাজে তাঁর পরিপূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে না, তাঁর আত্মবিকাশও সেই কারণে ব্যাহত হতে বাধ্য।

নারীর আর্থিক স্বাধীনতা পরোক্ষতঃ পুরুষের পক্ষেও মঙ্গলদায়ক। কেন না, নারীকে প্রকৃত শ্রদ্ধা ও সম্মান কখনও আমরা করতে পারব না, যতদিন আমরা তাঁদের আমাদের আর্থিক নিগড়ে বেঁধে রাখব। নারীকে তাঁর পরিপূর্ণ মর্যাদা দিতে হলে তাঁকে পুরুষের আর্থিক অধীনতা থেকে মুক্তি দেওয়া দরকার। আর স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সত্যকার প্রেম তখুনি জন্মানো সম্ভব, যখন আর্থিক ক্ষেত্রে কাউকে কারও অধীন হতে হবে না—দুজনে যে যার ক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বাধীন হবে। এ যাবৎ মেয়েরা স্বামীর দেওয়া খাওয়া-পরার দাম চুকিয়েছেন সতীত্ব দিয়ে; ভালবাসাটা যেন পাওনাদেনার সামগ্রী;

ভাবখানা এই। কিন্তু কেউ যখন কারও আর্থিক তাঁবে থাকবে না, তখন এই দেনাপাওনার সম্পর্ক যাবে ঘুচে; পরিপূর্ণ, সুস্থ ও স্বতস্ফূর্ত মিলনের মধ্য দিয়ে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। আর্থিক কিংবা অন্যবিধ যে কোন রকমের অধীনতাই হোক, পরবশতা মানুষের মনে কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, সৃষ্টি করে ক্ষুদ্রতাবোধের—সেই অবাঞ্ছিত মানসকুটের হাত থেকে নারীর রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হল সর্বক্ষেত্রে তাঁর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা।

৫ ॥

বছর কয় আগে 'স্টেট্স্ম্যান' পত্রিকার 'চিঠিপত্র' স্তম্ভে জীবনযাত্রার ব্যয়সঙ্কুলান সম্পর্কে একাদিক্রমে কয়েকদিন অনেকগুলি চিঠি ছাপা হয়েছিল। পত্রলেখকদের অধিকাংশ ইংরেজ—এবং ভারতবর্ষের দৌলতে সকলেই মোটা মাইনের চাকুরে। "ব্রিটানিয়া" নামক জনৈক ছদ্মনামধারী ইংরেজের আক্ষেপোক্তি দিয়ে এই পত্রবিতর্কের শুরু। তিনি সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে পত্রিকার মারফৎ দয়া করে জানিয়েছিলেন যে, তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং একটিমাত্র শিশুর জন্যে তাঁর মাসিক খরচ হয় ১৬৩০ টাকা থেকে ১৮৫০ টাকার মধ্যে (পোশাকের খরচ বাদ দিয়ে এই হিসাব ধরা হয়েছে), তবু নাকি ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক ছোটখাট স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর নাগালের বাইরে থেকে যায়। ("an extremely modest standard of living, without many of the small comforts needed in a tropical climate")! "So What" নামধারী আরেকজন ইংরেজ এবং তাঁর সমধর্মী অন্যান্য আরও কয়েকজন স্বজাতীয় ভদ্রলোক জানিয়েছেন, একহাজার থেকে দেড়হাজার টাকার মধ্যে তাঁরা সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন বটে, কিন্তু এই স্বল্পব্যয়ে সংসার চালাতে তাঁদের রীতিমত বেগ পেতে হয়।

ভাবুন একবার ব্যাপারখানা! যে দেশে এমন সহস্র সহস্র পরিবার রয়েছে যাদের মাত্র ষাট-সত্তর টাকা (কি অনুরূপ কোন মুদ্রাসংখ্যা) মাসিক

আয় দিয়ে একটা গোটা সংসার প্রতিপালন করতে হয়, ওই নামমাত্র রোজগারে মেরেকেটে গড়ে অন্ততঃ পাঁচ সাতজন লোকের অন্নবস্ত্র ও আনুষঙ্গিক বহুবিধ খরচের সংস্থান করতে হয়, সেই দেশেরই বুকের উপর পা দিয়ে এঁরা বলছেন কি না সাড়ে আঠারো শো টাকা তিনজন প্রাণীর খরচের পক্ষে যথেষ্ট নয়, কি না দেড়হাজার টাকায় সংসার খরচ কুলিয়ে ওঠা শক্ত। ব্যাপারটা যতই ভাবা যায় ততই ইউরোপীয় আর ভারতবাসীর আয়ের তারতম্যের আসল চেহারাটা হৃদয়ঙ্গম করে শিউরে উঠতে হয়!

ইংরেজ এ দেশে এসে ভাল থাকে ভাল খায় ভাল পরে এ কথা আমরা সবাই জানি এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত এতকাল ভারতের টাকাতেই যে ইংরেজ এই বাবুগিরি করেছে তাও আমাদের অজানা নয়। কিন্তু সেই ঘটনাটাকেই যখন টাকা আনার হিসাবের মধ্যে দিয়ে সর্বসাধারণের চোখে তুলে ধরা হয় এবং তুলে ধরে বলা হয় যে, দেখ, অত টাকাতেও আমাদের কুলোচ্ছে না, আমাদের আরও চাই—তখন সেই খাঁকতিকে নির্লজ্জতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ছাড়া আর কী বলা যায়! 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার "অকুণ্ঠ সৌজন্যের সুযোগ" গ্রহণ করার আগে—ওই ইংরেজ-পুঙ্গবরা কি একবারও এ কথা ভেবেছেন যে তাঁদের ওই ঘোষণায় সাধারণ ভারতবাসীর মনে কী ভয়ানক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে! ভারতবাসী গরীব, কম খাওয়া কম পরা ভারতবাসীর অদৃষ্টে লেখা আছে এটা যেন আমরা একটা অপরিবর্তনীয় বিধানের মত মেনে নিয়েছি। নইলে ভারতবর্ষের বুকের উপর দাঁড়িয়ে কোন পত্রিকায় এই ধরনের বিবৃতি দেওয়ার আগে যে কোন বিবেকবান ইংরেজ অন্ততঃ পাঁচবার আগুপাছু চিন্তা করতেন! অবশ্য দু'একজন পাদ্রীগোছের ভাল মানুষ "ব্রিটানিয়া"র উক্তির প্রতিবাদ করে ভারতের ন্যায় গরীব দেশে তাঁকে আরও একটু রয়ে সয়ে খরচ করতে উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা নিজেদের খরচের যে অঙ্ক দিয়েছেন তাও পাঁচ শো টাকার নীচে নয়! একটি ইংরেজ পরিবারের খরচ সঙ্কুলানের পক্ষে পাঁচ শো টাকা যত সামান্যই হোক, অন্ততঃ শতকরা পঁচানব্বুই জন ভারতবাসীর কাছে এই সংখ্যাটা আজও প্রায় আকাশকুসুমের তুল্য! এই অবস্থায় পাদ্রীমহোদয়েরা যত সদুদ্দেশ্য নিয়েই ব্রিটানিয়ার পত্রের প্রতিবাদ করুন না কেন, তাঁদের

বিবৃতিতে সাধারণ ভারতবাসীর শোচনীয় আর্থিক দুর্গতির কলঙ্কটাই যেন আবার নতুন করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যখনই কোন একটা জাতির বা সম্প্রদায়ের বা কোন একটা শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান নির্ধারণের প্রশ্ন ওঠে তখন অনেককে প্রায়ই এই বাঁধা যুক্তি আওড়াতে শুনি যে, অমুক জাতি বা অমুক শ্রেণী যেহেতু একটা নির্দিষ্ট জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত, কাজেই অমুকের ক্ষেত্রে ওই মানটি বজায় রাখতেই হবে, কিংবা অমুকের বেলায় ওই মান বাড়ানো চলবে না, বাড়াতে গেলে দেশের আর্থিক বনিয়াদ ধ্বসে পড়বে। অর্থাৎ কথাটা স্পষ্ট বললে দাঁড়ায় এই যে, ইংরেজ বা আমেরিকান যে জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত তাকে সেই জীবনযাত্রার মান বজায় রাখবার সুযোগ দিতে হবে, আর ভারতবাসী যে জীবন-যাত্রার মানে অভ্যস্ত তাকে সেই মানের নিকট-সীমার মধ্যে আটকে রাখতে হবে ; কেন না হঠাৎ তার জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে গেলে ভারতের আর্থিক সংস্থিতি তছনছ হয়ে যাবার আশঙ্কা !

এই যুক্তিটি আমি ঠিক বুঝতে পারি নে। ইংরেজ একটা নির্দিষ্ট মানে অনেক দিন থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেছে বলেই তার সেই মান চিরকাল বজায় রাখতে হবে এমন কী কথা আছে ! আর ভারতবাসী অনেক দিন ধরে অল্প খেয়ে অল্প পরে বেঁচে আছে বলে তাকে সেই জীবনযাত্রার কোঠাতেই জোর করে আটকে রাখতে হবে তারই বা কী কথা ! অথচ উভয়ের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণের বেলায় এই নিতান্ত শূন্যগর্ভ যুক্তিটিকেই প্রয়োগ করা হয়। একদা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে গোরা আর ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে বেতনের যে দুস্তর পার্থক্য দেখা যেত সেই পার্থক্যটুকু এই যুক্তির ভিত্তিতেই করা হয়েছিল। সরকারী চাকুরীতে যখন ভারতীয় আর ইংরেজ কর্মচারীর মধ্যে মাহিনা ও অন্যান্য ভাতার ক্ষেত্রে অন্যায় ভেদরেখা টানা হত সে এই যুক্তিতেই টানা হত যে, ইংরেজ ভাল খেয়ে ভাল পরে অভ্যস্ত কাজেই তাকে সেই সুযোগ না দিলেই নয়, আর যেহেতু ভারতবাসী কম খেয়ে কম পরেই মানুষ, সেইহেতু তার মাহিনা কম হারে নির্দেশ করলে কোনদিক থেকেই আপত্তি হবার কথা নয়, কেন না ওই কম হারেই তার চলে অভ্যাস, চলা উচিত !

এটা অদ্ভুত যুক্তি সন্দেহ নেই ! যে যেই জীবনযাত্রার মান নিয়ে

বেঁচে আছে তা যেন তার বিধিলিপি। কোন দিক থেকেই যেন তার নড়চড় হবার উপায় নেই। ভাবখানি এই যে, তোমার অদৃষ্টদেবতা যখন তোমাকে এই ভাবে চলতে ফিরতে খেতে শুতে শিখিয়েছেন তখন তোমার ওই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর যে ব্যক্তি ভাল খেয়ে ভাল পরে বেঁচে আছে তাকেও তোমার হিংসে করা উচিত নয়, কেন না সে তোমার চাইতে ভাল খাবে ভাল পরবে ভাল থাকবে এটাও অদৃষ্ট-আরোপিত বিধান। কী চমৎকার যুক্তি! অথচ এ কথা আমরা একবারও খোঁজ করি না এই ভাল খাওয়া ভাল থাকা মন্দ খাওয়া মন্দ থাকার পিছনকার ইতিহাসটা কী?

ইংরেজ চিরদিন কিছু আর ভাল খেয়ে ভাল পরে মানুষ হয় নি। তার বর্তমান উচ্চ জীবনযাত্রাপদ্ধতির সঙ্গে যে তার সাম্রাজ্যবিস্তারের ইতিহাসের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ এ কথা কে না জানে? ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যে ইংরেজ চামচিকে ছিল, কোম্পানীর লুটের মালে ভাগ বসিয়ে সে ইংরেজ ফুলে ফেঁপে বাদুড় হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশের ধনরত্ন ছেঁচে শ্বেতদ্বীপে নিয়ে গিয়েছিল বলেই অধুনা শ্বেতদ্বীপ-বাসীর পরিবারপিছু সাড়ে আঠারো শো টাকায়ও ভাল করে সংসার-খরচ চলতে চায় না। ভারতের ক্রমবর্ধমান-দারিদ্র্যের ভিত্তির উপর ইংলণ্ডের বিলাস-সৌধ উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে এ কথা কথার কথা মাত্র নয়, রূঢ় ঐতিহাসিক সত্য। ভারতবাসীর অবস্থা চিরকাল এরূপ ছিল না। আজ দু বেলা দু মুঠো অন্নের জন্যে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী মর্মভেদী চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করছে; না খেতে পেয়ে প্রকাশ্য রাজপথের উপর ঠাস করে পড়ে যাচ্ছে, পড়ে আর উঠছে না; বস্ত্রাভাবে নারী রাস্তায় চলতে গিয়ে হয় অর্ধ-উন্মাদিনীর ভান করছে নয়তো শরৎচন্দ্রের "মহেশ" গল্পের ভাষা অনুযায়ী 'পথিকের করুণার উপর নির্ভর করে' অত্যন্ত জড়সড় সঙ্কুচিতভাবে রাস্তার গা ঘেঁসে চলছে; অনৈশ্চিত্য আর লক্ষ্যহীনতার স্রোতে ভেসে আসা সহস্র সহস্র নিরাশ্রয় মানুষের দল রৌদ্রবৃষ্টিঝরা আকাশের নীচেই ঠাঁই নিচ্ছে, কিছুদিন বেঁচে রইছে তারপর মরছে।

কিন্তু ভারতবাসীর অবস্থা অন্ততঃ দুশো বৎসর আগেও এরূপ ছিল না। বহুলব্যবহৃত হয়ে কথাটার ধার ক্ষয়ে গেলেও তা খুবই সত্য যে, তখন লোকের গোলাভরা ধান ছিল, পরবার বস্ত্র ছিল, থাকবার ও ভোগ করবার মত দু'দশ

বিঘে জমি প্রত্যেকেরই ছিল, আজকের মত দু'মুঠো চাউলের জন্যে কাউকে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতে হত না—তখনকার মাপকাঠিতে যারা দীনদরিদ্র তাদেরও নয়। ভারতবাসীর জীবনযাত্রায় বাহুল্য ছিল না, আড়ম্বর ছিল না এ কথা হয়ত ঠিক, 'Plain living and high thinking'ই হয়ত তার আদর্শ ছিল, কিন্তু তাই বলে সে একেবারেই ভোগসুখপরাঙ্মুখ ছিল এ কথাও ঠিক নয়। তদানীন্তন কৃষি-সংস্কৃতিজাত স্বল্পোপকরণ জীবনযাত্রার মধ্যেই ভারতবাসী সাধ্যমত তার ভোগসুখ চরিতার্থ করতে শিখেছিল।' আজ সেই ভারতবাসীরই কিনা না-অন্ন না-বস্ত্র অবস্থা। তার চাইতেও যেটা শোচনীয়, আমরা বর্তমানের এই কৃত্রিম অবস্থাটাকেই কিনা ভারতবাসীর সনাতন অবস্থা বলে মেনে নিতে শিখেছি; আর তারই ফলে ভারতবাসীর দৈনিক আয় ছয় পয়সা থেকে এক টাকায় (ধরা যাক) উন্নীত করবার প্রস্তাব উঠলেই সবাই হা হা করে ওঠেন: সর্বনাশ, এত ভার ভারতবর্ষের সনাতন অর্থনীতিতে সইবে না, এই দ্রুত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে সব ছত্রখান হয়ে যাবে, কিছুই টিকবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যকে আর দোষ দেব কী, নিজেরাই আমরা সর্বব্যাপারে নিজেদের খাট করে রেখেছি; এমন একটা জীবনযাত্রার মানের শিকলি দিয়ে নিজেরা নিজেদের পা বেঁধে রেখেছি যে সেই নির্দিষ্ট খাঁচার চৌহদ্দির মধ্যেই আমাদের সমস্ত চলাফেরা ব্যবস্থিত, সমস্ত খাওয়া-শোওয়া নিয়ন্ত্রিত। বিদেশী কিংবা এদেশী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী যখন শহরের সেরা অঞ্চলটিতে প্রাসাদোপম অট্টালিকার চারিধারে বাগান আর টেনিস লন আর মোটরগাড়ী আর অজস্র স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণের মধ্যে মাত্র দুটি প্রাণীতে 'কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে' বহাল তবিয়তে বাস করেন, তাকে আমাদের মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। ভাবি এই তাঁদের যোগ্য জীবনযাত্রার মান, এই তাঁদের পাওনা। আর তার উল্টোপিঠে, পাথুরেঘাটার একটা নোংরা স্যাঁতসেঁতে ভাঙা বাড়ির নীচের তলার অন্ধ কুঠরীতে গাদাগাদি হয়ে একটা গোটা পরিবার কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে যখন ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে থাকে, ভাবি এইটেই সাধারণ মানুষের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা, এতে আশ্চর্য হবার যেমন কিছু নেই প্রতিবাদ করবারও কিছু নেই। এই বৈষম্যকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবার ফলেই অন্যায় অবিচার শোষণ এমন স্তূপীকৃত, এমন প্রতিকারহীন হয়ে উঠেছে। বীভারিজ পরিকল্পনায়

ইংরেজের জীবনযাত্রার মান আরও বাড়াবার প্রস্তাব আমাদের চোখে খারাপ লাগে না, কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কিংবা অন্যান্য জাতীয় পরিকল্পনায় যখন ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান বাড়াবার প্রস্তাব হয় তখন সেটাকে অনেকেরই বৈপ্লবিক বলে মনে হয়। এমন কি অর্থনীতির প্রাথমিক সূত্রের দোহাই দিয়েও কাউকে বোঝান চলে না যে জীবনযাত্রার মান আমাদের আরও উঁচু হওয়াই উচিত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যতদিন পর্যন্ত না জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে অল্পবিস্তর সকলেরই প্রতি, সমানভাবে প্রযোজ্য একটা সমান মাপের জীবনযাত্রার মান নির্দিষ্ট হচ্ছে ততদিন অন্যায় বৈষম্যও ঘুচবে না, দেশে দেশে শান্তিও ফিরে আসবে না। সমস্ত রকম অনর্থেরই মূল আর্থিক বৈষম্য—সেই আর্থিক বৈষম্যের ট্র্যাজিডি সর্বাগ্রে মোচন করা দরকার। ইংরেজ কিংবা আমেরিকানের অত্যুচ্চ জীবনযাত্রার অভ্যাস কিছু তাদের সহজাত নয়, অপরাপর জাতির শোষণের ভিত্তির উপর তার স্থিতি। অগণিত মানুষ ভাল খেতে পরতে পারছে না বলেই তাঁরা ভাল খেতে পরতে পারছে; অনেকে ভাঙা বাড়িতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বলেই তারা মৌরসিপাট্টায় প্রাসাদসদৃশ অট্টালিকায় পায়ের উপর পা তুলে বাস করছে; শোষিত দেশ-গুলির অগণিত লোককে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় লজ্জা নিবারণ করতে হচ্ছে বলেই তাদের পোশাকের ঠাটঠমকের আর অন্ত নেই, পরিচ্ছদের নিত্যনতুন প্যাটার্নের ছবিতে খবরের কাগজের 'ফ্যাসান' কলম ক্রমাগত ভরে উঠছে; ডাঁটাচচ্চড়ি কিংবা এম্নিজাতীয় খাবার খেয়ে (কিংবা তাও না খেয়ে) কোটি কোটি মানুষকে কালাতিপাত করতে হচ্ছে বলেই তাঁরা ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ-ডিনারে অতিরিক্ত উদরপূর্তির চুঁয়াঢেঁকুর তুলছে। তাতেও রক্ষা নেই, রেস্তোরাঁয় আর বার-এ বসে সামান্য ড্রিঙ্কের পিছনেই হয়ত মাথাপিছু খরচ করছে এক গিনি কি তারও বেশী। এবং খোসমেজাজে 'বোয়'কে যে পয়সাটা 'টিপস' হিসেবে ধরে দিচ্ছে তাতে একটি দুঃস্থ ভারতীয় পরিবার দুদিন খেয়ে বাঁচতে পারে। সাধারণের জীবন নিরানন্দ, বৈচিত্র্যহীন বলেই তাঁদের জীবনে আমোদের উপকরণের অন্ত নেই; সামান্য লেখাপড়ার অধিকার থেকেও জনগণ বঞ্চিত বলে তাঁরা স্তূপের পর স্তূপ বই কিনে লাইব্রেরীঘর সাজাচ্ছে আর জ্ঞানের সাধনাকে দিকে দিকে বিকশিত করে তুলছে। তালিকাটাকে আরও অনেক দূর সম্প্রসারিত করা যেতে পারত, কিন্তু ইংরেজ

আর ভারতবাসীর বৈষম্যের চেহারাটা এই থেকেই আশা করি যথেষ্ট স্পষ্ট হয়েছে।

কথা হচ্ছে কেউ ভাল থাকবে কেউ মন্দ থাকবে এটা কিছু অদৃষ্ট-নিরূপিত বিধান নয়; কৃত্রিম সমাজবিধান আর কৃত্রিম সমাজব্যবস্থা থেকেই এর জন্ম। "One man's happiness depends on the sorrows of others"—তুর্গেনিভের এই কথা আমাদের সমাজবিধানের সব চাইতে কঠোর অথচ সব চাইতে সত্য বিশ্লেষণ। এই পৃথিবীর ব্যবস্থাটাই এমন অপরূপ যে এক জাতি এখানে মন্দ না থাকলে আরেক জাতি ভাল থাকতে পারে না, এক দেশ অনুন্নত না হলে আরেক দেশ উন্নত হতে পারে না।

ইংলণ্ডকে সুখভোগের জন্যে তার অধিকৃত উপনিবেশের মানুষের উপর ক্রমাগত শোষণ চালাতে হয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নির্ভর করতে হয় তার অতি সূক্ষ্ম অথচ সমান ফলপ্রদ Dollar Imperialism-এর উপর; ফরাসী কালচার আর ফরাসী শিক্ষা-সংস্কৃতি টেঁকে না যদি না ফরাসী উপনিবেশ থেকে জীবনযাত্রার স্থূল উপকরণগুলি ক্রমাগত Metropolitan France-এ বাহিত হয়ে আসে। শিক্ষার উৎকর্ষ বল, রুচির পরিশীলন বল, শিল্পের অনির্বচনীয়তা বল, সবারই মূলে সেই আদিম বর্বরতা: স্থূল জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে কে কাকে দাবিয়ে রাখতে পারছে। বর্তমান সামাজব্যবস্থাটাই এমন যে যাকে আমরা জীবনের স্থূল দিক বলি (যেমন খাওয়া পরা থাকার দিক) তার ভালমন্দের উপরই আর সমস্ত ভালমন্দ নির্ভর করছে; কাজেই এই স্থূল আরামের দিকটি নিয়ে জাতিতে জাতিতে হানাহানির আর অন্ত নেই। এই ব্যাপারে যে যাকে গায়ের জোরে দাবিয়ে রাখতে পারছে তার তত প্রতিষ্ঠা, তার তত সুনাম, তার শিল্পকলার তত জয়জয়কার। স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং নিয়েই যত গণ্ডগোল—এই নিয়েই জাতিতে জাতিতে যত বিসংবাদ আর কলহ।

শুধু জাতি কিংবা দেশের বেলাতেই যদি এই কলহ সীমাবদ্ধ থাকত তা হলেও না হয় বোঝা যেত; একটি দেশের ছোটবড়র মধ্যেও এই নিয়ে কলহের অন্ত নেই। ভারতবর্ষের কথাই ধরুন। এখানে আপিসের যিনি ম্যানেজার কিংবা সরকারের যিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারী, তিনি মাসে মাইনে নিচ্ছেন দু হাজার আড়াই হাজার টাকা করে, আর তাঁর কেরাণীরা মাসে ঊর্ধ্বপক্ষে দু শো টাকা পান ত

তাঁদের জোর বরাত। বলা হবে যোগ্যতা আর কর্মপটুতার তারতম্যের জন্তেই মাইনের এই বৈষম্য, কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা যায় কার যোগ্যতায় কতটুকু কাজ হয় সেইটে জানবার উপায় কী তা হলে আর কথা নেই। আরেকটি যুক্তি প্রায়ই এই দেওয়া হয় যে, যে ব্যক্তি মাসে দু হাজার টাকা করে বেতন নিচ্ছেন তিনি দু হাজার টাকার উপযোগী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, তার থেকে তাঁকে কম বেতন দিলে তাঁর efficiency কমে যাবে। অন্যপক্ষে যে শ্রমিক মাসে ষাট টাকার মত আয় করছেন তাঁর জীবনযাত্রার মানের অনুপাতে তিনি ভালই পাচ্ছেন বলতে হবে। ওইতেই তাঁর চলে এবং ওইতেই তাঁর সন্তুষ্ট থাকা উচিত, ইত্যাদি ইত্যাদি। সোজা কথায় এঁদের যুক্তিতে শ্রমিকের মাহিনা বৃদ্ধির দাবী যেমন অন্যায়, আপিস-কর্তার মাইনে কমানো'র প্রস্তাব করাটাও তেমনি অন্যায়। এই ত সেদিন পার্লামেন্টে জনৈক সদস্য উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারদের মাহিনা কমাবার প্রস্তাব করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সরাসরি সে প্রস্তাব বাতিল করে দেন! প্রধানমন্ত্রীরই যখন এই মনোভাব তখন অন্যে পরে কা কথা! কিন্তু জিজ্ঞেস করি, শ্রমিক খোলার ঘরে আছেন বলে তিনি পাকা দালানে কখনও থাকতে পারবেন না এটা কোন্ দেশী যুক্তি? কোন্ যুক্তি বলে যে, ছেঁড়া হাফ শার্ট আর হাফ প্যান্ট পরে তাঁকে লোকসমাজে বেরুতে হয় বলে ভাল কাপড়-চোপড়ের উপর তাঁর দাবী চিরকালের জন্যে রুদ্ধ হয়ে গেল? সমাজের উপরতলার জীবদের অনুকূলে উচ্চ জীবনযাত্রার যে দোহাই পাড়া হয় সে ত কৃত্রিম বৈষম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দাবী; সেই বৈষম্যকে সনাতন নিয়ম বলে মানতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি? শ্রমিককে আর গরীব ভদ্রলোককে চিরটা কাল কায়ক্লেশে জীবন যাপন করতে বাধ্য করিয়ে তারপর যদি তাঁদের বলা হয় তোমাদের ত এভাবে চলেই অভ্যেস, অল্পেই তোমাদের সব প্রয়োজন পূরণ হয়, সুতরাং তোমাদের পক্ষে উচ্চতর জীবনযাত্রার দাবী অন্যায়—তখন তাকে পরিহাস-রসিকতা ছাড়া আর কী বলা যায়? 'নাল্পে সুখমস্তি' কথাটা শুধু ধনীদের বেলাতেই প্রযোজ্য, কেন না ধনীরাই একমাত্র সুখভোগের অধিকারী, তাঁদের খুদকুড়ো আর প্রসাদ পেলেই ত গরীবদের যথেষ্ট! চৌরঙ্গীর প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করে বেলেঘাটার বস্তিবাসীর দৃষ্টিভঙ্গির আর যোগ্যতার উপর কটাক্ষ

করা খুবই সোজা, কিন্তু মনে রাখা দরকার যোগ্যতার প্রশ্নটা 'বিষচক্রে'র (vicious circle) মত কেবলই এক সমস্যা থেকে আর-এক সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। যোগ্যতার বা কর্মপটুতার অভাবে কেউ বস্তিবাসী হতে বাধ্য হচ্ছে না, বস্তির সর্বব্যাপী অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্যেই তার যোগ্যতার অপহ্নব ঘটছে। এবং তার ফলে সমাজের আরও নীচের তলায় সে ক্রমশঃ নেমে যাচ্ছে। জীবনযাত্রার মানের প্রশ্নের সঙ্গে কর্মক্ষমতার প্রশ্ন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ভাল থেকে ভাল খেয়ে ভাল পরে তারপর সেই নজীরে চিরন্তন কর্মপটুতার অধিকার দাবী করার মধ্যে যে প্রচণ্ড অন্যায় নিহিত আছে তা কি আমাদের সমাজপ্রধানদের কখনও চোখে পড়বে না? আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে আত্মক্ষয়কারী সংগ্রাম করে যে লোক মৃতপ্রায় হয়ে আছে তার কাছ থেকে ষোলআনা কর্মক্ষমতা আশা করা আর মুমূর্ষু ঘোড়াকে চাবকে দৌড় করান একই কথা।

'স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং,' 'স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং' কথাটায় আজকের দিনের আকাশ-বাতাস ছেয়ে গেল, তার যথার্থ তাৎপর্যটুকু আমরা বড় একটা কেউ তলিয়ে দেখছি না। জীবনযাত্রার মান কথাটা আপেক্ষিক। শুধু সমসমাজের মধ্যে বাসকারী বড় ছোটর প্রচণ্ড বৈষম্যকে ঘুচালে এই সমস্যার সমাধান হবে না, জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে স্থূল জীবনযাত্রার প্রকরণে যে প্রকাণ্ড ব্যাবধান মুখব্যাদান করে আছে তাকে সর্বাগ্রে সঙ্কুচিত করতে হবে। ভারতবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের প্রশ্নটি বিশ্লিষ্ট, অন্য-নিরপেক্ষ প্রশ্ন নয়; জগদ্‌বাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নের সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আন্তর্জাতিক সাম্যের ভিত্তিতে সকল জাতির জীবনযাত্রার মান যতদিন না একটা ন্যায়সঙ্গত সুনিরূপিত স্তরে এসে দাঁড়াচ্ছে ততদিন পৃথিবীর সাধারণ মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের প্রশ্নটি অলীক স্বপ্ন হয়েই থাকবে।

॥ ৬ ॥

সত্য, রূঢ় ও অপ্রীতিকর কথা বলার সৎসাহস যাঁদের আছে তাঁরা সব সময়ই জনসমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত ও অনাদৃত হয়ে থাকেন। সামাজিক সম্পর্কবিরহিত একক জীবন যাপন তাঁদের বিধিলিপি বললেও চলে। সত্যসন্ধ,

নির্ভীক, সদ্‌বুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তিকে গড়পরতা মানুষের দল ভয় করে চলে। ভয় করে কারণ সত্যসন্ধ ব্যক্তি স্পষ্ট কথা বলতে দ্বিধা বোধ করেন না; বিরুদ্ধ মতবাদীরা দলে ভারী হওয়া সত্ত্বেও না। শক্তির প্রাবল্য, অর্থের দম্ভ এবং সঙ্ঘবদ্ধতার অসার আস্ফালন—কোন কিছুই নির্ভীক ব্যক্তির মতের স্বাধীনতাকে দাবাতে পারে না। বিশ্বাসের জোর যাঁর আছে তিনি সেই বিশ্বাসকে সবলে আঁকড়ে ধরেই সমাজ-সংসারের পথে অগ্রসর হন। অর্থ কিংবা জনবলের ভ্রূকুটি তাঁকে সেই পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। তিনি তাঁর জ্ঞানবুদ্ধিমত যা ভাল বোঝেন তা বলেন। এই কারণে ঠোঁটকাটা মানুষকে লোকে সচরাচর ভয় করে। জনসমাজ তাঁকে এড়িয়ে চলতে পারলেই যেন বাঁচে।

হয়ত প্রশ্ন উঠবে, স্পষ্টবক্তা মানুষ অনেকের বিরুদ্ধে তাঁর একার মতটাকে যে এত জোর গলায় প্রচার করেন সেটি নির্ভুল তার নিশ্চয়তা কী? তাঁর একার মতটাই সঠিক আর সকলের মত ভুল এই আত্মতুষ্টিজাত মনোভাবের কোন স্পষ্ট প্রমাণ আছে কি? দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রমাণ হয়ত কিছু নেই, তবে এটা দেখা গেছে যে, সততাই সর্বপ্রকার নির্মল ও নির্ভুল বুদ্ধির উৎস। যিনি মনে প্রাণে সৎভাবাপন্ন ও সত্যনিষ্ঠ, তাঁর বিচারে প্রায়ই ভুল হয় না। সততাই তাঁকে ভ্রান্তি থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সযত্নে রক্ষা করে। কি আচরণগত ভ্রান্তি, কি বুদ্ধিগত ভ্রান্তি। সাধুতাই বিচারবুদ্ধির নির্ভুলতার নির্ভুলতম নিশানা।

অনেকে মিলে একটা কথা জোর গলায় বললেই তা সত্য হয় না। কিংবা মিথ্যাকে দিনের পর দিন সত্য বলে ঘোষণা করলেই তা সত্যে রূপান্তরিত হয়ে যায় না। হিটলার শেষোক্ত চেষ্টা করেছিলেন—তার পরিণাম আমরা দেখেছি। দেখতে হবে দশে মিলে যে কথাটা তারস্বরে বলা হচ্ছে তার পিছনে সদ্‌বুদ্ধি ও সদভিপ্রায়ের পোষকতা আছে কি না। তা যদি না থাকে, হাজার চেঁচালেও, হাজার গলায় চেঁচালেও সেটা মিথ্যা। চোঙার দ্বারা আওয়াজের স্ফীতি ঘটে মাত্র, আওয়াজের স্বরূপ বদলায় না। ধ্বনিবাহুল্যে মিথ্যা সত্যে রূপান্তরিত হয়ে যায় না।

এইখানেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ও মতামতের স্বাধীনতার প্রশ্ন অবধারিতভাবে এসে পড়ে। আমি যদি প্রত্যয়সিদ্ধরূপে উপলব্ধি করি যে আমার কথাটা সত্য, তা হলে সে কথা জোর গলায় বলবার অধিকার আমার অবশ্যই আছে। সে জন্মগত অধিকার অখণ্ডনীয়, তর্কাতীত, স্বতঃসিদ্ধ। কেউ তা কেড়ে

নিতে পারে না। পরের মনোমত করে কথা বলাটাকেই যাঁরা জীবনের একমাত্র পরমার্থ বলে মনে করেন না, যাঁরা চোখকান সম্পূর্ণ খোলা রেখে জীবনপথে অগ্রসর হন, তাঁদের চোখে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকার একটি পবিত্র অধিকার। সেই অধিকারের পবিত্রতা তাঁরা প্রাণ গেলেও নষ্ট হতে দেন না, চক্ষুর মণির ন্যায় তাকে সব সময় সযত্নে আগলে রাখেন, সমাজের গড়পরতা দশজনার সে কাজ মনঃপূত না হলেও। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না সমষ্টিগত কল্যাণের বিরোধিতা করছেন, রাষ্ট্রিক শান্তিশৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করছেন, ততক্ষণ সত্যভাষণের জন্মগত অধিকার তিনি প্রয়োজনবোধে প্রয়োগ করবেনই। এতে সমাজ সুখী হোক চাই নাই হোক।

গণতন্ত্র কথাটা নিয়ে এ যাবৎ অনেক ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। গণতন্ত্র হলেই যেন সাতখুন মাপ। হাটে-বাজারে, সভায়-সমিতিতে, আইনসভায় ও শাসন-বিধিতে মেজরিটির ইচ্ছাটাই বলবৎ। চৌর্যাপরাধে ধৃত ব্যক্তি যদি নির্দোষও হয় তাকে সঙ্ঘবদ্ধ প্রহারের হাত থেকে আপনি রক্ষা করতে পারেন না। লোকে চাঁদা করে তাকে মারবেই। আপনি বাধা দিতে গেলে আপনিও মার খাবেন। এইটেকেই বলে গণতন্ত্রের অত্যাচার। প্রায়শঃ গণতান্ত্রিক শাসনের নামে যেটা চলে সেটা গণতন্ত্রের অত্যাচার বই কিছু নয়। এই কারণেই দেখতে পাই দৃষ্টিভঙ্গীতে ও বিশ্বাসে সম্পূর্ণ গণতন্ত্রী হয়েও বার্ণার্ড শ' সর্বদাই তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। বিলেতের পার্লামেন্টারী শাসনের কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁর মনে বদ্ধমূল অবিশ্বাস ছিল। এই নিয়ে তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেরও অন্ত ছিল না। বোধ করি জনতার মনোবৃত্তিকে সব চাইতে ভাল করে অনুধাবন করেছিলেন সেক্সপীয়র। তাই যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, জনতার বিচারবুদ্ধিকে তিনি আঘাত করেছেন। 'জুলিয়াস সীজার', 'কোরিওলেনাস' প্রভৃতি নাটকে জনমন সম্পর্কে প্রচণ্ড অবিশ্বাসের প্রমাণ রয়েছে। সীজারের হত্যার পর জনতাকে সম্বোধন করে ব্রুটাস ও এন্টনীর বক্তৃতা 'জুলীয়াস সীজার' নাটকের একটি অনবদ্য অংশ। জনতার মনস্তত্ত্বের দোদুল্যমানতা আর বহুরূপিতাকে লক্ষ্য করে এর চাইতে ক্ষুরধার ব্যঙ্গ কল্পনা করা যায় না। সব চেয়ে মজা এই যে, সেক্সপীয়রের পর বহু কাল গত হয়েছে। কিন্তু জনতার চরিত্র এতটুকু বদলায় নি। আজিও জনতার অর্থ কতকগুলি মাথার সম্মেলন, মস্তিকের সম্মেলন নয়। জনতা সর্বক্ষেত্রেই আবেগ দ্বারা চালিত; বুদ্ধির দ্বারা নয়। কেউ জনতাকে

তার বুদ্ধির ভ্রান্তি দেখাতে গেলেই জনতা তার উপর মারমুখো হয়ে ওঠে। স্পষ্টবক্তার উপর জনতার বড় আক্রোশ। আক্রোশটি ভয়বিমিশ্র। কেন না, অপ্রীতিকর সত্য কথা কেউ শুনতে ভালবাসে না ; জনতা ত একেবারেই নয়।

যদি বলেন শিক্ষার বিস্তৃতি এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থার একমাত্র প্রতিকার, সে কথা স্বীকার করব। কিন্তু বলব আরও কিছু চাই। আসল কথা, সর্বাগ্রে স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করতে হবে এবং চিন্তা ও কর্মকে সদ্‌ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে হবে। বর্তমান পদ্ধতির শিক্ষা স্বার্থবুদ্ধির হন্তারক কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বরং উল্টোটাই সত্য বলে মনে হয়। তথাকথিত শিক্ষা মানুষকে আরও স্বার্থপরায়ণ করে ; তাকে দুর্নীতির পঙ্কে আরও বেশী ঠেলে দেয়। শিক্ষার এই পরিণামটাই অহরহঃ প্রত্যক্ষ করছি। কুশিক্ষা বা অর্ধশিক্ষা বড় সাংঘাতিক জিনিস। তাতে যে শুধু দুষ্টবুদ্ধিই জাগ্রত হয় তাই নয় ; দুষ্টবুদ্ধির অনুকূলে যুক্তি খাড়া করবার ইচ্ছাটাও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। শেষোক্ত অভ্যাসটি মারাত্মক। অপকর্ম এমনিতেই যথেষ্ট খারাপ ; তার উপর তাকে যদি আবার "র‍্যাশনালাইজ" করবার চেষ্টা করা হয়, তা অজস্র অমঙ্গলের কারক হয়ে ওঠে। অতএব তথাকথিত কিতাবী শিক্ষার বিপদ সম্পর্কে অবহিত হবার প্রয়োজন কোনকালেই ফুরোবার নয়। শিক্ষাব্যবস্থার বৈপ্লবিক সংস্কারপ্রচেষ্টায় যতদিন না হাত দেওয়া হচ্ছে ততদিন জনতার চরিত্রকে পরিশোধিত করবার আশা দুরাশা হয়েই থাকবে।

সর্বাত্মক ও সর্বজনীন মূঢ়তার বিরুদ্ধে যাঁরা সত্যের জয়ধ্বজা উড়াতে চেয়েছেন জনতার হাতে যুগে যুগে তাঁরা লাঞ্ছিত হয়েছেন। ইতিহাসের এইটেই শিক্ষা। কিন্তু অত্যাচার, বধবন্ধনভীতি কিছুই তাঁদের সত্যনিষ্ঠাকে অবদমিত করতে পারে নি। এটা ইতিহাসের আরেকটি মূল্যবান শিক্ষা। একক সত্যনিষ্ঠার মশাল সেই কবে প্রথম প্রজ্বলিত হয়েছিল, আজও তার শিখা দেদীপ্যমান আছে। সক্রেটীশ, যীশু খ্রীষ্ট, ব্রুনো, এব্রাহাম লিঙ্কন এবং সর্বশেষে মহাত্মা গান্ধী সত্যের জন্য সর্বজনীন মূঢ়তার যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিয়েছেন। সঙ্ঘবদ্ধ মূঢ়তা কি তাঁদের আত্মিক প্রভাব বিলুপ্ত করতে পেরেছে? নয়, নয়, কদাচ নয়। সত্যের সাধনা আজও অব্যাহত আছে, যদিও তা মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আর চিরকাল তা মুষ্টিমেয় সংখ্যকের মধ্যেই

সীমাবদ্ধ থেকে এসেছে। মূঢ়তা আর ভ্রান্তির দিকেই অধিক সংখ্যক মানুষের পক্ষপাত; সত্য বরাবর অল্পসংখ্যকের অবলম্বন। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।" সত্য একক, তবে অসহায় নয়। সত্যের যে অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক জোর, সেইটেই তার প্রধান জোর। এই জোরে বিশ্বভুবন কাঁপানো যায়।

আদর্শের জন্য সত্যসন্ধদের মৃত্যু ও অন্যান্য প্রকারের লাঞ্ছনা বরণ আদর্শবাদের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করেছে। গ্যালিলিও তাঁর সত্যনিষ্ঠার জন্য জনতার দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন। নির্যাতনটা ইতিহাসের পাতায় বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার বিষয় হয়ে আছে, সত্যটি মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে জমা হয়ে গেছে। শক্তি ভঙ্গুর; কিন্তু অক্ষয়। ফ্রান্সের "ড্রেফুস অ্যাফেয়ারের" কথা আমরা সকলেই জানি। এক নিরপরাধ ইহুদীকে নিরপরাধ জেনেও শুধুমাত্র তার ইহুদীত্বের জন্য সমুদ্রের মধ্যে খাঁচায় পূরে রাখা হয়েছিল। এই প্রচণ্ড অন্যায়ের বিরুদ্ধে তৎকালীন ফ্রান্সের যে কয়টি অকুতোভয় বিবেকবান মানুষের চিত্ত বিদ্রোহের তেজে গর্জে উঠেছিল সাহিত্যিক এমিল জোলা তাঁদের অন্যতম। জোলার সাহিত্যিক অবদান সর্বকালের জন্য বেঁচে থাকবে কিনা বলা যায় না। কিন্তু তাঁর এই সত্যনিষ্ঠা অমর হয়ে থাকবে। আরেকজন প্রথিতযশা ফরাসী সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ—তাঁর আদর্শনিষ্ঠাও চিরকাল মানুষের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফরাসী ও জার্মানদের পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে দেখে তিনি এতদূর ব্যথিত হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর সমগ্র মনন ও আবেগ ঢেলে দিয়ে লিখলেন Above The Melee ("সংগ্রামের উর্ধ্বে"), বললেন, "জার্মাণ—ফরাসী, তোমারা প্রতিবেশী, ভাই। যুদ্ধের ন্যায় সর্বব্যাপী মূঢ়তা থেকে তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হও। পরস্পরের উৎসাদন দ্বারা তোমরা ভ্রাতৃহত্যার পাপে লিপ্ত হয়ো না। দেশকে উৎসন্নে দিও না।" কিন্তু দেশ কি ঋষিকল্প প্রাজ্ঞ সাহিত্যিকের সতর্কবাণীর প্রতি কর্ণপাত করেছিল? ফরাসীরা রোলাঁকে শুধু অপমানই করল না, ফ্রান্সে তাঁর বাস অসম্ভব করে তুলল। রোলাঁ স্বজাতির ভ্রান্তি ও মূঢ়তায় মর্মান্তিক বেদনাহত হয়ে সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অবিচলিত নিষ্ঠায় সত্যকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। তারই পরিচিতি উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁর শেষ বয়সের লেখা I Will Not Rest বইতে।

আর সেই একই সত্যের জন্য অতি শোচনীয় অবস্থার মধ্যে তাঁকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয় হিটলারের বন্দীশিবিরে। রোলাঁ গত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর প্রদর্শিত পথটাই যে বিশ্বকল্যাণ ও বিশ্বমুক্তির একমাত্র পথ দুই দুইটি রক্তপ্রাবী সর্বাত্মক বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার পর এ সত্যই কি আজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি?

॥ ৭ ॥

স্ত্রীপুরুষের সমানাধিকারের আন্দোলন বহুদিন থেকে চলে আসছে। ইউরোপে এ আন্দোলনের বয়স অনেক হয়েছে, আমাদের দেশেও নেহাৎ কম হয় নি। এদেশে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্বাতন্ত্র্য-চেতনা ও আত্মমর্যাদা বোধেরও বিকাশ হয়েছে এবং এই বোধ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তবু আমাদের দেশে নারীসমাজের একটি বৃহৎ অংশের মধ্যে এখনও পুরাতন অবস্থা ও ব্যবস্থার প্রতি মোহ অতিমাত্রায় বিদ্যমান, যে জন্যে নারী-আন্দোলন অদ্যাবধি আশানুরূপ জোরদার হতে পারছে না। এখনও ভারতীয় নারী মনুস্মৃতির অনুশাসন ও স্বেচ্ছাচারী পুরুষ-প্রভুত্বের পূর্ণ দাসত্ব করে চলেছে। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন, নারী-সমাজের যে আলোকপ্রাপ্ত অংশ নারীর অধিকার-প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালাচ্ছেন, তাঁরা বিরাট নারী-সমাজের কাছ থেকে বলতে গেলে কোন সমর্থনই পাচ্ছেন না, সাহায্য ত দূরের কথা। তবু পুরুষশাসিত সমাজের অনিচ্ছুক হস্ত থেকে তাঁরা তাঁদের হৃত স্বাধীনতা কেড়ে নেবেনই। এ বিষয়ে কিছু কিছু ফল যে না পাওয়া গিয়েছে এমনও নয়। ভারতীয় পার্লামেণ্টে হিন্দু কোড বিল পাশ হয়েছে। বিলটি রচিত ও গৃহীত হওয়ার মূলে নিখিল-ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের আন্দোলন ও আলোড়ন যে অনেকখানি পোষকতা করেছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সনাতন হিন্দু আইনের বিধানবলে হিন্দু নারীর প্রতি যুগ যুগ ধরে নানাবিধ অসম ও অন্যায় ব্যবহার চলে আসছিল। যুগধর্মের সহিত সঙ্গতি রেখে গৃহীত বিলে সেই বহুসঞ্চিত অন্যায়ের প্রতিবিধানের একটা সাধু প্রচেষ্টা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এই প্রচেষ্টা আরও অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা যে হয় নি তার কারণ হিন্দু আইনের স্বরূপ

সম্পর্কে হিন্দু সমাজের বিচারবিরহিত মূঢ় ধারণা এবং কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট সংরক্ষণশীলদের বিরোধিতার পর্বে এখনও ছেদ পড়ে নি। বিলটি পার্লামেণ্টে যাতে গৃহীত না হয় তার জন্মে তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। প্রচারপত্র, প্রচারপুস্তিকা, ভাড়াটে সংবাদপত্রের ওকালতি, ডেপুটেশান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মারফৎ হিন্দু কোড বিলকে ঠেকাবার চেষ্টা হয়েছিল। কলকাতায় বিরোধীদের অনেকগুলি সভা-সম্মেলন হয়। হিন্দু সমাজের বড় বড় সব খুঁটি একজোট হয়েছিলেন প্রস্তাবিত প্রগতিপ্রয়াসকে প্রতিহত করবার জন্মে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে তথাকথিত বিদ্বান ও পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিও কেউ কেউ ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জির নাম করা যেতে পারে। কলকাতার সভায় তিনি বলেছিলেন, হিন্দু আইন পাশ হলে নাকি হিন্দু সমাজের ভিত্তি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। অহো, হিন্দু সমাজের প্রতি কী সুগভীর মমতা! হিন্দু সমাজের স্থায়িত্বরক্ষা সম্পর্কে কী ঐকান্তিক আগ্রহ!

প্রতিক্রিয়াপন্থীদের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করে লাভ নেই। কেন না প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রতিক্রিয়ার পথে চলবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এইটেই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখ হয় দেখে শিক্ষিতা বলে পরিচিত মহিলা সমাজের একটি অংশ পুরুষদের এই চক্রান্তে যোগ দিয়েছিলেন। অভিজাতকুলের কতকগুলি "লেডী" জাতীয় জীব হিন্দু নারীর উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় গোড়া থেকেই বাধা সৃষ্টি করে আসছিলেন। এঁদের মনোভাব বোঝা দুষ্কর। জার আলেকজাণ্ডার রুশ দেশের সার্ফদের যখন দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্তি দেবার প্রস্তাব করেন তখন দীর্ঘ দিনের দাসত্বে নির্বীর্য, পঙ্গু, আত্ম-অচেতন সার্ফরাই সে প্রস্তাবের সব চাইতে বিরোধিতা করে। এদের বিরোধিতার মূলে ছিল এদের বহুযুগসঞ্চিত অজ্ঞতা ও দাসত্বের আফিংয়ের নেশা। এদের মনোভাব তবু কতকটা বোঝা যায়। কিন্তু আমাদের "আলোকপ্রাপ্তা" মহিলারা কোন্ প্রেরণার বশে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন প্রচেষ্টাকে বাধা দিচ্ছেন? এমনিতে ত এঁরা বাইরে বেরতে লজ্জা পান না; রুজ-লিপস্টিক মেখে স্বামীর হাত ধরে ক্লাবে, ডিনার-পার্টিতে ও সরকারী কর্তাদের হোমরা-চোমরা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এঁদের কোন সঙ্কোচ নেই। ইংরেজী ভাল করে রপ্ত করতে না পারলেও ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে সায়েবদের সঙ্গে করমর্দন করবার কায়দাটা এঁরা ভাল করেই শিখে নিয়েছেন। হগ মার্কেটে কিংবা যৌথবিপণিতে একা একা শপিং করতেও এঁদের আটকায়

না। কিন্তু সত্যিকার প্রগতির কথা যেই উঠল অমনি এঁদের হার্টফেল করবার মত অবস্থা হয়। বিশেষ করে প্রগতি বস্তুটি যদি নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন সংক্রান্ত হয় তা হলে ত তখুনি চোখের তারা উল্টোবার উপক্রম। আসলে এঁরা সব স্বামীর হাতে-ধরা অবোলা জীব; ভাবধারার ক্ষেত্রে অদ্যাপি মান্ধাতার আমলে বাস করছেন। বাইরে সাজসজ্জায় চলনে-বলনে যে জৌলুসটুকু চোখে পড়ে তা নিতান্তই আধুনিকতার একটা ঠাট। সে ঠাট ভিতরফাঁপা একটা দুর্বল মনকে আড়াল করে আছে।

নারীই নারীর সমাজের সবচেয়ে বড় শত্রু। আত্ম-অচেতনতাই এই শত্রুতার উৎস। নারী যদি বুঝত যে পুরুষ তার নিজের মর্যাদা, অধিকার ও দাবী সম্পর্কে ষোল-আনা হুঁসিয়ার, কিন্তু নারীর প্রাপ্য মর্যাদার বেলায় তার কার্পণ্যের অবধি নেই, তা হলে সেই উপলব্ধিই তাঁদের আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করত এবং পুরুষের সঙ্গে সমান তালে চলবার প্রেরণা যোগাত। কিন্তু পুরুষ যখন গদগদ হয়ে নারীর কাছে প্রেম ভিক্ষা করে, নারীর মন গলে যায়। ভাবে বুঝি শেষ অবধি তাঁরই জিৎ হল। কিন্তু এর চাইতে মারাত্মক আত্মপ্রতারণা আর কিছু হতে পারে না। পুরুষ নারীর পায়ে সব সমর্পণ করলেও তার শ্রেণীস্বার্থকে সমর্পণ করে না। সেখানে তার জ্ঞান অত্যন্ত টনটনে। নারীর রূপকে কেন্দ্র করে কত সভ্যতার বিলয় ঘটল, কত সাম্রাজ্য লালসার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কিন্তু এই বিনাশ-বিলয়ের মধ্যেও পুরুষ তার শ্রেণীস্বার্থ হাতছাড়া করে নি। চক্ষুর মণির ন্যায় সে এই সম্পদটিকে আগলে বেড়িয়েছে। যেখানেই পুরুষের অধিকার ও নারীর অধিকারের মধ্যে সংঘাত বেধেছে সেখানেই পুরুষের শ্রেণীরূপ প্রকটিত হয়ে পড়েছে। ভালবাসার মায়ামোহ, দুর্নিবার রূপজ আকর্ষণ কিছুই পুরুষকে পুরুষালির গর্ব থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে নি। নারী পুরুষের অধিকারবোধের পায়ের কড়া চটকেছে কি পুরুষ আহত অভিমানে ফোঁস করে উঠেছে। পুরুষ যে নারীকে ভালবাসার টানে সব সঁপে দেয় সে তার নিজের খেয়ালে। আত্মতৃপ্তির তাগিদও এর পিছনে কম সক্রিয় নেই। কিন্তু যেখানে শ্রেণীস্বার্থ বিলুপ্তির শঙ্কা আছে সেখানে পুরুষ সহজে ঘায়েল হবার পাত্র নয়। নারী তার নয়নবিমোহন রূপের সাহায্যে অনেক অসাধ্য সাধন করেছে, কিন্তু পুরুষের পুরুষালির অহঙ্কারকে এখনও বেড়ের মধ্যে আনতে পারে নি। এইখানেই নারীজাতির পরাজয়।

তথাকথিত পুরুষালির অহঙ্কার শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধন সবল দুর্বল সকল শ্রেণীর পুরুষের মনোভাবের মধ্যেই অল্পবিস্তর নিহিত আছে। কোথাও সেটা প্রত্যক্ষ; কোথাও প্রচ্ছন্ন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে পুরুষ নারীকে যে দৃষ্টিতে দেখে তাকে খুব উচ্চাঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গী বলা চলে না। নারী সম্পর্কে পুরুষের সম্পত্তিচেতনা আজও অতিমাত্রায় প্রবল। পুরুষের চোখে নারী পুরুষের প্রেম ও কামপরিতৃপ্তি এবং ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপনের যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। নারীর মাতৃত্ব পুরুষের কামজীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সূত্রে আবদ্ধ, সুতরাং পুরুষের পুরুষালির পরোক্ষ ঘোষণা। শোভা ও আভরণ দিয়ে পুরুষ নারীকে মনোমত করে সাজায় সে শুধু নিজের ঐশ্বর্য্য ও ক্রয়ক্ষমতাকে সাধারণ্যে ফলাও করে প্রচার করবার জন্যে। গহনা-প্রীতি নারী জাতিতে সহজাত এইরূপ শুনে আসছি। কিন্তু মানুষের চরিত্রে কোন্ বস্তু সহজাত, কোনটি বাইরে থেকে কৃত্রিম ভাবে আরোপিত তা কি নিশ্চিত ভাবে বলবার উপায় আছে? পুরুষই যে কোন এক বিস্মৃত যুগে নারীতে গহনাপ্রীতি প্রথম সঞ্চারিত করে নি তা কে বলবে? সেই অর্জিত প্রীতিটাই হয়ত আজ সহজাত প্রীতিতে দাঁড়িয়েছে। এই দিক থেকে বিচার করলে নারীর আভরণপ্রীতি নারীর সৌন্দর্যপ্রীতির নিশানা নয়, পুরুষের প্রতি দাসত্বের নিশানা।

॥ ৮ ॥

নারীপ্রগতির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ববর্তী নিবন্ধে বলেছি যে, নারীই নারীর উন্নতির সর্বপ্রধান অন্তরায়। এ বিষয়ে সন্দেহের কি অবকাশ আছে? দেখুন, নারী জাতির স্বাধিকার ও পুরুষের সহিত সমানাধিকার লাভের আন্দোলনের বয়স নেহাৎ কম হল না। কিন্তু কখনও কি শুনেছেন বা পড়েছেন যে, নারীদেহের সৌন্দর্য বর্ণনায় ও রূপায়ণে পুরুষ কবি, শিল্পী, চিত্রকর ও ভাস্করের দল যে-যথেচ্ছ স্বাধীনতা এতাবৎ ভোগ করে এসেছে তার বিরুদ্ধে নারী প্রতিবাদের ভঙ্গিতে তাঁর ক্ষুদ্র অঙ্গুলীটিও উত্তোলন করেছেন? শিল্পী যখন নারীদেহের অনাবৃত সৌন্দর্য রেখায় ও রঙে পরিস্ফুট করে তোলেন কিংবা তা পাথরে উৎকীর্ণ করেন, তখন তাঁদের অকৃত্রিম সৌন্দর্যকামনাটাই

যে শুধু পরিতৃপ্ত হয় তা-ই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মাভিমানটিও চরিতার্থ হয় যে, নারীদেহ নিয়ে পুরুষ যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। যুগে যুগে দেশে দেশে পুরুষ শিল্পী নারীদেহের অনাবৃত সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করেছে; শিল্পের মাধ্যমে নারীদেহের রহস্য দর্শের শিল্পানুভূতি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির গোচর করেছে। কিন্তু নারী কি ভুলেও কখনও তার প্রতিবাদ করেছেন? নিছক সৌন্দর্যপিপাসাই যদি অনাবৃত নারীদেহ বর্ণনা ও রূপায়ণের একমাত্র প্রেরণা হত তা হলে বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু এ ত তা নয়। শিল্পীর নারীদেহ সম্পর্কে অতিমাত্রিক চেতনার মূলে এই সূক্ষ্ম, স্থূল বুদ্ধির অগোচর, প্রায়-নির্জ্ঞান বোধ লুকিয়ে আছে যে, নারীদেহ পুরুষের দর্শন ও ভোগপরিতৃপ্তির একটি সনাতন উপকরণ, সুতরাং নারীদেহ নিয়ে পুরুষ যা-খুশী তা করতে পারে। পুরুষের এই যদৃচ্ছা আচরণের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রশ্ন করবার কেউ নেই। কেন না যে নারী এই প্রশ্ন করবে তাকে গায়ের জোরে দাবিয়ে রাখার ক্ষমতা পুরুষ রাখে।

কিন্তু আশ্চর্য, নারী কোনদিন পুরুষের এই যথেচ্ছাচারিতায় বাধা দেয় নি। বরং মনে হয় এতে নারীর গোপন সমর্থন ও প্রশ্রয় রয়েছে। তা না হলে নারীদেহ নিয়ে পুরুষ শিল্পী কখনও এতটা উদ্দাম হয়ে উঠতে পারত কিনা সন্দেহ। অথবা এমনও হতে পারে, শিল্পীদের হাতে অনাবৃত নারীদেহের উদ্ঘাটন দেখে দেখে নারী এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে আজ আর এতে তাঁর মর্যাদাবোধ পীড়িত হয় না। এমন কি সঙ্গে পুরুষ আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সাথী থাকলেও নারী অবলীলাক্রমে এই দৃশ্য মেনে নিতে পারেন। শুধু তা-ই নয়, পুরুষের এই দীর্ঘ দিনের আচরিত অভ্যাস মনে হয় নারীতেও কিয়ৎ-পরিমাণে সঞ্চারিত হয়েছে। নারী শিল্পীও পুরুষ শিল্পীর অনুকরণে প্রধানতঃ নারীদেহ অঙ্কনে তাঁর সময় ও উদ্যম ব্যয় করে থাকেন এবং সে দেহ যে সব সময় আবৃত থাকে তা-ও নয়। ঈশপের গল্পে সিংহ মানুষকে সম্বোধন করে বলেছিল যে, মানুষের বদলে সিংহ যদি ভাস্কর হত, সে নিজে উপরে থাকত এবং মানুষকে তার পায়ের নীচে রাখত। কিন্তু ঈশপের এই শিক্ষা নারীজাতি গ্রহণ করে নি। নারীশিল্পীর দল তাঁদের প্রতিযোগী পুরুষশিল্পীর সনাতন অভ্যাসটার উপর দাগা বুলিয়ে

যাওয়াটাকেই তাঁদের শিল্পিজীবনের চরম সার্থকতা বলে মেনে নিয়েছেন। নারীদেহ সম্পর্কে যে ট্র্যাডিশন শিল্পজগতে প্রচলিত আছে, নারীশিল্পী জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক, তার পাদমূলে আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন।

আসল কথা, নারীদেহের সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটনের যে ঐতিহ্য শিল্পজগতে স্মরণাতীত কাল থেকে গড়ে উঠেছে নারীর তাতে গোপন সায় রয়েছে। শিল্পী নারীদেহের আদিম রহস্যকে রেখায়, রঙে ও ভাঁজে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরিস্ফুট ক'রে দর্শের সমক্ষে উপস্থাপিত করুক এটা বোধ করি তাঁর অভিপ্রেত। একে একপ্রকার সমষ্টিগত প্রদর্শনবাদ বলা যেতে পারে। কথাটাকে নারী জাতির প্রতি অসম্মানকর বলে মনে করলে আমি নাচার। এখানে মনের অচেতন অংশের নির্জ্ঞান ইচ্ছাটাকে নিয়ে কথা হচ্ছে, সচেতন অংশের সজ্ঞান ইচ্ছাকে নিয়ে নয়। নির্জ্ঞান ইচ্ছার বিশ্লেষণ সব সময়ই shocking, সুতরাং পীড়াদায়ক। নির্জ্ঞান ইচ্ছার দর্পণে নিজেদের চেহারা দেখলে সকলেই আমরা আঁতকে উঠব। এখানে নারীর মনোবিশ্লেষণে সেই দর্পণটির আংশিক সাহায্য নেওয়া হয়েছে মাত্র। আশা করি পাঠিকারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

এ প্রসঙ্গে আরও কথা বলবার আছে। পুরুষ স্বভাবতঃই আদর্শবাদী। সুতরাং নারী-দেহবিলাসী হয়েও নারীদেহকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি আরও অনেকদূর পৌঁছতে পারে, পৌঁছেও থাকে। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের অবতারণা, ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের সন্ধান —এগুলি একমাত্র পুরুষচরিত্রেই সম্ভব। এইখানেই নারীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির মূলগত পার্থক্য। নারীর দৃষ্টিকে ব্যাপ্ত ও আচ্ছন্ন করে আছে শুধু দেহ। দেহবাদই তাঁর সমস্ত প্রেরণার উৎস। দেহবাদকে এখানে ব্যাপক অর্থে বিচার করতে হবে। স্নেহ বল, মমতা বল, প্রেমাকুলতা বল, নারীর সব কিছুর কেন্দ্রমূলে রয়েছে মানুষের অতি প্রত্যক্ষ শরীরী উপস্থিতি। দেহের অন্তরালে দেহাতীতকে দেখবার মত তাঁর চোখও নেই, রোখও নেই। চিন্তা অথবা আবেগ মানুষের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিকে অতিক্রম করে যেখানে গভীরতর মনন ও অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করতে উন্মুখ, সেখানে নারী তাঁর অনুসন্ধানের সূত্র হারিয়ে ফেলে। গভীরে পৌঁছতে তাঁর একান্তই ধৈর্যের অভাব। এই কারণে পুরুষের

দেহবাদ ও নারীর দেহবাদের তুলনামূলক বিচারে প্রথমোক্তের প্রতি আমার পক্ষপাত। যদিও এটা পুরুষ-সুলভ পক্ষপাত নয়; নিতান্ত 'নিরপেক্ষ' পক্ষপাত। নারীর দেহবাদকে পরিশোধিত করবার মত কোন অতীন্দ্রিয় উপাদান তার মধ্যে নেই। এই কারণে দেহবাদ নারীর ব্যক্তিত্বকে আঘাতই শুধু করে, উন্নীত করে না।

কথাগুলি বোধ করি পাঠিকাদের তেমন ভাল লাগছে না। নারীর অনুকূলে লেখনী ধারণ করে নারীকেই বিদ্রূপ-বাণে বিদ্ধ করব এটা বোধ করি তাঁদের প্রত্যাশার অতীত ছিল। হয়ত লেখকও এইজন্যে গোড়ায় প্রস্তুত ছিলেন না। কথায় কথায় কথা এসে গেল। জানি, যে তীর ছোঁড়া হয়েছে সে তীর আর ফিরে আসবে না। কিন্তু অস্ত্র সংবরণের এখনও সময় আছে। আপাততঃ সে চেষ্টাই করা যাক।

পুরুষের সহিত সম-অধিকার লাভের আন্দোলনকে জয়যুক্ত করতে হলে নারীকে আরও বলিষ্ঠ হতে হবে। পুরুষবশতার সংস্কার তাঁকে আরও সজোরে ছিন্ন করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের নির্দেশ অসহায় ভাবে মেনে সভায়-সমিতিতে, সংবাদপত্রে ও মাসিকের পৃষ্ঠায় পুরুষের বিরুদ্ধে তাল ঠোকার কোন অর্থ হয় না। তাতে মর্যাদা আরও ক্ষুন্ন হয়। নারীজাতি এই আত্ম-অবমাননাকর পথ পরিহার করবেন বলেই আশা করি। পুরুষ নারীকে হৃদয় সমর্পণ করে; নারীর জন্য তার লুব্ধতা ও ব্যগ্রতার অবধি নেই। তা সত্ত্বেও পুরুষ তার শ্রেণীস্বার্থ অদ্যাবধি অক্ষুন্ন রেখে এসেছে। কিন্তু কোন নারী যখন পুরুষকে তার মন বিলিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সে সব কিছুই বিলিয়ে দেয়। তার ভালবাসা সর্বাত্মক, সর্বগ্রাসী, সর্বচেতনা-আচ্ছন্নকারী। যদিও সে প্রেম দেহসর্বস্ব, দেহাতীত নয়। ভালবাসার ক্ষেত্রে নারী সীমা মেনে চলতে জানে না, এইজন্য যুগে যুগে তাঁর এত দুর্ভোগ, এত লাঞ্ছনা। পুরুষ কবিরা নারীর প্রেমাকুলতার মহিমা কীর্তন দ্বারা নারীকে এ পর্যন্ত কম ধাপ্পা দেয় নি। নারী সেই ধাপ্পায় বিশ্বাস করেছে এবং পুরুষের প্রেমে আরও বেশী মজেছে। নারীর সে প্রেমে ঘর-বাহির একাকার হয়ে গেছে। কুল মান লোপ পেয়েছে। পুরুষকে সর্বস্ব সমর্পণ করতে গিয়ে নারী তাঁর স্বাতন্ত্র্যচেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে আবেগের এই সর্বাত্মকতা উঁচুদরের জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যবহারিক

জীবনে নয়। নারী পুরুষকে ভালবাসবে অথচ তাঁর আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেবে না—এই অবস্থাটাই সমধিক শ্রদ্ধেয়।

॥ ৯ ॥

'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।' দশে মিলে কাজ করার গুণ অনেক। এতে কাজটাই যে শুধু ভাল হয় তা-ই নয়; ব্যক্তিচেতনাকে সমষ্টিচেতনার মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে একপ্রকার স্বার্থত্যাগের অনুভূতিও বোধ করা যায়। এই কারণে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অপেক্ষা বরাবর অধিক কাম্য, অধিক প্রশস্ত, অধিক ফলপ্রদ। সঙ্ঘবদ্ধতা মানুষকে গোষ্ঠীচেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে শিক্ষা দেয়, তার মনোবল বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। একক প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ, খণ্ডিত, ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ দ্বারা অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন, সুতরাং আংশিক অফলপ্রসূ। দলবদ্ধতার একটা মস্ত লাভ এই যে, তাতে ব্যক্তিগত ত্রুটিগুলিকে পরিহার করা যায়, অথচ সকলের মিলিত চেষ্টায় ও দানে সঙ্ঘশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে কোন বাধা থাকে না।

কিন্তু দলবদ্ধতা আর দলীয়তা এক নয়। দলবদ্ধতা ভাল, দলীয়তা নয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে, শিল্পে, সাহিত্যে, সামাজিক তৎপরতায়, অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ধরনের সঙ্ঘবদ্ধতার সাক্ষাৎ আমরা পাই তাকে দলবদ্ধতা বলা যায় না, তা দলবদ্ধতার বিকৃতি, অর্থাৎ দলীয়তা। কলকাতার জনজীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ দলীয়তার দ্বারা কলুষিত। দল না পাকিয়ে আমরা কোন কাজ করতে পারি না। যদি দেখা যেত হস্তস্থিত কাজ বা দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করবার জন্যে অনেকে এক সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তা হলে এই দলবদ্ধতার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলার থাকত না। কিন্তু এ ত তা নয়। এ যে দল পাকানো, আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অপরকে বিপাকে ফেলবার উদ্দেশ্যে এই দল পাকানো। অপর সকলকে দাবিয়ে একটা বিশেষ চক্র অথবা গোষ্ঠী যাতে সবার উপর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তারই জন্যে এই অভিসন্ধি-প্রণোদিত সঙ্ঘবদ্ধতার আয়োজন। এটাকে দশে মিলে কাজ করা বলে না; বলে ঘোঁট পাকানো।

দলীয়তা যে কী সাংঘাতিক বস্তু তা একবার আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। শুধু দলে রক্ষা নেই; চক্রের ভিতর যেমন চক্র তেমনি দলের ভিতরে দল, তার ভিতরে তস্য উপদল—আমাদের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের চক্রনেমি এই ভাবে তৈরী। এতে অবশ্য বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, কেন না পার্টির ভিত্তিতে রাজনৈতিক তৎপরতা গণতন্ত্রানুমোদিত রাষ্ট্রব্যবস্থার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। সুতরাং পার্টি বাদ দিয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা কল্পনাই করা যায় না। যেখানে পার্টি সেখানেই দলীয়তা। কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমনি পার্টি বললেই দলীয়তা বোঝায়। এই কারণে রাজনৈতিক দলীয়তা আপাততঃ আমাদের বিচার্য নয়। যদিও আমরা জানি রাজনৈতিক দলীয়তা অন্যান্য দলীয়তার ফলাফলের চাইতে কোন অংশে কম মারাত্মক নয়, বরং অধিক ক্ষতিকর।

রাজনৈতিক দলীয়তাকে যদি বা মেনে নেওয়া যায়, শিল্পকলা বা সাহিত্যসংক্রান্ত দলীয়তাকে আমরা কোন্ যুক্তিবলে স্বাভাবিক বলব? বরং এইটেই কি শৈল্পিক ও সাহিত্যিক দলাদলি সম্পর্কে সত্য কথা নয় যে, তাদের দ্বারা আমাদের দেশের সাহিত্যিক আবহাওয়া কলুষিত হচ্ছে এবং শিল্প-সাহিত্যের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হচ্ছে?

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি এমন কথা বলছি না যে সাহিত্যিক-দের গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়া ভাল নয়। বরং যে কথা দিয়ে বর্তমান নিবন্ধের সূচনা করেছি তার উপর জোর দিয়ে পুনরায় বলতে চাই, কোন একটা কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে এবং তা থেকে প্রার্থিত ফল লাভ করতে হলে মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়া উচিত। সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাবার কোন কারণ দেখছি না। কিন্তু কতিপয় সাহিত্যিক একত্র সম্মিলিত হওয়ার অর্থ কি অপর সাহিত্যিক দলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা? বিদ্বেষের ভিত্তিতেই কি আমরা আমাদের সাহিত্যের প্রাকার খাড়া করব?

কলকাতায় যতগুলি পত্র-পত্রিকা আছে ততগুলি দল বা গোষ্ঠী। তাতে দুঃখ ছিল না। দুঃখ হয় দেখে যে এই দলগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি বা সৌভ্রাত্রের চিহ্ন নেই। বরং একে অপরের ছায়া মাড়াতে না পারলেই যেন বাঁচে। এই কলকাতা শহরে এমন কয়েকটি

সাহিত্যিক গোষ্ঠী আছে পরস্পরের বিরুদ্ধে দলীয় কুৎসা প্রচারই যাঁদের একমাত্র সাহিত্যিক পুঁজি, সাহিত্যিক তৎপরতার নিশানা। এঁদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ত দূরের কথা, বাচনিক বিনিময়, এমন কি সাক্ষাৎ সন্দর্শন পর্যন্ত নেই। এক গোষ্ঠীর লেখক অপর গোষ্ঠীর লেখককে চেপে বা দাবিয়ে রাখতে পারলেই যেন খুশী হয়। সঙ্ঘবদ্ধতার নামে এ কি আত্মঘাতী প্রবণতা! এমন খুব কম লেখকই দেখলাম যিনি স্বীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে একসঙ্গে অনেকগুলি গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে পেরেছেন। হয়ত লেখকের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে চলবার ইচ্ছা অকৃত্রিম; কিন্তু এই সব পরস্পরবিরোধী সাহিত্যিক গোষ্ঠীগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় এবং এক সময়ে না এক সময়ে তাঁকে কোন একটা গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দিতে হয়।

দলীয় পক্ষপাত এবং আনুপাতিক অ-দলীয় বিদ্বেষবুদ্ধি বাস্তবিক ভাবিয়ে তোলবার মত সমস্যা। অন্যায় জিনিসটা সংক্রামক। একবার কোথাও তার প্রক্রিয়া আরম্ভ হলে তা অন্যত্র সংক্রামিত হয় এবং দুষ্টচক্রের ন্যায় কেবলই তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। এক গোষ্ঠী তার গোষ্ঠীভুক্ত লেখকদের প্রতি পক্ষপাত দেখালে অনিবার্যভাবে তার প্রতিক্রিয়া অন্য গোষ্ঠীতে সঞ্চারিত হয়। ফলে দলীয় পক্ষপাত নিয়ে সে এক ভীষণ কেলেঙ্কারী কাণ্ড চলতে থাকে।

দল গড়লেই কেন অন্য দলের উপর খড়্গহস্ত হতে হবে এটা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। অন্যান্য শ্রেণীর আলোচনা আপাততঃ থাক, তবে বিশেষ করে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার। শিল্পরচনা জিনিসটা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, আক্ষরিক অর্থে ব্যক্তিগত ব্যাপার। তিন মাথা এক করে কখনও কবিতা লেখা যায় না। কবিতা একাই লিখতে হয় এবং নির্জন কক্ষের নিভৃতি সে কাজের পক্ষে আরও প্রশস্ত। তবু যে কবিরা, সাহিত্যিকরা, লেখকরা একত্র মিলিত হন, গোষ্ঠীবদ্ধ হন, চক্র গঠন করেন, সে শুধু তাঁদের সামাজিকতার ক্ষুধা মেটাবার জন্য এবং পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান দ্বারা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে মহত্তর প্রেরণা লাভ করবার জন্য। যেমন একার পক্ষে সকল মানুষের সঙ্গে মেশা সম্ভব নয়, পরিচিত ও অপরিচিতের মধ্যে গণ্ডী টানতেই হয়; তেমনি একজন

লেখকের পক্ষে সকল লেখকের সঙ্গে পরিচিত বা মিলিত হওয়া অসম্ভব বলেই তাঁকে নিজস্ব রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী বিশেষ একটি গোষ্ঠী নির্বাচন করতে হয় এবং সেই গোষ্ঠীর সদস্যদের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সাহিত্যিক সমাজবদ্ধ জীব এবং অন্যান্য সমধর্মীদের সহিত তাঁর এই মেলামেশাটা সামাজিকতার একটা অঙ্গ। দল-বদ্ধতার এইটে যদি ভিত্তি হয়ে থাকে, তা হলে কেন তাঁরা দলীয়তাকে প্রশ্রয় দেবেন? কেন অপর গোষ্ঠীর লেখকদের সহিত শত্রুতাচরণ করবেন? কেন তাঁরা এ কথা নিয়ত স্মরণ রাখবেন না যে শিল্পসৃষ্টির কাজটা নিতান্তই একার কাজ; কে কোন্ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সেই বিবেচনা শিল্পসৃষ্টির মূল্যনির্ণয়ে নিতান্ত বাহ্য? আমার দলীয় লেবেল দিয়ে আমার লেখার বিচার নয়, আমার লেখার নিজস্ব গুণাগুণ দিয়েই তার বিচার।

॥ ১০ ॥

বালীগঞ্জের দেশপ্রিয় পার্কের আচ্ছাদনযুক্ত বিশ্রামাগারের বেঞ্চিতে বসে ওই-যে গায়ে র‍্যাপার গলায় কম্ফর্টার মাথায় কানঢাকা টুপি-পরা চার পাঁচজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আলোচনায় মশগুল হয়ে আছেন এবং শীতের সন্ধ্যা অনেকক্ষণ অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বাড়ি যাবার নাম করছেন না তাঁরা কী নিয়ে আলোচনা করছেন? এত শীতেও বাড়ি যাবার তাড়া নেই, সে এমন কি মুখরোচক আলাপ? ওঃ হরি, তা-ও জানেন না! এঁরা যে তত্ত্বকথা আলোচনা করছেন—নির্ভেজাল, নির্জলা পারমার্থিক তত্ত্বালোচনা। উপনিষদীয় তত্ত্ব, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, শঙ্করের মায়াবাদ, গীতার ব্রহ্মবাদ, পতঞ্জলির যোগদর্শন, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ, নব্যন্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—কোন বিষয়ই এঁরা আলোচনা থেকে বাদ দিচ্ছেন না। ভারতীয় দর্শন ও অধ্যাত্মবাদের প্রতিটি সূত্র এঁদের নখদর্পণে; অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা কণ্ঠস্থ; তার উপর এঁদের একজন হলেন বেলুড় মঠের সহিত যুক্ত, একজন ভোলানন্দ গিরির শিষ্য, একজন সন্তদাস বাবাজীর চ্যালা, একজন ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘের পেট্রন—সুতরাং আলোচনায় ছিদ্র থাকবার যো কী। পরম ব্রহ্ম

সম্বন্ধে এমন চরম উপাদেয় আলোচনা আপনি সমস্ত কলকাতা শহর ঢুঁড়লেও শুনতে পাবেন না।

উপাদেয় হবেই বা না কেন? সারাজীবন অর্থ ও বিত্ত সঞ্চয়ের ধাঁধায় ঘুরে মনের মধ্যে যে ময়লা জমেছিল, এইসব মাননীয় রিটায়ার্ড ভদ্রমহোদয়েরা রিটায়ার্ড জীবনের সুরুতেই তা মন থেকে সজোরে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন এবং সেই থেকে সেই-যে জীবের একমাত্র নির্ভর পরমকারুণিক দীনদয়াল ভগবান, তাঁর চরণে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করেছেন। করুণাময় ঈশ্বরই আজ এঁদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান—ঈশ্বরের আলোচনা ছাড়া আর কোন আলোচনা এঁদের ভাল লাগে না। টাকা হল হাতের ময়লা—সে ভার ছেলেমেয়েদের উপর সঁপে দিয়ে বাকী যে কটা দিন সংসারে বেঁচে আছেন ঈশ্বরের নাম সম্বল করে বেঁচে যেতে পারলেই হল। সাধ-আহ্লাদ আর কীই বা বাকী—লেকের লাগোয়া জমিতে বাড়ি করেছেন, গাড়ি করেছেন, ছেলেদের বিলেতে পাঠিয়েছেন, মেয়েগুলির শাঁসাল পরিবার দেখে বিয়ে দিয়েছেন, তদ্বির-তদারকি করে জামাইদের চাকরি করে দিয়েছেন, বীমাপত্রে আর ব্যাঙ্কেও বেশ কিছু গচ্ছিত আছে, যে ছেলেটার লেখাপড়া বেশীদূর এগোয় নি তাকে রাসবিহারী এভিন্যুর উপর বড় মনিহারী দোকান করে দিয়েছেন, ডাক্তার জামাইকে দিয়েছেন ডিস্পেন্সারী করে—এই অবস্থায় ভগবানের নাম শরণ ছাড়া অধমের আর কোন্ গতিই বা আছে? রিটায়ার্ড লাইফের বহু আয়াসে অর্জিত অবসরটাকে নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব করবার পক্ষে অধ্যাত্মবাদের চাইতে যুক্তিযুক্ত, বিজ্ঞজনোচিত পন্থা আর কী হতে পারে?

মহামতি বেকন বলেছেন, "Gardening is the purest of pleasures"। বিলাতের অবসরপ্রাপ্ত লোকেরা অবসরজীবনে কেউ কেউ বেকনকথিত পবিত্রতম আনন্দের খনি উদ্যানশিল্পের দিকে ঝোঁকেন, মৎস্যশিকারে ব্যাপৃত হন, কেউ সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান খোলেন, কেউ আদাজল খেয়ে শেক্সপীয়র পাঠে নিবিষ্ট হন, কেউ দাবা খেলার ক্লাবের সভ্য হন, নিতান্ত যিনি আর কিছু করবার পান না তিনি ক্রশওয়ার্ড পাজল নিয়ে মেতে ওঠেন।

আর আমাদের দেশে? আমাদের দেশের রিটায়ার্ড সরকারী চাকুরিয়ারা সব এক নিয়মে চলেন। চাকুরী থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্র

তাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনের শরণাপন্ন হন। অবধারিত ভাবে এঁদের সকলেরই শেষ জীবনের একমাত্র সহায় ও অবলম্বন ধর্ম। এই দুর্নিবার ধর্মপিপাসার বশে কেউ সাধুসন্তের চ্যালা হন, কেউ সপ্তাহে অন্ততঃ পাঁচবার বেলুড় মঠের দিকে দৌড়ন, কেউ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শিষ্য-অনুশিষ্যদের সঙ্গে নিয়মিত চিঠি লেখালেখি করেন এবং বৎসরে তিনবার শ্রীঅরবিন্দ ও Mother-এর দর্শনলাভ এবং দর্শনজনিত পুণ্যের আশায় পণ্ডিচেরী যাওয়া করেন। শ্রীঅরবিন্দ দেহরক্ষা করার পর এখন শুধু Motherই উপাস্য।

রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ কিংবা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের উপর কটাক্ষ করা আমার এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আমার সবিশেষ শ্রদ্ধা আছে এবং তাদের কার্যধারার গুরুত্ব সম্পর্কেও আমি সচেতন আছি। আমি শুধু এখানে তাঁদের কথা বলছি যাঁরা সারাজীবন জাগতিক বিষয়বাসনায় নিরবচ্ছিন্নভাবে লিপ্ত থেকে শেষ জীবনে মাত্র মুখরক্ষার জন্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির দরজায় হাজির হন। উল্লিখিত সেবাশ্রম বা ধর্মাশ্রমগুলির উদ্দেশ্য অবশ্যতঃই মহৎ; কিন্তু যে সব ধর্মপিপাসু বলে কথিত মানুষ এঁদের শরণাপন্ন হন তাঁদের সকলের অভিপ্রায় সমান মহৎ নাও হতে পারে, তাঁদের মধ্যে তথাকথিত ধর্মপিপাসুও অনেক থাকা সম্ভব।

আসলে ধর্ম কী? গুরুগম্ভীর তত্ত্বালোচনার মধ্যে না গিয়ে সোজাসুজি এইটুকু বলা যায় যে, মানুষের প্রাত্যহিক আচারে-আচরণে বাক্যে ও চিন্তায় যা মানুষকে সৎভাবযুক্ত হতে শিক্ষা দেয় তাই ধর্ম। ধর্ম মানুষের দৈনন্দিন জীবন-নিরপেক্ষ কোন বিমূর্ত (abstract) ভাব নয়। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা হয় ধর্মবোধ দ্বারা চালিত হই, নয়ত ধর্মবুদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ করি। সারাজীবন স্বার্থবুদ্ধিতে শান দিয়ে আর বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির লোভে অপরের স্বার্থ দুপায়ে মাড়িয়ে শেষ জীবনে হঠাৎ পরম বৈষ্ণব সেজে গীতা ভাগবত চণ্ডী কপচাতে আরম্ভ করলুম, কি সাধুসন্তের ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে জগৎ-সংসারে ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করে বেড়াতে লাগলুম—এ রকম ধর্মাচরণের কোন অর্থ হয় না। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে অর্থাৎ আমার যখন কিছুই করবার নেই, সক্রিয় জীবন থেকে যখন বাধ্য হয়ে বিদায় নিয়েছি, দশ ও দেশের সঙ্গে সংযোগসূত্রও ছিন্নপ্রায়, সেই সময়ে আমার ধর্মভাবাপন্ন হয়ে পড়াটা স্বার্থবুদ্ধিরই একটা রূপান্তর মাত্র। সমগ্র জীবন যে বিষয়তৃষ্ণার পিছনে ঘুরে

বেড়িয়েছি সেই বিষয়তৃষ্ণার পটভূমিকা ছিল সমাজ। আজ কর্মহীনতার অবসরে চোখের সামনা থেকে সেই সমাজের পর্দা সরে গেছে, মানুষ নিয়ে আর কারবার করতে হয় না; সুতরাং ধর্মবোধের অঙ্কুশ অকস্মাৎ মনকে তাড়না করবে বই কি। কিন্তু বলা দরকার, এই বিলম্বিত ধর্মবুদ্ধির মধ্যে মুক্তির কোন সঙ্কেত নেই, সঙ্কেত থাকতে পারে না।

ধর্ম জীবন-নিরপেক্ষ নয়। জীবনের পথ চলতে চলতেই ধর্মের পরীক্ষা; হঠাৎ পথচলার শেষে ফোঁটা-তিলককাটার আড়ম্বরের মধ্যে অনুশোচনা প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু এই বিলম্বিত আত্মশুদ্ধি আর আত্মোপলব্ধির চেষ্টায় সমাজ কোনদিক দিয়েই উপকৃত হয় না। অবশ্য ধর্মের একটা আনুষ্ঠানিক দিক আছে, তার মূল্য কম নয়। কিন্তু কায়মনোবাক্যে ধর্মবুদ্ধির নির্দেশ মেনে চলা অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে সৎ হওয়ার মূল্য তার চাইতে অনেক বেশী। আমরা যদি আচারে আচরণে সৎ হই, তবে আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিধিবিধান মেনে না চললেও বিশেষ কিছু এসে যায় না। রাস্কিন তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে বলেছেন, মানুষ যদি ব্যক্তিগত জীবনে সৎ হয়, তা হলে সে ঈশ্বরবিশ্বাসী অথবা অবিশ্বাসী সে প্রশ্ন নিতান্তই গৌণ হয়ে পড়ে। কেন না আমার ভাল হওয়া নিয়ে কথা, আমি চার্বাকের নাস্তিক্যবাদের বশবর্তী কিংবা বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিভাবের অনুগত তা বিচার না করলেও চলতে পারে। অন্ততঃ পক্ষে সে বিচারের স্থান জীবনে গৌণ। গান্ধীজী অবশ্য মনে করতেন যে, সকল সৎবুদ্ধিরই উৎস হল ভগবৎবিশ্বাস; কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে, গান্ধীজীর ঈশ্বরবিশ্বাস দৈনন্দিন জীবনের আচরণ-নিরপেক্ষ কোন abstract অধ্যাত্মবাদ নয়; rituals-ও তার ভিত্তি নয়। গান্ধীজীর ঈশ্বরবিশ্বাসের ভিত্তি হল সক্রিয় মানবপ্রেম। প্রতিটি আচার-আচরণে মানুষের হিত সাধন করার মধ্যে, ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার মধ্যে এই মানবপ্রেমের মূল নিহিত।

উপরে যে শ্রেণীর ধর্মপিপাসুর উল্লেখ করেছি এঁরা ধর্মের ধ্বজাধারী ব্যক্তিস্বার্থান্বেষী কতকগুলি মধ্য ও উচ্চ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ছাড়া আর কিছু নন। শেষ বয়সের সুবিস্তৃত অবসরক্ষণকে কিছু একটা দিয়ে ভরিয়ে তোলা চাই—প্রাচীন ভারতীয় চতুরাশ্রমের শেষ আশ্রমের সংস্কার অনুযায়ী এঁরা সেই অবসরটাকে নীরন্ধ্র ধর্মচর্চার দ্বারা ভরে তোলেন।

আগেকার দিনের লোকেরা পঞ্চাশোর্ধে বাণপ্রস্থে যেতেন ; এখনকার সংসার-জীবী সরকারী চাকুরে ও ব্যবসায়ীরা সক্রিয় জীবন থেকে রিটায়ার করার পর কষে ধর্মচর্চা সুরু করেন, অবশ্য অরণ্যচারী হয়ে নয়, সংসারনিবদ্ধ থেকেই। অবসরপ্রাপ্ত পাশ্চাত্ত্য দেশীয় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের যেমন অবসরযাপন ও অবসরবিনোদনের প্রকৃষ্ট উপায় ক্রশ-ওয়ার্ড পাজল, তারই এদেশীয় সংস্করণ রিটায়ার্ড সরকারী চাকুরিয়ার (যাঁর গাড়ি বাড়ি বিষয়সম্পত্তির মূলে রয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরপদলেহন এবং নিজহস্ত প্রসারণ অর্থাৎ ঘুষ গ্রহণ) তেমনি ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ। দুটোই সমান দরের জিনিস, দুটোই সমান 'পাজল'।

॥ ১১ ॥

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে সাধারণ ভাবে ধনীগৃহিণীদের কথা বলব। ধনীগৃহিনী হলেও মায়ের জাত, সুতরাং মাথায় তুলে রাখবার মত—এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে যাঁরা আমার লেখাটি পড়তে যাবেন তাঁরা আমার বাচালতা ক্ষমা করবেন। কেন না মায়ের জাত সম্পর্কে কিছু রূঢ়, স্পষ্ট কথা বলব বলেই এবারে কলম ধরেছি। আমার এ ভঙ্গিটা সকলের মনঃপূত নাও হতে পারে।

ভারতীয় নারী পুরুষশাসিত ভারতীয় সমাজে শত ভাবে নির্যাতিত, পিষ্ট, লাঞ্ছিত এ কথা যেমন সহস্রবার স্বীকার করব, তেমনি এ কথাও জোর গলায় বলব যে, 'মায়ের জাত', 'মায়ের জাত' করে মায়ের জাতকে আমরা নানা ভাবে আস্কারাও দিয়েছি। এই আস্কারার মাত্রা কিছুটা কমানো ভাল।

আমাদের সমাজের ধনাঢ্য ও বিত্তবান সংসারের গৃহিণী, স্থূলাঙ্গিনী, মেদ-বহুলা, চলতে-ফিরতে কষ্ট হয়, আঁচলে গোছা-গোছা চাবি, ভাঁড়ার-ঘরের একেশ্বরী অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ঠাকুর-চাকরকে অষ্টক্ষণ ধমকে বেড়াচ্ছেন, মুখে জর্দাদেওয়া পানের চিবুনি লেগেই আছে—ধনী-গৃহিণী বলতে চক্ষিতে এই-যে একটি চিত্র মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে, চিত্রটিকে বিশ্লেষণ করে দেখবার প্রয়োজন আছে।

ধনী-গৃহিনী, সম্পন্ন ও ধনজনপূর্ণ সংসারের কুললক্ষ্মী—আসলে তিনি কে? আসলে তিনি চোরাকারবারীর সতী-সাধ্বী স্ত্রী, ক্ষেত্রভেদে ঘুষখোর উচ্চপদস্থ আমলার সোহাগিনী বধূ, ক্ষেত্রভেদে ফাটকাবাজ দালালের লবঙ্গ-লতিকা পত্নী, স্থূলোদর পুঁজিপতি নায়কের ততোধিক স্থূলোদরা নায়িকা, ক্ষেত্রভেদে অসাধু ব্যবসায়ীর ধর্মকার্যের একমাত্র সহায় ও অবলম্বন পতিপ্রাণা সহধর্মিণী। স্বামীদেবতার প্রতি এঁদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সতী-সাবিত্রী বেহুলা দময়ন্তী স্বামীনিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট হতে পারে, কিন্তু এঁদের বেলায় সেটি হবার যো নেই। স্বামীর প্রতি এঁদের নিষ্ঠা অচলা বললে সামান্যই বলা হয়। স্বামী-দেবতার কোঁচার খুঁটের সঙ্গে এঁরা এঁদের আঁচল এমন নিবিড় ভাবে জড়িয়েছেন যে সে গেরো মৃত্যুতেও আলগা হওয়ার নয়।

আর স্বামীনিষ্ঠা না হবেই বা কেন? পতিদেবতারা এঁদের যেরকম বহাল-তবিয়তে রেখেছেন, চাইতে না চাইতে যেরকম ক্ষিপ্র গতিতে শাড়ি-গয়না এনে দিচ্ছেন, মুখের কথা খসতে না খসতে যেরকম ব্যস্ততার সহিত দার্জিলিং কিংবা ডালহৌসী পাহাড় কিংবা পুরীর সমুদ্রে হাওয়া খেতে নিয়ে যাচ্ছেন, তাতে এঁরা যদি নীরন্ধ্র ও নিশ্ছিদ্র পতিসেবা দিয়ে তার দাম না দেন তা হলে কৃতজ্ঞতার মূল্য থাকে কোথায়? স্বামী এত শত সুখসুবিধার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, বিনিময়ে স্বামীকে মাথায় করে না রাখলে চলবে কেন? আমাদের ধনীগৃহের কুললক্ষ্মীদের স্বামীভক্তি জন্ম-জন্মান্তর অক্ষয় হয়ে থাকুক!

কিন্তু একটি প্রশ্ন না করে পারা যায় না। স্বামীর অর্থ ও বিত্তোপার্জনের ইতিহাস ও প্রক্রিয়াটা এঁরা কখনও বিচার করে দেখেন কি? স্বামীকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেন কি? স্বামীর আহারকালে পরিবেশনের তদারকি কার্যে নিয়োজিতা গৃহিণী যখন মোড়ার উপর দেহের সমস্ত ভার ন্যস্ত করে পাখার বাতাস করতে করতে স্বামীকে 'এটা খাও', 'ওটা খাও', 'এটা না খেলে আমার মাথা খাও' বলে আহাররত স্বামীকে তাড়না করতে থাকেন, তখন স্বামী কত অসহায় ব্যক্তির মস্তিষ্ক চর্বণ করে এই বিপুল খাদ্যসম্ভারের উপযোগী রসদ সংগ্রহ করেছেন সে কথা একবারও তাঁদের মনে উঁকি দেয় কি? 'আমার মাথা খাও', কিন্তু স্বামীদেবতাটি যে এর আগেই বহু লোকের মাথা খেয়ে বসে আছেন।

সত্যি কথা বলতে, সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের দৃষ্টান্তে এইসব সুখলালিতা ধনী-গৃহিণীর বিবেক আদৌ পীড়িত হয় কি না সন্দেহ। তা যদি

হত, তা হলে এমন একটা দৃষ্টান্ত অন্ততঃ চোখে পড়ত, চোখে না পড়লেও লোকমুখে অন্ততঃ শুনতে পেতুম যে, অমুক ধনী-গৃহিণী স্বামীর অপকার্যের প্রতিবাদ করেছেন এবং প্রতিবাদ করে স্বামীর বিরাগভাজন হয়েছেন। একবার এরকম একটা প্রতিবাদের কথা শুনেছিলাম; কিন্তু দুদিনেই প্রতিবাদিনী মিইয়ে গেলেন। তারপরেই আবার স্বামীর শ্রীচরণশরণম্। পুনার আগা খাঁ প্রাসাদে অবরুদ্ধ থাকা কালে গান্ধীজী যখন তাঁর ঐতিহাসিক অনশন আরম্ভ করেন, তখন লর্ড লিনলিথগোর একসিকিউটিভ কাউন্সিলের তিনজন ভারতীয় সদস্য গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ পদত্যাগ করেন। এঁরা হলেন স্যার হোমি মোদী, এম এস আনে, এবং বিশ্বাস করুন আর নাই করুন,—পরলোকগত নলিনীরঞ্জন সরকার। কিন্তু স্যার জে পি শ্রীবাস্তব তাঁর গদী আঁকড়ে থাকেন। স্যার জে পি-র পত্নী স্বামীর অতিরিক্ত প্রভুভক্তি ও সরকারপ্রীতির প্রতিবাদ স্বরূপ স্বামীর বিরুদ্ধে অসহযোগিতা-মূলক ধর্মঘট করেন। এইখানেই ব্যাপারটির উপর যবনিকাপাত হয়। পরে আর এ সম্বন্ধে কিছু শোনা যায় নি। পরেকার ইতিবৃত্তটুকু অন্তরালরহস্য হয়েই থাকুক—আমরা আর তার ভিতর উঁকি দিতে চাই না।

তবু, ফল হোক আর না হোক, শ্রীবাস্তব-পত্নী স্বামীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর প্রতিবাদটা যতই সাময়িক হোক তবু সে প্রতিবাদ। এ জন্যে তিনি সঙ্গতভাবেই সকলের শ্রদ্ধা দাবী করতে পারেন। এই দৃষ্টান্ত থেকে ধনী ও সামাজিক প্রভাবপ্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের গৃহিণীকুলের অনেক কিছু শেখবার আছে, অবশ্য শেখবার মনোবৃত্তি যদি তাঁদের থেকে থাকে। কিন্তু সে মনোবৃত্তি সত্যি কি তাঁদের আছে? আমাদের সমাজের ধনী-গৃহিণীদের মনোভাব অনেকটা দস্যু রত্নাকরের পত্নীর মনোভাবের অনুরূপ। স্বামী রোজগার করে এনে দেবে, খাব। রোজগারটা সাধু উপায়ে হয়েছে কি অসাধু উপায়ে হয়েছে সে দেখার দায় আমার নয়। কেন না অগ্নি সাক্ষী করা বিবাহিতা স্ত্রীকে স্বামী যে ভাবেই হোক প্রতিপালন করতে বাধ্য। এই মনোভাবটাই আমাদের অধিকাংশ ধনী-গৃহিণীর মধ্যে সক্রিয় বলে মনে হয়। স্বামী মুনাফাখোরী করেই টাকা আনুন আর প্রবঞ্চনা করেই টাকা আনুন, সেই টাকায় এঁদের শাড়ী গয়না করতে এতটুকু আটকায় না। স্বামীর কার্যের এঁরা মৌখিক প্রতিবাদ পর্যন্ত করেন কিনা সন্দেহ।

আসলে এই সব ধনী-গৃহিণীর দৃষ্টিশক্তি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, অনুদার। আত্মকেন্দ্রিক পরিবারের চতুঃসীমার মধ্যেই এঁদের জগৎ সীমাবদ্ধ, এর বাইরে এঁদের দৃষ্টি পৌঁছতে চায় না। এঁরা সন্তানঅন্তপ্রাণ সে শুধু নিজের ছেলেমেয়ের বেলায়। স্বামীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানকল্পে এঁদের আয়াসের অন্ত নেই, কিন্তু এদিকে যে স্বামীর হাঙরমুখো মুনাফালোলুপতার যূপকাষ্ঠে অগণিত অসহায় লোক বলি পড়ছে সে সম্পর্কে এঁদের এতটুকু মাথাব্যথা নেই। স্বামীকে তাঁর অন্যায় সম্পর্কে সচেতন করবার দায়িত্ব ঘাড় পেতে নিতে এঁরা অপারগ, যেহেতু এঁরা সেই অন্যায় সম্পর্কে নিজেরাই আদৌ সচেতন নন। নিজের ছেলের সামান্য একটু সর্দি হলে এঁরা দু চোখের পাতা এক করেন না, ডাক্তার বৈদ্য ডেকে বিশ্বসংসার তোলপাড় করে তোলেন, কিন্তু বাড়ীর পাশে বস্তির কোন ছেলে যদি অষুধপথ্যের অভাবে মারা পড়তেও বসে, দেখেশুনেও তাঁরা নির্বিকার থাকেন, তাঁদের তথাকথিত মাতৃহৃদয় করুণায় বিগলিত হয় না। এই যেখানে অবস্থা সেখানে 'মায়ের জাত' বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা কি এতই সহজ? আর যারই সে উচ্ছ্বাস আসুক, আমার অন্ততঃ আসে না সে কথা আমি অকপটে স্বীকার করব।

অবশ্য ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই কিছু কিছু আছে। তবে জোর করে বলতে পারি, তার সংখ্যা খুব বেশী নয়। ব্যতিক্রমের কথা শুনি, কিন্তু চোখে দেখি নি।

বেশী দূরে যেতে হবে না, হাতের কাছেই এমন একটা দৃষ্টান্ত রয়েছে যার থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন উপরে আমি এই-যে এতগুলি তেতো কথা বললুম সেসব সত্যি কি মিথ্যে। কলকাতার লোক নিশ্চয়ই বড়-বাজারের মাড়োয়ারী গিন্নীদের দল বেঁধে গঙ্গায় পুণ্যস্নান করতে যেতে দেখে থাকবেন। এঁদের পুণ্যির ঠেলায় অনেক সময় হ্যারিসন রোডে ট্রামবাস পর্যন্ত আটকে থাকে। এঁদের ধর্মাচরণের প্রকরণই বা কত আর পদ্ধতিই বা কী অদ্ভুত! বলা- নেই কওয়া নেই হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়লেন আর ঘটি-ঘটি জল ঢালতে লাগলেন। কিন্তু এত যে পুণ্যাচরণের ঘটা, মুনাফাখোর চোরাকারবারী স্বামীর উপর ত এই পুণ্যের ফল ফলতে দেখি না। স্বামী মশাই ত দিব্যি নাদাপেটে খোংরাপট্টি. কিংবা আমড়াতলার গদীতে বসে লাভের ও

লোভের ছুরিতে ক্রমাগত শান দিয়ে চলেছেন। সেখানে ত পত্নীদেবী এতটুকু দাগ বসাতে পারেন না, কি, দাগ বসাতে চান না। আমার মনে হয় প্রতিটি ব্যবসায়ী মাড়োয়ারী দম্পতীর মধ্যে এইরূপ একটা গোপন বন্দোবস্ত আছে যে, কালবাজারে স্বামী যত বেশী হাত কাল করবেন, স্ত্রী তাঁর ধর্মাচরণের ঘটা তত বাড়িয়ে দেবেন। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর পাপ জমতে পারে না; সতীসাধ্বী সহধর্মিণী স্ত্রী অমনি তাকে গঙ্গার জলে গিয়ে ফেলে আসেন।

॥ ১২ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর বেশীর ভাগ উপন্যাসে নায়ককে সর্বগুণান্বিত করে আঁকা হত। উপন্যাসের যিনি নায়ক হবেন তার কোন দোষ থাকতে নেই, তিনি সর্বগুণাধার, তিনি অনিন্দ্যচরিত্র, তিনি অপাপবিদ্ধ। শুধু গুণে নয়, রূপেও তিনি অতুলনীয়। তার কান্তি মনোহর, দেহসৌষ্ঠব অনবদ্য, স্বাস্থ্য ও শক্তি দেবদুর্লভ। তদানীন্তন কালে কথাশিল্পীরা নায়ক চরিত্রের এই সংস্কার কোথা থেকে নিয়েছিলেন বলতে পারি না, তবে দেখতে পাই সংস্কারটি তার পরেও বহুকাল অবধি প্রচলিত ছিল। গোটা উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রথম দু দশক পর্যন্ত অল্পবিস্তর এই সংস্কার অনুযায়ীই উপন্যাসের নায়কচরিত্র পরিকল্পিত হয়ে এসেছে। স্পষ্টগ্রাহ্য ভাবে পরিবর্তন দেখা দিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর উপন্যাস-সাহিত্যে। ইউরোপীয় কথাসাহিত্যে সত্যিকার মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের সূচনা হল। অবশ্য রুশ সাহিত্যে নায়কচরিত্রের পরিকল্পনায়, সাধারণ চরিত্রচিত্রণে, ঘটনা ব্যাখ্যানে ও সংলাপ রচনায় রিয়ালিজমের আমদানী হয়েছিল উনিশ শতকেই। কিন্তু রীতিমত একটা আন্দোলন হিসাবে রিয়ালিজম-অনুস্যূত মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা হয় প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুখের বিষয়, আমাদের দেশের আধুনিক সাহিত্যিকেরা বিশ্ব-সাহিত্যের সর্বব্যাপী রিয়ালিজমের হাওয়াটা ধরতে পেরেছেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁদের উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে সেইভাবে রূপ দিচ্ছেন। 'কল্লোল' যুগ থেকে এই প্রশংসনীয় নূতন অভ্যাসের সুরু; এক্ষণে সেই অভ্যাস

আরও প্রসারিত হয়েছে। নায়ক হলেই তার মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স থাকবে, চেহারা বলদৃপ্ত হবে, এবং নায়িকার বাড়িতে এলেই নায়িকা তাকে ফুলকো লুচি বানিয়ে খাওয়াবে এ আজকাল বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রে এসেই উপরোক্ত ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। শরৎচন্দ্রকে যাঁরা রিয়ালিস্ট বলেন রিয়ালিজমের সংজ্ঞা ও স্বরূপ তাঁদের মগজে আরও ভাল করে ঢোকান দরকার। 'গৃহদাহের' মহিম চরিত্রটিই ধরুন। মহিম নয় ত যেন মহামহিম। গীতায় বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের চাইতেও এককাঠি উপরে। অভিন্নহৃদয় বন্ধু সুরেশ অচলাকে নিয়ে সটকান দিল, তাতেও মহামহিম মহিমবাবু অচঞ্চল, নির্বিকার। ধ্যানারূঢ় যোগীর নিকট যেমন বিশ্বসংসার মায়াপ্রপঞ্চ বই কিছু নয়, অচলা গেল কি থাকল মহিমবাবুরও তাতে কিছু যায় আসে না। এই ধরনের দেবচরিত্র মনুষ্যসমাজে বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না।

আরেকটি অবিশ্বাস্য চরিত্র হল 'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশ চরিত্র। তিনিও যোগারূঢ় হয়ে আছেন। সন্দীপ তাঁরই আশ্রয়ে তাঁরই ঘরের খেয়ে বিমলার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে, তিনি দেখেও দেখছেন না। সংসারবিরাগী কিংবা জড়বুদ্ধি ক্লীবের পক্ষে এ জাতীয় আচরণ সম্ভব, কিন্তু মান-অপমান-বোধ আর সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কদাচ নয়। অবশ্য নিখিলেশের চরিত্রের আদর্শবাদী একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, সম্ভবতঃ রবীন্দ্র-নাথের তা-ই অভীপ্সিত ছিল, কিন্তু এ ব্যাখ্যা বাস্তবসম্মত নয় সে কথা বলা দরকার। নিখিলেশ ও মহিম দুটি চরিত্রই সমান অবিশ্বাস্য, সমান অবাস্তব। এ দুটি চরিত্র বন্ধনীযুক্ত করা হল, কারণ মহিম চরিত্রের আইডিয়াটি নিখিলেশ চরিত্র থেকেই নেওয়া। সাহিত্যিক ঋণকরণ সর্বক্ষেত্রে যেরূপ হয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাই—স্বীকৃতিবিহীন।

প্রাচীন যুগের কবিরা এবং এ যুগের প্রাচীনপন্থী উপন্যাসকারেরা নায়িকার রূপবর্ণনায় পঞ্চমুখ। পঞ্চমুখ কিন্তু একচক্ষু। নায়িকার রূপ ও গঠন-সৌষ্ঠবে তাঁরা কোন খুঁত দেখতে পান না। রূপবর্ণনাটা যাচিয়ে দেখলে তথ্যের বিবৃতি ছাড়া আর কী। কিন্তু মামুলি তথ্যের বিবৃতি থেকে তার তফাৎ এইখানে যে, কথাশিল্পীদের রূপবর্ণনা আবেগপ্রধান। যেখানে আবেগ সেখানেই ভ্রান্তি, সেখানেই অতিশয়োক্তি। নারীর রূপবর্ণনায় অতিশয়োক্তি থাকবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু নায়িকামাত্রই নিখুঁত সুন্দরী

হবে এরকম কোন কথা নেই। বাস্তব জীবনে নিখুঁত সুন্দরী দেখেছি বলে মনে পড়ে না। চুল যার আজানুলম্বিত, অধরোষ্ঠ যার পক্ক বিম্বফলের আভামণ্ডিত, গালের রঙ যার দুধে-আলতায় মেশানো, তার চোখজোড়া যে বনহরিণীর ন্যায় সততচঞ্চল ও মেঘনীলিম হবে তার কি কথা আছে? সে চোখ ত ফিরিঙ্গি মেয়ের চোখের মত কটকটে কটাও হতে পারে? যে মেয়ের রূপে বিভ্রম জাগায় সে মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনলে এক মুহূর্তে নেশা ছুটে যেতে পারে না কি? কিন্তু কবিদের ওই দোষ, যখনি নারীর রূপবর্ণনা করতে সুরু করেন, তখন আর তাঁদের হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান থাকে না। সাহিত্যিক মাত্রই ভাবালু জীব, সুতরাং তাঁদের সৌন্দর্যের প্রতি পক্ষপাত স্বাভাবিক। কিন্তু বিচারবুদ্ধির পক্ষাঘাত ঘটিয়ে সৌন্দর্যের প্রতি পক্ষপাত করাটা কি উচিত?

নায়কের রূপবর্ণনার বেলায়ও ওই একই কথা। নায়কপ্রবর শালপ্রাংশু মহাভুজ ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ না হলে ভাল মানায় না, সুতরাং তাঁর দেহের উপর ওই গুণগুলি আরোপ করতেই হবে। কিন্তু তাঁর নাকটি যে বাঁশীর মত হতেই হবে এমন কি কথা আছে? বরং যে লোক তাগড়া জোয়ান, তাঁর নাকটি থ্যাঁদা বোঁচা হওয়ার সম্ভাবনাই ত বেশী? বাস্তব জীবনে বলশালিতার সঙ্গে চ্যাপ্টা নাকের প্রায়শঃ আশ্চর্য যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয়। চ্যাপ্টা নাক স্থূলতার প্রতীক, অতিরিক্ত দৈহিক বলশালিতাও বুঝি তাই। (দেহে বল থাকা ভাল, কিন্তু বলকে খাতির করতে গিয়ে বুদ্ধিহীনতার বলি হওয়া ভাল নয়। অথচ এইটেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটে। মানুষের জীবনে বল ও বুদ্ধির সমন্বয় ঘটবে কবে?) বাস্তব জীবনে যেটা সত্য, কাব্যোপন্যাসে তার ব্যতিক্রম ঘটবে কেন?

দুর্গেশনন্দিনীর জগৎ সিংহ ও তিলোত্তমা। তথাকথিত পরম রূপবান যুবক ও পরম রূপবতী কন্যা। পরস্পর পরস্পরের প্রতি গভীর অনুরক্ত। কিন্তু এই অনুরাগের প্রগাঢ়তার মধ্যেও একটু চোখ তেরছা করলেই তাঁরা উভয়ে উভয়ের ত্রুটিগুলি বার করতে পারতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পারেন নি। কেন না সংস্কারের প্রতি তাঁর দাসত্ব ছিল নীরন্ধ্র। কি সামাজিক সংস্কার, কি সাহিত্যিক সংস্কার।

প্রাচীনপন্থী গতানুগতিক উপন্যাসগুলিতে সংলাপে যে ভাষা ব্যবহার হয় তা প্রায়ই মুখের ভাষা নয়। সে ভাষায় প্রায় বার আনাই

সাজানো মনগড়া, কৃত্রিম। কেন এমন হবে? সাহিত্য যদি জীবনের প্রতিবিম্ব হয় তবে কেন আমরা জীবনের ভাষাকে সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত করব না? বিশুদ্ধবাদীরা বলবেন মানুষ যে ভাষায় সচরাচর কথা বলে, যে ভাবে কথা বলে, রচনার মধ্যে তাকে হুবহু অনুসরণ করতে গেলে তা আর সংলাপ হবে না, হবে অপলাপ। সাহিত্য একটা শিল্পকর্ম, একটা ক্র্যাফট, তার মধ্যে যেমন চাই ভাষার শৃঙ্খলা, তেমনি চিন্তার। সাধারণ আলাপ-আলোচনায় মানুষ কোন কথা গুছিয়ে বলে না, বলতে পারেও না। এমন কি তার ভাষা ভুল হয়। সেইটেকেই যদি সাহিত্যের পাতায় হুবহু লাগাম ছেড়ে দিতে হয়, তবে ত আর শিল্পসাহিত্যে সংযম শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকে না।

কথাগুলির মধ্যে বস্তু আছে, হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। মুখের সংলাপ আর কলমের সংলাপে যে কিছু ফারাক থাকবে তাতে আর সন্দেহ কি। কোন কিছু গুছিয়ে বলতে গেলে তার মধ্যে খানিকটা কৃত্রিমতা আসবেই। কিন্তু সেই কৃত্রিমতাটা যদি প্রতি পদে হাঁ করে থাকে, সংলাপের প্রতি কথায় যদি হোঁচট খেতে হয়, তবে আর তাকে বরদাস্ত করা চলে না। অথচ এই ধরনের জীবনসম্পর্কবিবর্জিত অস্বাভাবিক সংলাপই এতকাল যাবৎ চলে এসেছে—আমরা টুঁ শব্দ করি নি। একটা কথা মনে রাখা দরকার। চিন্তার শৃঙ্খলা মানে চিন্তাকে শৃঙ্খলিত করা নয়। চিন্তার শৃঙ্খলা সাধনের নামে সংলাপকে আমরা এমন কিছু বানাতে পারি না যাতে সে একটা কিম্ভূতকিমাকার বস্তু হয়ে ওঠে। কলমের ভাষা যতদূর সম্ভব মুখের ভাষাকেই অনুসরণ করবে। সংলাপের বেলায় ত বটেই, সাধারণ বাক্যগঠনরীতিতেও বটে।

সাহিত্য জীবনের দর্পণ। কল্পনার স্থান সাহিত্যে অবিসম্বাদী হলেও সাহিত্যের ভাষা কাল্পনিক হওয়া উচিত নয়; বাস্তব জীবনের ছন্দ অনুসরণ করেই তাকে চলতে হবে। মানুষের জীবন প্যাঁচালো হলেই যেমন তার মধ্যে আড়ষ্টতা আসে, তেমনি ভাষাকে প্যাঁচালো করতে গেলেও তার মধ্যে আড়ষ্টতা না এসে পারে না। অথচ আজও আমরা সাধু ভাষারূপ কিম্ভূত ভাষারীতির কবল থেকে মুক্তি পেলাম না। সাধু বনবাসের দিকে আমাদের জাতটারই এমন একটা অত্যুগ্র ঝোঁক যে সাধুতার একটু গন্ধ পেলেই হল, সব ধুনি জ্বালিয়ে ভজনা করতে লেগে যাই। জানি না কোন্ মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরী ভাষারীতিকে 'সাধুভাষা' আখ্যা দিয়েছিলেন,

সেই সাধুভাষা আমাদের রাহুর ন্যায় অনুসরণ করছে। হাঁ, রাহুই বলব, নইলে ভাষার ক্ষেত্রে দুই পত্নী নিয়ে ঘর আজও আমাদের করতে হচ্ছে কেন? মনের মত যে কন্যা, যার সঙ্গে রুচি ও মেজাজে মেলে, কোথায় তার সঙ্গে একটু প্রাণের কথা কইব, পঞ্চাশ ভরি ওজনের গয়নার টঙ্কার তুলে কিম্ভূতবেশিনী সাধুভাষা তার মধ্যে এসে বাগড়া দেবেই। এই গজেন্দ্রগামিনী মেদবহুলা কেরসিকা কন্যাটিকে অচিরেই তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া দরকার, নইলে সুকন্যার সঙ্গে মনের সুখে ফিসফাস গুজগুজ করবার সৌভাগ্য কপালে লেখা নেই।

যাক, ভাষাপ্রসঙ্গকে টেনে আর বাড়াব না। 'সবুজপত্রের' আমল থেকেই চলতি ভাষা আর সাধু-ভাষার কোন্দল চলেছে—আজও তার একটা সর্বসম্মত সুরাহা হল না। অদূর ভবিষ্যতে হবে বলেও মনে হয় না। বাস্তবনিষ্ঠাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন এমন লেখকের সংখ্যা আমাদের দেশে খুব বেশী নেই: অনেকেরই কাছে আধুনিকতা একটা লোকদেখানো ফ্যাসান মাত্র। মুখে চলতি ভাষার জয়জয়কার কিন্তু কলমের বকলমে সাধু ভাষাকে নিয়ে ঘর করতেই এঁদের পছন্দ। এঁদের এই কৃত্রিমতাপ্রীতিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলি, সাধু, সাধু!

গতানুগতিক উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণই বা কত অস্বাভাবিক! প্রাচীনপন্থী কথাশিল্পীরা নায়ককে এককথায় চরিত্রবান বা চরিত্রহীন বানিয়েই খালাস —তারপর আর তাঁদের কোন দায় নেই। যে মানুষ ঔপন্যাসিকের বিচারে চরিত্রবান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, ব্যস, তার আর ভাবনা করবার কিছু নেই। সরকারী প্রহরায় সুরক্ষিত গিল্ট-এজড সিক্যুরিটির মত সেই চরিত্র-সম্পদ তাকে সারাজীবন রক্ষা করবে। উপন্যাসের চরিত্রবান নায়ক সকলের মুখের উপর ডঙ্কা বাজিয়ে জীবনটাকে হেসে খেলে উড়িয়ে দিতে পারে—তাকে চরিত্রবত্তার স্বর্গ থেকে বিচ্যুত করবার সাধ্য কারও নেই। একবার চরিত্রহীন আখ্যা পেয়েছ কি অনন্তকাল নরকবাস। সেখান থেকে আর উদ্ধারপ্রাপ্তির আশা নেই। "Once a thief always a thief." চরিত্র-চিত্রণের এই উনিশ শতকীয় সংস্কার থেকে আজও কি আমাদের লেখকরা সম্পূর্ণ মুক্তি পেলেন?

নিরবচ্ছিন্ন ভাল অথবা নিরবচ্ছিন্ন মন্দ—এভাবে মানুষকে বিভক্ত করা যায় না। শিল্পীর দৃষ্টিতে চরিত্রবান ও চরিত্রহীন বলে কোন কথা

নেই। যে লোক ভাল সে লোক একই কালে মন্দ—ভালটা সর্বসাধারণের গোচরীভূত, মন্দটা অদৃশ্য। বিনয় ও নম্রতার প্রতিমূর্তি সুশিক্ষিত সজ্জন যাজক কিংবা অধ্যাপকের মধ্যে এমন পাপ লুকিয়ে থাকতে পারে যাতে আপনার-আমার শিউরে ওঠা আশ্চর্য নয়। বিশেষ করে চিন্তায় পাপ (বা পাপচিন্তা) সমাজের তথাকথিত চরিত্রবানদের মধ্যেই সমধিক পরিলক্ষণীয়। আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ধরনটাই এমন যে, যে যত বেশী প্রতিপত্তিবান, সাফল্যমণ্ডিত ও বিত্তশালী, তার দুষ্কৃতির মাত্রা তত বেশী। প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের মনে পাপচিন্তার শেষ নেই। সমাজে শিক্ষিত লোক অগুনতি, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির একান্ত অভাব। আর যেখানে জ্ঞানের অভাব, সেখানে অপাপবিদ্ধতার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

তথাকথিত মন্দ লোকের দুর্ভাগ্য এই যে, তার মন্দটাই শুধু লোকের চোখে পড়ে, ভালটা লোকলোচনের অন্তরালে আচ্ছন্ন। ভাল লোক যেমন মন্দ, তেমনি মন্দ লোকও ভাল। তথাকথিত চরিত্রহীনের মধ্যে সময়ে সময়ে এমন মহানুভবতা চোখে পড়ে যার সম্মুখে সমাজস্বীকৃত মহানুভবেরা কেঁচো হয়ে যেতে বাধ্য।

মনুষ্যচরিত্রের এইটেই যদি স্বীকৃত মানদণ্ড হয় তবে ঔপন্যাসিকেরা চরিত্রচিত্রণে কেন অকারণ অস্বাভাবিকত্বের আশ্রয় নেবেন? ভালয়-মন্দে মিশিয়ে কেন তাঁরা চরিত্র সৃষ্টি করবেন না? লেবেল-আঁটার দুষ্প্রবৃত্তি কেন তাঁদের অসংযত থাকবে? উপন্যাসের নায়ককে তুমি সজ্জন শিক্ষিত চরিত্রবান প্রতিপন্ন করতে চাও কর, কিন্তু সেই সঙ্গে এইটিও দেখাও যে তাঁর মধ্যেও গোপন কামনা-বাসনার কীট বাস করে। এমন কি স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে পাশের বাড়ীর বয়স্থা কুরূপা কুমারীটিকে নিয়ে সটকান দেবার অসুস্থ ইচ্ছাও তাঁর মনে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যায়। নায়ক প্রফেসর হয় ত দেখাও, ক্লাশের সব চাইতে সুন্দরী মেয়েটির প্রতি তাঁর অকারণ পক্ষপাত এবং সেই পক্ষপাত এগজামিনের খাতায় অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ। দৈনিক কাগজের সম্পাদক হলে দেখাও সম্পাদকপ্রবর কম্যুনিজম ও ক্যাপিটালিজমের পাঞ্চ-করা উগ্র মদ হামেসা গিলছেন, এবং তাতে তাঁর বিবেক আদৌ পীড়িত হচ্ছে না। সহ-সম্পাদকদের মধ্যে যাদের এখনও গোঁফ গজায় নি তাঁদের কারও কারও প্রতি তাঁর দুর্বলতা নারীঘটিত দুর্বলতাকেও লজ্জা দেয়। নায়ক যদি পলিটিশিয়ান-নামধারী জীব হয় ত দেখাও তার নির্লজ্জতার সীমাপরিসীমা নেই; সাহিত্যিক হলে নির্ভয়ে বল

সে ঈর্ষাকাতর, নীচমনা ও আত্মসর্বস্ব। এই ভাবে প্রত্যেকের ভাল মন্দ, সু ও কু, ডঃ জেকিল ও মিস্টার হাইডকে যদি একই সঙ্গে চিত্রিত করতে না পার তবে তুমি বাস্তবনিষ্ঠ, স্বাভাবিকত্বপ্রয়াসী হয়েছ এ কথা কোনক্রমেই বলা চলবে না।

কথাটা অনেকেরই আশ্চর্য মনে হতে পারে কিন্তু খুবই অকাট্য যে, আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষকাররা ভালয়-মন্দে-মেশানো মানুষের এই দ্বৈত চরিত্রের সন্ধান সব চাইতে ভাল রাখতেন। তাঁদের বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় নিশ্ছিদ্র ভাল বলে কিছু নেই। যে লোক ভাল—সে লোক মন্দও বটে, এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই ভালমন্দ একই কালে বিধৃত। জ্যোতিষকল্পদ্রুম বৃশ্চিক রাশিযুক্তা নারীর লক্ষণ এই ভাবে বর্ণনা করেছেন—স্থিরপ্রকৃতি, ব্রতপরায়ণা, গুপ্ত পাপাচারিণী। শেষ দুটি লক্ষণ অবধান করুন। যে নারী ব্রতচারিণী তিনিই গোপন পাপাচারিণী। এই বিপরীত লক্ষণদুটির মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই, কেন না বাস্তব জীবনে এইরকমই ঘটে থাকে। যে ব্যক্তির জন্ম ফাল্গুন মাসে তার চরিত্রলক্ষণ এইরূপ: দাতা, প্রিয়ভাষী, পরোপকারী ও অত্যন্ত কামুক। বুধবারে জন্মগ্রহণকারী জাতকের বিবিধ লক্ষণগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত দুটি লক্ষণ প্রণিধানযোগ্য: শাস্ত্রার্থবিদ ও পরস্ত্রীগামী। অর্থাৎ জাতক শাস্ত্রবচনের সঠিক অর্থ উদ্ধার করতেই শুধু পটু নন পরস্ত্রীটিকে স্বামীর অবাঞ্ছিত কবল থেকে উদ্ধার করতেও সমান পটু। অবশ্য এখানে দুই ভিন্ন জাতকের দুই ভিন্ন লক্ষণ একত্রে বলা হয়েছে এমন হতে পারে, তা হলেও যোগাযোগটিকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে না করে উপায় নেই। আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা মানুষের চরিত্রবর্ণনায় যে অকাট্য বাস্তবনিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন লেখকরা তাঁদের চরিত্রচিত্রণে সমপরিমাণ বাস্তবনিষ্ঠা প্রদর্শন করবেন কবে?

সমাপ্ত